জীবনের গল্প গল্পের জীবন

সম্পাদনা

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

১৮ই আগস্ট, ১৯৬৫

প্রকাশক
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়দীপ পাবলিকেশনস্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

গ্রন্থিক
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
মুখার্জী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

উৎসর্গ

যারা সভ্যতার পিলসুজ হয়ে সমস্ত দুঃখভার মাথায় বহন করছে, যারা দুর্বহ জীবনের গ্লানি নিয়েই সারাটি জীবন কাটিয়ে গেল, তাদের উদ্দেশে।

ভূমিকা

'জীবনের গল্প গল্পের জীবন' শীর্ষক এই গল্পসঙ্কলনটি মানসিক আনন্দের ভোজে একটি নতুন রসবস্তু বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। নবীন প্রবীণে মিলে বেশ কয়েকজন গাল্পিকের লেখা কয়েকটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, গল্পগুলি সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের দিগ্‌দর্শন বলে পাঠকমহলে আনন্দ-মিশ্রিত বিস্ময় সৃষ্টি করবে।

ছোট গল্প যেদিন প্রথম একটা শিল্পপ্রকরণরূপে রবীন্দ্রনাথের লেখনী আশ্রয় করল সেই দিন থেকেই আখ্যান রচনার নতুন দিগন্ত খুলে গেল। অবশ্য প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে ছোটবড়ো অনেক আখ্যান প্রচলিত ছিল। এমন কি আরো পিছিয়ে গিয়ে যদি খোঁজখবর নেওয়া যায়, তাহলে বৈদিক সাহিত্যেও নানা ধরনের গল্প-আখ্যান পাওয়া যাবে। পালি ভাষায় লেখা জাতকগুলি বুদ্ধদেবের নানা জন্মের বৃত্তান্ত বলেওএর গল্পরস এখনও জনমানস আকর্ষণ করে থাকে, এবং সে রসের অর্থ, বাস্তব জীবনপিপাসা। সংস্কৃতে রচিত নীতিপ্রধান গল্প অর্থাৎ হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্র এবং রোমান্টিক আখ্যান, অথাৎ দশকুমার চরিত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতিতে নানা মাপের ও বিচিত্র স্বাদের বহু গালগল্প আছে, যাতে বাস্তবের পরিচিত জীবনের চেয়ে অবাস্তব ও কল্পনা, কাচৎ দার্শনিকতার অধিকতর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। সংস্কৃত কাদম্বরীর মধ্যে যেমন উপন্যাসের বীজ আছে, তেমনি পালি ও সংস্কৃত গল্পের মধ্যেও আধুনিক ছোট গল্পের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

আমরা যদি প্রাগৈতিহাসিক ভারতে পিছিয়ে যাই, তা হলে দেখব, অস্ট্রিক ও ভোটচীনীয় আধিবাসীর মধ্যেও নানা গল্প কাহিনী প্রচলিত ছিল এখনো সাঁওতাল, মুণ্ডারী, গডব, শবর, হো, কুবকু এবং নাগা প্রভৃতি পর্বত-কান্তারবাসী নিষাদ ও কিরাতসমাজে নানা ধবনের গল্প, উপকথা, আখ্যান প্রচলিত আছে, যার খানিকটা স্বাভাবিক, খানিকটা-বা আদিবাসী সমাজের অনুগত অদ্ভুত ও উদ্ভট ধরনের। গল্পের জড বহু দূরে প্রসৃত ; য়ুরোপ-এশিয়া, পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, কেল্টিক সংস্কৃতিজাত ও নর্স উপকথার মধ্যেও ছোটগল্পের সম্ভাবনা ছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সাগা ও এড্ডাগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুঃসাহস ও উদ্ভট রোমান্সের গল্প হলেও তার মধ্যে ছোটগল্পের অনেক উপাদানও পাওয়া যাবে। প্রাচীন গ্রীক রোমান ও জর্মান মহাকাব্যও অনেকগুলি ছোট-বড়ো

গল্পের সমাহার।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের নমুনা পাওয়া না গেলেও এবং মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ও পূর্ববঙ্গগীতিকায় ছোট গল্প না হলেও এতে গল্প-আখ্যানের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। বেহুলা-শ্রীমন্ত-লাউসেনের কাহিনীতে ছোটগল্পের কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, শিবায়নও শিবদুর্গার ঘরগৃহস্থালির গল্প। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রেম ও কামের গল্প ছাড়া আর কী? ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে যে-সমস্ত বাংলা পুঁথি আছে তার কোন কোনটিতে বেতাল-পঞ্চবিংশতি ধরনের গল্প কাহিনী আছে। সুতরাং গদ্যেপদ্যে লেখা গল্প মধ্যযুগে প্রচলিত না থাকলেও ছন্দোবদ্ধ আখ্যান রচনার ধারা প্রচলিত ছিল।

উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব পড়ুয়াদের জন্য কেরী সাহেবের উদ্যোগে কয়েকখানি আখ্যানগ্রন্থ বাঙালীদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। সেগুলি হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃত গল্পগ্রন্থের অনুবাদ, কোনটি ফারসি গল্প, কোনটি-বা ঈশপের গল্পের অনুসরণ। এর মধ্যে কেরী সাহেবের 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি কোন ইতিহাস-সংক্রান্ত রচনা নয়। কেরী এতে সংস্কৃত, ইংরেজি ও লোকজীবন থেকে সংগৃহীত কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন। এতেই সর্বপ্রথম গল্পের স্বাদ পাওয়া যাবে, যদিও তখনো ছোট গল্পের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কেউ সচেতন হননি,—না লেখক, না পাঠক। য়ুরোপেও উনিশ শতকের আগে যথার্থ ছোটগল্প লেখা হয়নি। হথর্নের (১৮০৪-৬৪) "Twice Told Tales" সমালোচনা করতে গিয়ে এডগার অ্যালান পো ১৮৪২ সালে সর্বপ্রথম ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিয়ম নির্ধারণ করেন। তাঁর মতে ছোট গল্প হবে গদ্যে লেখা ছোট মাপের গল্প, যা পড়ে ফেলতে আধঘন্টা থেকে দু'ঘন্টার বেশী সময় লাগা উচিত নয়। ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য হবে, কোন একটি মাত্র বিষয়ের উপর আলোক নিক্ষেপ, স্বল্প পরিসরে 'single effect' বা 'totality of effect' ফুটিয়ে তুলতে হবে। অবশ্য বিশ শতাব্দীতে এই সংজ্ঞা অনেক বদলে গেছে, এখন ছোট গল্পে বহু বিচিত্র ধরনের বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, শুধু গল্প-আখ্যান নয়, কোন-একটি চরিত্র বা বা তার কোন-একটি বৈশিষ্ট্য, লেখকের সারা দিনের অভিজ্ঞতা, এমন কি সামান্য একটি সাক্ষাৎকার, কথাবার্তা, উদ্ভট খেয়াল—সবই ছোট গল্পের বিষয় হতে পারে। কারো কারো মতে এডগার অ্যালান পো-ই (১৮০৯-১৮৪৯) ছোট গল্পের জনক। কারণ তিনি প্রথম ছোটগল্পের, বিশেষতঃ ইংরেজি ছোট গল্পের আঙ্গিক বেঁধে দেন, নিজেও সেই আঙ্গিক অবলম্বনে উৎকৃষ্ট ছোট গল্প লেখেন।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেও (রবীন্দ্রনাথ ও

শরৎচন্দ্রের নাম স্মরণে রেখেই একথা বলছি) রবীন্দ্রনাথই সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় বাংলা ছোট গল্পের পত্তন করেন। তাই তাঁকেই বাংলা ছোট গল্পের জনক বলা হয়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র কয়েকটি ছোট গল্পের ধরনের আখ্যান লিখেছিলেন, কিন্তু এই কয়েকটির 'হাল-হকিকত' সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না, থাকলে তাঁকেই আমরা ছোট গল্পের জনকত্ব দিতে পারতাম।

রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী সাপ্তাহিকের সাহিত্য-সম্পাদক হয়ে প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছোট গল্প লিখতে লাগলেন। কিন্তু তারও আগে ১২৯১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'ভারতী-তে (১৮৮৪) 'ঘাটের কথা' এবং ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'নবজীবনে' (১৮৪৪) 'রাজপথের কথা' নামে যে দুটি গল্প কথিকা লেখেন, আমার মতে সেই দুটি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ছোট গল্প। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বোধহয় তা মনে করতেন না। তাই পরবর্তীকালে এ-দুটিকে 'বিচিত্র-প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আধুনিক কালে ছোট গল্পের আঙ্গিকের নানা পরিবর্তন হয়েছে, তাতে 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'—নিঃসন্দেহে ছোট গল্প বলে গৃহীত হতে পারে। তাঁর পরে তাঁর আদর্শে বাংলাদেশে ছোট গল্পের বান ডেকেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প থেকে শুরু করে বিশ শতাব্দীর চলতি দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কয়েক সহস্র ছোট গল্প লেখা হয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে পাশ্চত্য গল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

এই গল্প সংকলনের নামটি ('জীবনের গল্প ও গল্পের জীবন') বেশ প্রতীক-দ্যোতক হয়েছে। গল্পগুলি নিঃসন্দেহে জীবনভিত্তিক, অর্থাৎ প্রতিদিনের জীবন ও অভিজ্ঞতার উপরে এর প্রতিষ্ঠা। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, শুধু জীবনের (অর্থাৎ বাস্তব জীবনের) গল্প হলেই সার্থক ছোট গল্প হয় না, তাকে গল্পের জীবনও হতে হবে। অর্থাৎ শিল্পসম্মতরূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংকলনে জীবনের গল্পকে এবং গল্পের জীবনকে সমন্বয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে বলেই এর নামকরণের মধ্যে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা আছে। প্রতিদিনের ঘটনা কথাসাহিত্যের মূল উপাদান হলেও তাকে কল্পনার সাহায্যে শিল্পরূপ দিতে না পারলে তা মালমশলা হয়েই থাকবে। তার দ্বারা তাজমহল গড়া যাবে না। লেখকগণ প্রস্তরখণ্ডকে চেঁছে ছুলে পালিশ করে শিল্পরূপ দিয়েছেন, তা পাঠকগণ সহজেই অবধারণ করতে পারবেন। গল্পগুলির স্বাদ মনের দ্বারাই লাভ করা যাবে। ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিবেদন করি। গল্পগুলি একালের হলেও এতে পশ্চিমী বিশ্বের ছোট গল্পের উদ্ভট রচনাশক্তি ততটা প্রভাব বিস্তার করেনি। এতে এখনও গল্প আছে, চরিত্র

আছে, বিশেষ নাটকীয় অভূতপূর্বতা ও লীরিক রসের মূর্চ্ছনাও আছে। তবে কালধর্মে বোধহয় অনেক গল্পেই বিষণ্ণতা, বেদনা ও নৈরাশ্যের সুরটি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। ছোট গল্প হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের সীমান্তভূমি। সুতরাং সামাজিক ব্যর্থতাবোধ বেদনা ও নৈতিবাদের শূন্যতা লেখক-লেখিকাদের মনোভূমিতে অনিকেত বেদনাবোধ সৃষ্টি করলে বিস্ময়ের কারণ নেই। যাইহোক, পাঠক-পাঠিকাগণ এই ভূমিকা পড়ে গল্পগুলি পড়তে প্রলুব্ধ হবেন না। আসলে রসসাহিত্যের ভূমিকা নিরর্থক, কোথাও কোথাও হানিকর। গুরুমশাই সেজে সাহিত্যে মাস্টারি করার অর্থ দেবী সরস্বতীকে জবাই করা। আশা করি পাঠকগণ আমার অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করবেন, এবং সম্ভব হলে ভূমিকা বাদ দিয়েই গল্পগুলির রসভোগ করবেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বাতাসে ভেসে আসে স্বর্ণচাঁপা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনন্দা দরজা খুলেই হতবাক। গ্রীলের পাশে কিছু স্বর্ণচাঁপা। ভারি তাজা। চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফুলগুলি কোথা থেকে এল, কে রেখে গেল, রেখে গেল, তো গোপনে রেখে গেল কেন--কিংবা মনে হল কোন তুকতাক করছে না তো বাড়িটার উপর। স সারে সবকিছু ঠিকঠাক রেখে যাওয়া এমনিতেই কঠিন। তার উপর এই উপদ্রব সহসা। সে চিৎকার করে উঠল শুনছ! কোথায় তুমি। দেখ কী কাণ্ড, বারান্দায় কটা স্বর্ণচাঁপা!

এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। আবছা অন্ধকার চারপাশে। বাড়ি-ঘর-গুলি নিরীহ গোবেচারা স্বভাবের—মনেই হয় না আর একটু পর সবাই দরজা জানালা খুলে দেবে। মানুষজন, শিশুর মুখ, কোন দগ্ধ প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠবে এইসব বাড়ি-ঘরে। ধোঁয়া, মলিন রুক্ষ কেশ এবং কাসি, সবই কোন হেতুর মতো—অথবা গোলমাল এবং কবিতা পাশাপাশি থাকে। নবেন্দু গা করছিল না। কাছাকাছি কোথাও স্বর্ণচাঁপার গাছ আছে কিনা মনে করার চেষ্টা করল। তা চাঁপাফুল হাওয়ায় ভেসে আসতেই পারে। এই নিয়ে হৈচৈ সুনন্দার—তবু মনে হল, একবার বারান্দায় গিয়ে দেখা দরকার কিংবা জানালায় মুখ রেখে। সে উঁকি দিয়ে দেখল সত্যি বেশ তাজা কটা ফুল—ঠিক ফুল নয়, কাঁচের গ্লাসে জল দিয়ে রেখে দিলে ফুল হয়ে ফুটবে। সকালের ঠাণ্ডা আমেজটা এখনও আছে। এমন সুন্দর সকালে চাঁপা ফুল কটা ভারি সুবাস ছড়াচ্ছিল। তারই মধ্যে সুনন্দা কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবেন্দুর হাসি পেল। বলল, ভয় পাচ্ছ?

সুনন্দা একবার তাকাল, কিছু বলল না। কেবল ডাকল, বিনি বিনি। বিনি থাকে শেষের দিকের ঘরটায়। শুনতে পাবে কেন? ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেছে। নিজেদের আলাদা ঘরে থাকে। আলাদা ঘরে থাকলে মানুষ আলগা হয়ে যায় সুনন্দা সেটা বোঝে না। তার চেঁচামেচি এখনও পর্যন্ত কারো কানে যায়নি। কেবল সে আর সুনন্দা এই রহস্যময় চাঁপা ফুলের এখন খুব কাছাকাছি।

হঠাৎ নবেন্দু চেঁচিয়ে উঠল, এই কি করছ। না না এটা ঠিক না।

সুনন্দা কোত্থেকে একটা ফুলঝাড়ু এনে ছুঁলে জাত যাবে মতো ঝাঁট দিতে যাচ্ছে।

নবেন্দু দৌড়ে বারান্দায় চলে গেল। ঝাড়ুটা প্রায় কেড়েই নিল। বলল, ফুল কখনও অস্পৃশ্য হয় সুনন্দা। বলেই সে ফুল কটা হাঁটু গেড়ে তুলে নিতে গেলে, সুনন্দা ঠেলে সরিয়ে দিল নবেন্দুকে।—তুমি কী মানুষ না! ভয়ডর নেই। কার মনে কী আছে কে বলতে পারে।

নবেন্দু বলল, কেউ হয়ত রেখে গেছে। চোর ছ্যাঁচোড়ও হতে পারে।

সুনন্দা বলল, তুমি কী! চোর ছ্যাঁচোড় ফুল রেখে যাবে কেন!

নবেন্দু নাছোড়বান্দা। সে বলল, বারে চোর বলে ফুল ভালবাসতে পারে না! ফুল কটা হাত বাড়িয়ে রেখে কাজকর্ম সারবে ভাবছিল। তা আর হয়নি।

যাই হোক ফুল নিয়ে সুনন্দার ধন্দ গেল না। দুই মেয়ে এক ছেলে ততক্ষণে বাবা মার চেঁচামেচি শুনে নিচে নেমে এসেছে। কাজের মেয়ে বিনিও চোখ রগড়ে দেখল—বারান্দায় আশ্চর্য সোনালী চাঁপা। ছেলে মেয়েরা ফুল কটা নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু মা যেভাবে আগলে দাঁড়িয়ে আছে কিছুতেই ফুলের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। কেবল বিনি আসায় সুনন্দা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, ওগুলো তুলে নে। তারপর চান করে আয়। জলে ফেলে দিবি।

নবেন্দু বুঝতেপারে মানুষের কোন স্বস্তি নেই। সামান্য ক'টা ফুল নিয়ে সুনন্দার মুখ এমন ভারী হয়ে গেছে যে মনে হয় যে কোন সময় একটা বিপদের ভয়। কখন কি গ্রাস করবে। একবার বাড়িটার উপর শকুন বসায় সুনন্দা পাঁচ রাত ঘুমাতে পারেনি! দশটা পাখির মতো আরও একটা পাখি ছাদের কার্নিশে বসলে এমন কী ক্ষতি। পাখি উড়বে। বসার জায়গা পেলে বসবে। সুনন্দা রেবতীঠাকুরের বিধানমতো শান্তি স্বস্ত্যয়ন থেকে শনিপূজা সত্যনারায়ণ পূজা, কিছু করতেই বাদ রাখেনি। বাড়িটা হওয়ার পর এবং ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর কেবল মনে হয় কোন অশুভ প্রভাবে পড়ে যাচ্ছে তারা। এমনকি ফ্রিজ নিয়েও। কেনার পর থেকেই বার বার বিগড়াতে থাকল। কখনও কুলিং বন্ধ। কখনও মোটর কাজ করছে না, কখনও গ্যাসপাইপ চোক্‌ড। এতসবের পর সুনন্দার নির্ঘাত মনে হয়েছিল সেই অশুভ প্রভাবের কাজ। বাড়ির পাশে বাড়ি উঠবেই। পাশের বাড়িটা থেকে এ-বাড়ির অনেক কিছু দেখা যায়। সীমানা নিয়ে কিছু গোলযোগও ঘটেছে। ফলে সংসারে যা হয়, মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। সুনন্দার মনে হয় সব অশুভ প্রভাবই ও-বাড়িটা থেকে বাতাসে ভেসে আসে। নবেন্দু লক্ষ্য করেছে—পাশের বাড়ির মহিলাটি সব সময় এ বাড়ির সবকিছু কেমন গিলে খাওয়া চোখে দেখে। সেই চোখ দেখে একবার সে নিজেও কেমন অসুস্থ বোধ করেছিল। গতবার সেই চোখের প্রভাবে সুনন্দার ধারণা ছোট মেয়েটা স্ট্যাণ্ড করতে পারল না। মেয়েদের পড়ার ঘর

একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেল। জানালার পর্দা আরও বড় করে দেওয়া হল। মুখোমুখি দরজা ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল। এ-সময় নবেন্দুর মনেও প্রশ্ন চাঁপা ফুল কে রেখে গেল! কেন রেখে গেল! সে কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। বয়স হয়ে যাওয়ায় আগের মতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারছে না।

বয়স বাড়লে মানুষের বুঝি এই হয়। জানালা দরজায় অশুভ প্রভাব উঁকিঝুঁকি মারে। সে নিজের এই দুর্বলতা সম্পর্কে খুব সচেতন হয়ে উঠল। সবকিছু অগ্রাহ্য করা দরকার। সুনন্দা সেই কবে থেকেই যেন ভীত স্বভাবের মেয়ে। এখন আরও যেন বেশি। সুনন্দাকে ফুল ক'টা ভীষণ ভয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। সে বিনিকে বলল, কিচ্ছু করতে হবে না। সর তোরা। খুব সাহসী মানুষের মতো এগিয়ে গেল এবং সুনন্দা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব ফুল তুলে ঘরে ঢুকে গেল। ছোট্ট মেয়েটা এখনও ফ্রক পরে। তার কাছে ফুল ফুলই। সে বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও কাচের গ্লাসে রেখে দি।

সুনন্দা আশাই করতে পারেনি। কেমন সাময়িক বিহ্বলতায় পেয়ে বসেছিল তাকে। তারপর হুঁশ হতেই নবেন্দুর হাত থেকে হ্যাঁচকা মেরে সব কেড়ে নিল এবং বাইরে নিয়ে আবর্জনার মধ্যে ছুঁড়ে দিল। নবেন্দু ভয় দেখাতে পারত. যদি অশুভ প্রভাব হয় আবার উড়ে আসবে। তুমি তাকে যত দূরে রেখেই দাও, সে আসবে। কিন্তু সে জানে এতে সংসারের মঙ্গল হবে না। সুনন্দার বাতিক আরও বাড়বে। সব কিছুতেই সে অমঙ্গলের আশঙ্কা খুঁজে বেড়াবে এবং যে কোন সময় মানসিক রোগের এভাবে শিকার হয়ে পড়তে পারে।

বাড়িটা করার পর থেকেই সুনন্দা আরও কত কিছু যে আশঙ্কাজনক চিহ্নটিহ্ন দেখতে পেয়েছিল। দূর ওসব কিছু না করে বারবার সাহস দিয়ে আসছে। একবার প্রকাণ্ড একটা সাপের খোলস সিঁড়ির চাতালে দেখা গিয়েছিল। সারা বাড়িঘর তন্নতন্ন করে খোঁজা—না কিছু নেই। আর চারপাশে শহর যখন হামাগুড়ি দিয়ে কেবল এগুচ্ছে তখন এতবড় একটা সাপের খোলস আসে কোত্থেকে! সুনন্দার কপাল ঘামছিল। বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। ভয় পেলে সুনন্দা বিষণ্ণ হয়ে যায়। খেতে পারে না। ক্রমে রোগা এবং দীনহীন হয়ে পড়ে। নবেন্দু বলেছিল ধুস তুমি যে কিনা। দেখছ না, পেয়ারা গাছটায় শালিক বাসা বানাচ্ছে ওদেরই কাজ এটা। তারপরের বছরও ঠিক একই সময়ে চাতালে সেই খোলস। দুবার এবং তিনবার। বাড়ির চারপাশে উঁচু দেয়াল। সামনে বড় রাস্তা। সব সময় যানবাহন চলাচলের শব্দ। তবু রাতে সুনন্দা হিস হিস শব্দ শুনতে পেত। রাতে টর্চ জ্বেলে বাথরুমে যেতে হতো সবাইকে। সারা বাড়ি জুড়ে কার্বলিক অ্যাসিড ছিটানো। তবু যথা-

সময়ে পরের বছর আবার সাপের খোলস। সুনন্দা বোধহয় শঙ্কায় পাগলই হ. যেত। নবেন্দুর উপস্থিত বুদ্ধি সেবারে বাঁচিয়ে দিল। সে বলেছিল, সাপের খোলস পুড়িয়ে দিতে হয়। আবর্জনায় ফেলতে হয় না। পরের বছর ঠিক সেই সময়টাতে —আবার ভয়ে ভয়ে ছিল নবেন্দু। কারণ সে জানে পুড়িয়ে দিলে শেষ হয়ে যায় একটা আপ্তবাক্য মাত্র। ফলে রোজ সবার ঘুম ভাঙার আগে চাতালে গিয়ে দাঁড়াত। আশ্চর্য সে-বছর খোলসটা বিদায় যে নিল আর ফিরে আসেনি। সে বুঝতে পেরেছিল এইসব দুর্বলতা এক দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেও অন্য দরজা দিয়ে আবার গোপনে ঢোকে। সেবারেই সুনন্দার বাবা মারা গেল। সুনন্দা বলেছিল, আমি জানতাম কিছু একটা হবে।

নবেন্দু বুঝতে পারে সবকিছুর সঙ্গেই সুনন্দা শুভ-অশুভের যেন সম্পর্ক টের পায়। চাঁপা ফুল ক'টা এমন কোনো সংকেত। যাই হোক, এই নিয়ে আর সে কোন কথা বলল না। যেন সুনন্দা ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে এল সবকিছু আপদ। সুনন্দা আলগা পায়ে স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর চিলেকোঠায় গেল গঙ্গাজল আনতে। সেখানে সন্ন্যাসীর দেওয়া মঙ্গলকবচ আছে। গঙ্গাজলে ডুবিয়ে সেই জল সারা বাড়ি ছড়িয়ে দিতেই কেমন প্রফুল্ল মনে হল সুনন্দাকে। আর তখনই মনে হল, এ-সময়ে চাঁপা ফুল কোথায় ফোটে। এটা চাঁপা ফুলের ঋতু কিনা। সে সেই কবে চাঁপাফুলের গাছ দেখেছে, ফুল দেখেছে। কখন ফুটত মনে করতে পারছে না। তবে চৈত্রমাসে ফুটত বলে মনে হয় না। যদি অসময়ে এই ফুল বাতাসে ভেসে আসে তবে তো আরও কেলেঙ্কারী। সে যেখানে যাকে পেল অফিসে, কেবল জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা চাঁপা ফুল কখন ফোটে? আর সে আশ্চর্য, চাঁপাফুল কখন ফোটে কেউ নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলতে পারল না। বর্ষার ফুল না গ্রীষ্মের ফুল। সব ফুল তো সবসময় ফোটে না। এক একজন এক এক সময়ের কথা বলল। এরপর নবেন্দুর মনে হতে লাগল চাঁপাফুল সারা বছর ধরেই ফোটে। না হলে সে যা মানুষ, কখন সুনন্দাকে বলে দেবে, জানো চাঁপা ফুল তো এখন ফোটার কথা না। তাহলেই গেছে। সুনন্দা বলবে, আমি জানতাম এমন হবে। আর সেই থেকে কেন জানি নবেন্দুর জানার ইচ্ছে, এবারে সুনন্দা কি টের পেয়েছে। কোন ভালবাসা টাসা। এ-বয়সে সে আর কাকে ভালবাসতে পারে? তার যারা পরিচিত সবাই তো গিন্নীবান্নী মানুষ। তারা আর তাকে ভালবাসতে আসবে কেন? সবাই যে যার মতো স্বর্ণচাঁপার গাছ লাগিয়ে সার জল দিয়ে বড় করে তুলছে। আর আশঙ্কায় ভুগছে কখন কোন কীটপতঙ্গের আক্রমণ না জানি ঘটে। নবেন্দু সারারাত ঘুমাতে পারল না। ভোররাতে খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে

ব্যালকনিতে গিয়ে বসল। সুনন্দা ভিতরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর কেবল হাই উঠছিল। সন্ন্যাসীর দেওয়া সামান্য একটা মঙ্গলকবচে সুনন্দার সব ভয়ডর গেছে।

সকালে সুনন্দা নবেন্দুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। চোখ উদাস। একরাতে যেন অনেকটা তার বয়স বেড়ে গেছে। সুনন্দা চা রেখে বলল, শরীর খারাপ?

নবেন্দু তাকাল। কিছু বলল না। চা খেয়ে বের হয়ে গেল। ফিরল অনেকরাত করে। সুনন্দা বলল, কোথায় গিয়েছিলে।

নবেন্দু স্নানের ঘরে চলে গেল। দাড়ি কামায়নি। চোখ বসে গেছে। ছেলে মেয়েরা যে যার ঘরে। বিনিও শুয়ে পড়েছে! সুনন্দা খাবার টেবিলের পাশে। মুখ থমথমে। নবেন্দু বলল, খুঁজতে বের হয়েছিলাম। সুনন্দা বলল, কী খুঁজতে বের হয়েছিলে!

এখানে কোথায় চাঁপার গাছ আছে খুঁজতে বের হয়েছিলাম। সুনন্দা কিছুটা চকিতে প্রশ্ন করল, পেলে? নবেন্দু খেতে খেতে অন্যমনস্ক। বলল, সবার বাড়িতেই আছে। একটু নুন দাও।

সুনন্দা নুনদানি থেকে চামচে সামান্য নুন তুলে দিয়ে বলল, কে তোমাকে খুঁজতে বলছে! নবেন্দু আঙ্গুলে টিপে সামান্য নুন নিয়ে জিবে ঠেকাল। বলল, কেউ বলে না। তারপর আচমকা প্রশ্ন করল, সাপের খোলসটা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তোমার বাবা মারা গেল। এবারে কার পালা ভাবছি! তুমি তো সব টের পাও। তারপর পেটটা টিপে ধরল।

—কী হয়েছে।

—ব্যথা করছে।

ব্যথা করবে না! সারাদিন একদণ্ড বিশ্রাম নেবার নাম আছে!

নবেন্দু হাসল। ব্যথাটা কেমন চমকে দিয়ে গেল তাকে। খামচে ধরার মতো! তিরিশ বছর ধরে সুনন্দাকে নিয়ে সংসার করছে। বিয়ের আগে সে এক রকমের মানুষ ছিল। বিয়ের পরে একেবারে অন্যরকম। যেন বৌকে মানে সম্মানে রাখতে না পারলে তার মর্যাদা থাকবে না। কোথাও গেলে দুশ্চিন্তা। সুনন্দা ভাল আছে তো! যা ভীতু মেয়ে! কতক্ষণে ফিরবে। তারপর সন্তান সন্ততি। ভোর রাতের দিকে পেটটা আবার খামচে ধরল। নবেন্দু চিৎকার করে উঠল, সুনন্দা জল। কাছে এলে বলল, ব্যথা।

সুনন্দা দেখল, আজ প্রথম নবেন্দুর কপাল ঘামছে। সে বলল, মানসকে ডাকব। ব্যথাটা কমেছে!

জল খাচ্ছিল, নবেন্দু কিছু বলতে পারছে না। পরে চোখ বুজে বলল, ডাকতে হবে না। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। সেরে যাবে। সে চোখ বুজেই থাকল। সে দেখতে পেল, স্বর্ণ চাঁপারা আবার বাতাসে ভেসে আসছে। সন্ন্যাসীর মঙ্গল কবচে বিশ্বাস থাকলে বোধ হয় ব্যথাটা হয়না।

ক'টা স্বর্ণ চাঁপা কি যে আতঙ্কের মধ্যে রেখে গেল তাকে! সে চোখ বুজে দেখতে পেল কতরকমের চাঁপা গোলক চাঁপা, কাঠ চাঁপা, কাঠালী চাঁপা, শ্বেত চাঁপা। কেউ বলে গেল যেন, চাঁপা ফুল গ্রীষ্মেই ফোটে। তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ। অসময়ে কেউ তোমার বারান্দায় চাঁপা ফুল রেখে যায় নি। সে সুনন্দাকে কাছে ডাকল। বলল সত্যি করে বল চাঁপা ফুলগুলি দেখে এত ভয় পেলে কেন! সুনন্দা বলল, ভয় পাব না! আমি ছেলে পুলের মা।

নবেন্দু আর কোন প্রশ্ন করল না। পাশ ফিরে বলল, আলোটা নিভিয়ে দাও। সকালে ডেক না। আসলে সে ভাবছিল ঘুমটা এলে ভাল হয়। তার ঘুমানো দরকার। আর তখনই মনে হল পঁচিশ বছর ধরে সে না ঘুমিয়ে আছে। পঁচিশ বছর ধরে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা। ছেলে মেয়েরা তখন ছোট ছিল, তখন একরকম দুর্ভাবনা বড় হলে অন্যরকমের। একটা যায় আর একটা আসে।

মহাকাশ ফেরি কলাম্বিয়া এসেছে পৃথিবীর বুকে। নবেন্দুর ঘুম ভাঙতেই খবরটা শুনল। সঙ্গে সঙ্গেই পেটে খিঁচ। ব্যথায় নীল হয়ে গেল নবেন্দুর মুখ। সুনন্দা হাউ মাউ করে কেঁদে দিল। মানস এলে বলল, দাদাকে পি জিতে ভর্তি করতে হবে। পেটে বড়কিছু একটা লাগছে। বিকালের দিকে সাদারঙের গাড়ি এসে নবেন্দুকে নিয়ে গেল। সুনন্দা পঁচিশ বছর ধরে লোকটার দিকে তাকিয়েছিল—আজ সেও চলে যাচছে। সে জানত, এমন কিছু একটা তার হবে।

আর তখন নবেন্দু সাদা গাড়িতে শুয়ে দেখতে পেল অনেকদূরে এক মস্ত মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর। সারি সারি মানুষ পিঠে ক্রস। ক্রস বহন করে তারা ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছে। কোথায় যাবে। মুখে সবার লম্বা দাড়ি চুল অবিন্যস্ত। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে চোখ কোটরগত। নীল এক ভূখণ্ড থেকে তারা রওনা হয়েছে, এখন সে ভূখণ্ড নেই। এক গভীর খাদ পার হয়ে কোন পাহাড়ের উৎরাই ভাঙছে। কেউ কেউ মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছিল। কোথাও কাঁটা গাছে পা লেগে রক্তপাত হচছে। সে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল—কারা তোমরা। কেন তোমরা হাঁটছ। আমার বারান্দায় স্বর্ণচাঁপা কে রেখে গেল, তোমরা জান?

তখন ক্রস পুঁতে দেওয়া হচছে, লম্বা মই বেয়ে কেউ উঠে যাচছে উপরে। হাতে পেরেক পুঁতে দিচছে। যার যার ক্রস—নম্বর মারা। আজীবন বহন করে সেই

ক্রসে হাত পা তুলে দিতে যাচছে। শুধু অপেক্ষা কেউ এসে কতক্ষণে তার হাতে এব পায়ে কাঁটা পুঁতে দেবে। বধ্যভূমিতে সেও হাজির। পিঠে তার ভারি ক্রস। নবেন্দু এ-বাবে ক'দিন খুব ঘোরের মধ্যে ছিল। নাকে নল লাগানো হাত পা বাঁধা। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটেও কাটছে না। হিজি বিজি দাগ কাটা ছবি অথবা গভীর মন্থর কোন ধ্বনি কানে বাজত।

আব সেই ঘোবের মধ্যে নবেন্দু দেখতে পেল বাতাসে অজস্র চাঁপা ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনোটা হলুদ কোনোটা সোনালী, আবার সবুজ রঙের চাঁপা গায়ে কুয়াশা মেখে লাল নীল নক্ষত্র হয়ে যাচ্ছে। কোনোটার বোঁটায় সাপের লেজ, কোনোটা ডানা গজিয়ে নিয়েছে। তারপর কখন পাখি হয়ে গেল। পাখিটা উড়ে আসছে! কপালে বসে ঠুকরে ঠুকরে চুল উপড়ে ফেলছে। শেষে চোঁ করে সবটা ঘিলু খেয়ে তৃপ্তিতে পাখা ঝাড়ল। আব তখনই মনে হল, অনেক দূর থেকে, যেন কান দূববর্তী নীহারিকা থেকে অতীব এক চেনা স্বরে কেউ ডাকছে।—এই শুনছ। আমরা। চিনতে পারছ। আমি সুনন্দা, আমি অতসী, আমি রূপা। দেখ তোমার জন্য আমরা কেমন সোনাব চাঁপা হয়ে ফুটে আছি।

সে হাসল। বলল, আমাকে নিয়ে বেশ মজা তোমাদের, না!

মাথায় ঘিলু না থাকলে ঈশ্বরেব হার্টসও মৃত মানুষেব মুখের মতো দেখায়।

বাবর

অচিন্ত্য কুমার ভট্টাচার্য

তপন অন্যমনস্ক ভাবে হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। চারটে বেজে গেছে। শীতের বেলা, এই সময়ে প্রতিদিনই অন্ধকার হয়ে আসে; দোকানের এবং পথের আলো জ্বলে ওঠে। আজ সকাল থেকেই মেঘ করেছে, যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছিল, কিন্তু নামেনি। মেঘের জন্যে মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে বুঝি অনেকক্ষণ।

কাজ যা ছিলো ধীরে-সুস্থে করেও শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেও হয়, আবার তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে হবেই বা কি এই রকম ভাবনার দোটানায় তপন কিছুক্ষণ কাটালো, অবশেষে বেরিয়ে পড়াই ঠিক করলো। গেলাস, কাঁচের কাগজ-চাপা এবং দু-একটা কাগজপত্র টেবিলের ড্রয়ারে ভরে, সহকর্মীকে জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

বাইরে বেরিয়েই শীত এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রথমটা একটু কাঁপুনি লাগলো। একটা সিগারেট কিনে তাতে আগুন ধরাবার সময় দোকানের আয়নায় নিজের মুখ দেখল সে; মনে হল ইদানিং একটু খারাপ হয়ে গেছে তার চেহারা, চোখ মুখের বিষণ্ণ ভাবটুকুও তার নিজেরই নজরে পড়লো। যে ভাবনাটা তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে ডুব মেরে ছিলো আবার সেটা তার বুকের মধ্যে একটা নিস্তেজ করুণ বিলাপের মতো নিঃশব্দে জেগে উঠলো, সমস্ত চেতনাকে যেন কোনো শীতের নদী থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাস একটু একটু করে এক ধরণের বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন করে তুললো।

ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু হয়ে ধর্মতলার মোড় পার হয়ে সে কার্জন পার্কে এলো।

তপন পার্কের ভেতরে এসে একটি নির্জন এবং অন্ধকার জায়গায় বসলো। আজ এক বার নিজের ভাবনার মুখোমুখি হতে চাইলো সে। কিন্তু কোন ভাবনার মুখোমুখি হবে? তার ভাবনার সম্পূর্ণ রূপ কি তাই সে জানে না স্পষ্ট করে। কতো দিন হবে—ছ মাস? হতে পারে। চার মাস? তাও হতে পারে—তপন যেন কখন একদিন হঠাৎ টের পেলো তার মধ্যে অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতার ছায়া ধীরে

ধীরে বিস্তারলাভ করছে এবং ক্রমশঃ তার সহজ আনন্দ, তার সুখ, তার সত্তা সমস্ত কিছুকে গ্রাস করছে। আর যখনি এই বিষন্নতা, এই ক্লান্তি এবং জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধ প্রবল ওঠে তখন সে যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে। সে দেখতে পায় হঠাৎ তার সামনে মৃত্যু যেন প্রকট হয়ে উঠছে। কি তার স্বরূপ তা সে জানে না, কিন্তু বোধ করে।

নিজের ভাবনায় তপন ভয় পেলো। এ তার কি হ'ল ? এ কি তার কল্পনা বিলাস না কি অসুস্থতা ? কিন্তু তাই বা কি করে হয় ? সে তো দেখেছে, প্রথমবার না হোক, দ্বিতীয়বার তো তার ভুল হয় নি। এতো স্পষ্ট করে মৃত্যুকে সে দেখেছে যে লোকে তাকে পাগলই বলুক আর যাই বলুক, সে তো জানে তার এই বিষন্নতা এবং তার এই মৃত্যুকে দেখতে পাওয়া কতো সত্য, দিনের মতো সত্য। এই সব সময়ে তার মধ্যে যে একটানা বিষন্নতা দানা বাঁধে, তপন টের পেলো গত দু তিন দিন থেকে আবার সেই নিঃশব্দ ঘাতক তার বুকের মধ্যে জেগে উঠছে এবং তাকে তার চেনা জগৎ থেকে একটু একটু করে এক ধূসর অবসাদের জগতে নিয়ে যাচ্ছে। তপনের ভয় হল না জানি আবার কোন মৃত্যুর মুখ সে দেখতে পাবে।

* * *

মাস তিনেক আগের সেই দিনটার সঠিক তারিখ তার মনে নেই। অক্টোবরের প্রথম দিকে হবে। অফিস থেকে বেরোতে দেরী হয়েছে একটু। সন্ধ্যা পেরিয়েছে। আস্তে আস্তে পথ হাঁটছিলো তপন। চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ধরে উত্তরে হাঁটছিল সে, কলেজ স্ট্রিট হয়ে বাড়ী ফিরবে। গত দিন দুয়েক থেকে তার মন ভালো নেই, চাপা একটা বিষন্ন ভাব, কেন সে জানে না। তার মনে হচ্ছিলো এই যে ব্যস্ত চঞ্চল শহর, এই যে অগণিত মানুষের ধারা, সুখ-দুঃখ, সাফল্য ব্যর্থতা, ভালোবাসা-প্রতারণা সমস্ত কিছু শুধু অর্থহীন ছবি, বিকারের ঘোরে দেখা স্বপ্ন মাত্র। সব কিছু যেন কোনও সুদূর অতীতের ধূসর আলো অন্ধকারময় ইতিহাস। সে এই সব কিছুর বোবা দর্শক, তার সংগে এই জীবনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। এই বর্তমান যেন কোনো দূর অতীতের চলচ্ছবি তার মনে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার এবং আর সব কিছুর মাঝখানে যেন একটা শীতল মৃত্যু সত্য এবং স্থির হয়ে আছে।

মন থেকে সজোরে এবং সশব্দে ভাবনাটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে সে বেশ জোরে গলা ঝাড়লো। একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখলো, তারপর সিগারেট ধরিয়ে আবার চলতে শুরু করলো।

কলুটোলার কাছে এসে রাস্তা পার হবার জন্যে দাঁড়ালো তপন। গাড়ীর দীর্ঘ সারি। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে তপন টের পেলো সে আসছে, সেই ঠাণ্ডা

কুয়াশার মতো বিষণ্ণতা তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেলো সে। ঘটনাটা ঘটলো এই সময়েই।

অন্যমনস্ক তপন প্রাণপণ চেষ্টায় যা ভুলে থাকতে চাইছিলো সেই মৃত্যু, সেই মৃত জগৎ ততোই তার মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় একটু একটু করে নেশার মতো বিস্তারিত হচ্ছিলো। তার পাশে মধ্যবয়স্ক একটি লোক খুব ব্যস্ত ভাবে বিড়িতে টান দিচ্ছিলো এবং খুব সতর্কতার সংগে পথের গাড়ীগুলির গতির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলো। দেখলেই বোঝা যায় তার বড়ো তাড়া, খুব ব্যস্ত মানুষ সে।

এক সময় তপন হঠাৎ মুখ তুলে চাইতেই তার চোখ সোজাসুজি লোকটার মুখের ওপর পড়লো এবং সে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলো। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই সে দেখলো লোকটার মুখের ওপর চামড়া বা মাংস কোনো কিছুর আস্তরণ নেই, শুধু সাদা ধবধবে করোটি সমস্ত কটি দাত উন্মুক্ত করে চোখের শূন্য কোটরে অনন্তকালের অন্ধকার নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটা ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তপনের পায়ের তলা থেকে একটা বরফের টুকরো তার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন মাথার দিকে উঠতে শুরু করলো।

কিন্তু মুহূর্তটা কেটে গেলো এবং তপন দ্বিতীয়বার লোকটার দিকে তাকিয়ে তাকে স্বাভাবিক দেখলো।

আসল চমকটা এলো এর পরের মুহূর্তে। হঠাৎ এক সংগে যেন কলকাতার সমস্ত গাড়ী ব্রেক কসলো, পাশের বহুতল বাড়ীটা যেন ওই সময়েই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো, গাছের অন্ধকারে যে কাকগুলি নিদ্রিত ছিলো তারা সব যেন একই সংগে ওই মুহূর্তে কা-কা করে উঠলো এবং সমস্ত কলকাতার মানুষ ওই বিশেষ মুহূর্তটিতে যেন একই সংগে আকুল আর্তনাদ করে উঠলো,—গেল, গেল, গেল।

তারপর, কিছুক্ষণ আগে দেখা লোকটিকে চিনতে অন্তত তপনের ভুল হয় নি। সেই সাদা-কালোয় ডোরা কাটা জামা, নীল জীনের প্যান্ট, বাটার রাবারের জুতো সব কিছু। প্রাইভেট বাসের চাকা চলে গিয়েছে বুকের ওপর দিয়ে। বাঁচবার শেষ তাগিদে প্রসারিত হাত দুটি কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় রাজপথের ধুলোয় মুঠিবদ্ধ হয়ে আছে।

পুজোর ছুটি কাটলো স্ত্রী রুনি এবং চার বছরের ছেলে বাবুয়াকে নিয়ে মামার বাড়ী জলপাইগুড়িতে।

শহরের পাশ দিয়ে বাঁধ, তিস্তার চর, তিস্তা ব্রীজ থেকে প্রতিদিন সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনায় মোড়া মুকুট, বক্সা পাহাড়, জয়ন্তীর ডাকবাংলোয় রাত, ফুন্ট-শোলিং এর বুদ্ধগুম্ফা, সন্ধ্যাবেলা লুকশানে ডায়না নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এক পৃথিবীর

কাল পার হয়ে শতাব্দীর প্রান্তে অন্য এক অতীত পৃথিবীর মৃদু গান শোনা এই সব স্বপ্নময় আনন্দের মধ্যে তপন আবার নিজেকে খুঁজে পেলো। তার মনের মধ্যে অনেকদিন পর ডানা মেললো আনন্দ। সে যেন ভুলেই গেলো ছুটির শেষে কলকাতায় ডিহি শ্রীরামপুর রোডের বাড়ীতে ফিরতে হবে, রোজ অফিসে যেতে হবে চৌরংগীতে এবং ছুটির শেষে মূর্তিমান বিষণ্ণতার প্রতীক হয়ে ফিরতে হবে বাড়ীতে।

কলকাতায় ফিবে প্রথম কটা দিন ভালোই ছিলো সে। তারপর ধীরে ধীরে কখন আবাব সেই লক্ষণ অনুভব করলো নিজের মধ্যে। দ্বিতীয় ধাক্কাটা তপন খেলো গতমাসে অর্থাৎ নভেম্বরের শেষের দিকে। এবার দিনের বেলায় এতো পরিষ্কারভাবে সে অনুভব কবলো যে মনে মনে নিজের এই অস্বাভাবিকতার জন্যে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলো।

ছুটির দিন। বিকেলেব দিকে সে বেরোলো চন্দননগর যাবে বলে। পার্কসার্কাস ট্রাম ডিপো থেকে একেবাবে সামনের একটা সিটে বসে আসছিলো হাওড়া ষ্টেশনে। সে টের পাচ্ছিলো পুবোণো জ্বরেব মতো তার মস্তিষ্কে, চেতনায় একটা বিষণ্ণতা তাকে একটু একটু করে নির্জীব করে ফেলছে। বড়োবাজারে এসে ভাবলো হাওড়া ব্রীজটুকু হেঁটেই পাব হবে। যখন বয়স কম ছিলো, পড়াশুনো করতো সেই সময়ে কতোদিন হাওড়া ব্রীজের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে থাকতো নীচে জলের দিকে। দেখতো বাদামের খোলাগুলো কতোক্ষণ ধরে নামতে থাকে নীচের দিকে। ছুটির দিন বলে হাওড়া ব্রিজে ভীড কম।

অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে তপনের মনে হ ল আকাশের আলো যেন কমে আসছে, গংগা, মানুষ-জন সব যেন ধূসর ছায়া ছায়া।

ওর পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল একটি তরুণী। মেয়েটির দ্রুতগতিই তপনকে সচকিত করে তুললো, সে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলো। এবং এই সময়েই মেয়েটি হঠাৎ একবার পেছন ফিরে দেখলো—আর স্তম্ভিত তপন স্থবির হয়ে দেখলো—তার দৃষ্টি এক্স-রে যন্ত্রের মতো মেদ-মজ্জা বাদ দিয়ে এক মুহূর্তে একটি ছবি নিলো মেয়েটির অস্থিময় মুখমণ্ডলের, যে মুখ মৃত। পথের লোকজন কেউ কিছু বোঝার আগেই মেয়েটি গংগায় ঝাঁপ দিয়েছিলো এবং তপন পরদিনের কাগজে 'তরুণীর আত্মহত্যা' শীর্ষক খবরটি পড়তেও ভুল করেনি।

*   *   *

কার্জন পার্কে বসে রিজ কন্টিনেন্টাল হোটেলের লেখাটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে তপনের খেয়াল হল রাত হচ্ছে। তার শীত করছিলো। জড়তা ভেঙ্গে উঠলো এবার। প্রথমে ভাবলো চা খাবে, কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে যখন দেখলো সাতটা

বেজে গেছে তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরাই ঠিক করলো। বাবুয়ার জন্যে কি নেওয়া যায় ভাবলো। ছেলেটার কদিন থেকেই জ্বর। কি ধরণের জ্বর এখনো বুঝতে পারা যাচ্ছে না, ডাক্তার বলেছেন আরো দু' একদিন দেখতে হবে। কিছু ফল এবং বিস্কুট কিনে বাস ধরতে এগোলো সে।

রুনি জিজ্ঞেস করলো—"দেরী হল যে?"

—এমনিই।

—চা করি?

—করো। বাবুয়া কেমন আছে আজ?

—কি জানি। দুপুরে ডাক্তার তো দেখে গেলেন। নতুন ওষুধ দিয়েছে।

তপন ছেলের কাছে গেলো। তার মাথার কাছে বসে কপালের ওপর আলতো করে হাত রাখলো। বাবুয়া আচ্ছন্ন চোখে একটু চেয়ে দেখলো বাবাকে, একটা অবসন্ন দুর্বল হাত তুলে তাব কোলের ওপর রাখলো।

—'বুবাই!' তপন আদর করে ডাকলো।

—উঁ!

—এবার তোমার জন্মদিনে একটা ভালো বই দেবো, আর একটা দম দেওয়া বেড়াল।

বাবুয়া বললো—আমি একটা ট্রেন নেবো।

—আচ্ছা।

তপন বাবুয়ার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলো চুপচাপ। ছেলেটার মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেছে। সেরে উঠলে ছেলেটার দিকে এবার একটু নজর দিতে হবে।

কতোক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখেই বুকের মধ্য থেকে একটা চাপা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এলো তপনের। তার সমস্ত শিরা উপশিরায় বয়ে গেল হিম শীতল রক্তের স্রোত। দু'হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে কয়েকটি মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইলো এবং তার পরেই মাতালের মতো টালমাটাল পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। রুনি কিছু টেরও পেল না।

এখন রাত দশটা। রুনি ভাবছে, কি আশ্চর্য্য, গেলো কোথায় মানুষটা?

ডাক্তার এই মাত্র ছেলেকে দেখে গেলেন। বললেন, 'ভালো আছে, ওষুধটায় কাজ হয়েছে। আর চিন্তার কিছু নেই।'

সেই সময় রেল পুলিশের লোকেরা যখন পার্কসার্কাস স্টেশনের কাছে লাইন থেকে তপনের দলা পাকানো শরীরটাকে চটে মুড়ে বাঁশের সঙ্গে বাঁধছিলো, তখন সারা শরীরের মধ্যে অবিকৃত ছিলো শুধু তার মুখটি, সেই মুখে কোনো বিষণ্ণতার ছাপ ছিলো না।

আগুন

আশাপূর্ণা দেবী

কঞ্চির আগালির মত খোঁচা খোঁচা কাঠি কাঠি আঙুল ক'টার হাড়গুলো মড়মড়িয়ে ভেঙে গঁড়ো হয়ে যেতে চাইছে। শরীরের যেখানে যত গ্রন্থি আছে, কে যেন সেখানে নিষ্ঠুর আক্রোশে মোটা গুণছুঁচ দিয়ে বিঁধেছে, এবং ঘাড় থেকে মাজা আর মাজা থেকে ঘাড় অবধি একটা অসহ্য দপদপানি ছুটোছুটি করে ফিরছে।

এ দপদপানি ঠাণ্ডার।

ঠাণ্ডাটা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হয়ে উঠলে কি আগুনের দাহ এনে দেয়? আবার এক এক সময় ওই ছুটোছুটি দপদপানিটা থেমে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে শত্রুতা করে কেউ ওই ধনুকের মত গোল হয়ে যাওয়া শিরদাঁড়াটার ভিতরে কোনো খানে একচাপ বরফ ঠেসে ধরেছে। সেই বরফ গলা হিম জলটা ঘাড় থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে পর্যন্ত নেমে আসছে বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে।

তবু সব থেকে মারাত্মক কষ্ট বাঁশের রলার মতো খটখটে পা দুখানায়। সেই কষ্টে হঠাৎ হঠাৎ ককিয়ে উঠছে বুড়ি, ওরে মা রে, পা দু'খানাকে যেন কুকুরে চিবোচ্ছে রে!

প্রথম প্রথম কথাটা শুনে চমকে ছুটে ছুটে আসত হিমানী লাঠি হাতে নিয়ে। এখন আসেনা। অদৃশ্য কুকুরের কামড়ের প্রতিকার তার জানা নেই।

অতঃপর বুড়ি কপালে হাত চাপড়ে চাপড়ে গাল পাড়ে। আজও পাড়ছিল। ...না, ভাগ্যকে নয়, গাল পাড়ছে বুড়ি তার নাত বৌ ওই হিমানীকে।

প্রথমটা অবশ্য গাল পাড়েনি, ককিয়ে ককিয়ে ডাক দিচ্ছিল অ নাতবৌ, সেই ত্যাখন থেকে যে বলতেছি এখানে খানিকটা কাটকয়লার আংরা করে দে। কানে ঢুকতেছে না? অ নাতবৌ, বলি কথা কানে সেঁদুচ্ছে না? শীতে যে কালিয়ে গেলাম? ও হারামজাদি, এতো অগগেরাহ্যি কেন?

কিন্তু সেই নাতবৌয়ের কোনো উদ্দেশ নেই।

অথচ ওই 'কালিয়ে' যাওয়া যন্ত্রণায় বুড়ি মরণতুল্য কষ্ট পাচ্ছে।...দেবতাও আড়ে হাতে লেগেছে। নইলে এই শেষ পৌষের কনকনানির ওপর তিনদিন ধরে

বৃষ্টি। জোর বৃষ্টি নয়, সারাদিন রাত ঝিমঝিম টিপটিপ। তার সঙ্গে ছুরির ধার কনকনে হাওয়া।

দুপুরে ভাত কটা পেটে দেওয়া অবধি বুড়ি 'আগুন আগুন' করে চিল্লাছে, কিন্তু আগুনের ফুলকিটুকুও দেখতে পাচ্ছে না।

গায়ে জড়াবার কাঁথা কম্বলের সম্বলই বা কতটুকু? শত জীর্ণ একখানা ভোট কম্বল, কতকাল আগের কে জানে, আর তালির ওপর তালি মারা ভারী জগদ্দল কাঁথাখানা বোধহয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের।

বুড়ির যখন নাকি বয়েসকাল ছেলো চোখ বুজে ছুঁচের ছিদ্দিরে সুতো পরাতে পারতো, তখন হরেক রঙের সুতো দিয়ে ওই নক্সি ক্যাঁথাখানা বানিয়েছিল। পাঁচ-রকম রঙের শাড়ির পাড় জোগাড় করতে পাড়ার গিন্নীদের কাছে ধর্ণা দিয়ে রাখতো।

সেই বাহারে 'ক্যাঁথা' খানা অবশ্য নিজের জন্যে বানায়নি বুড়ি যখন না কি তার নাম ছিলো— 'ন বৌ'। বানিয়েছিল বাড়িতে আগুন্তিযাউন্তি কুটুমের জন্যে। যে দেখেছে, ন'বৌয়ের শিল্পকলার সুখ্যাতি করেছে।...এখনো সে গল্প করে বুড়ি।

এ গল্প শুনে হিমানী মুখ বাঁকিয়ে হেসে বলে, ওনার বয়েসকাল! মান্ধাতা-রাজা বোধহয় তখন হামা দিত।

তা হাসতেই পারে, সেই নবযৌবনা ন'বৌকে এই ধনুক হযে যাওয়া বুড়ির মধ্যে থেকে আবিষ্কার করতে পারবে, এতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি হিমানীর নেই। নেই বলেই ওই কাঁথাখানার যৌবনকালকে ও অনুমান করতে পারে না। কালের প্রলেপে যেমন ন'বৌয়ের আজ এই রূপান্তর বছর বছর, কত কত যেন বছর, মোটা ময়লা ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়ের প্রলেপে প্রলেপে কাঁথাখানারও এই দশা।

দিন মাস বছর, বছরেব পর বছব যেতে যেতে অথিতি কুটুমের জন্যে বানানো কাঁথা ক্রমশ, ন' কর্তাব গায়ে উঠেছে, অতঃপব আরো অনেকগুলো গা ফের্তা হযে অবশেষে বুড়ির ভোগে লাগছে।

ময়লা মোটা শততালি যুক্ত বোটকাগন্ধ এ জিনিসে আর কার রুচি হবে? তাছাড়া সংসারে আছেই বা কে? 'জনারণ্য পুরী' এখন শুধু অরণ্যপুরী। নিতাই আর হিমানী, ফাউস্বরূপ একটা পুঁচকে ছেলে। কাঁথাখানা ওজনে কম নয়, রোদে তাতিয়ে গায়ে দিলে এখনো আরাম হয়, কিন্তু কোথায় সে দুর্লভ আরাম? রোদে উঠোন ফাটলেই বা কে ও কাঁথা টেনে নিয়ে গিয়ে রোদে দিচ্ছে? হিমানী? হাত দুটো যার ভিজে ন্যাকড়ার সলতের মত?

তাছাড়া এখন যা চলছে লোকে তো রোদের নাম ভুলে গেছে।...ছাত দিয়ে

জল চোঁয়াচ্ছে না, জানলা দিয়ে ছাট আসছে না, তবু কাঁথা কম্বল দুটো যেন ভিজে টুসটুস করছে।

হাত থাবড়ে থাবড়ে দেখে বুড়ি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে হাঁক পেড়েছে অ-নেতাই, নেতাইরে দেখতো আমার বিছানায় কোথা থেকে জল পড়তেচে। ক্যাঁথা কম্বল দুটোই যে ভিজে শপশপে নাগচে।

নেতাই তার জীর্ণ মলিন র‍্যাপারখানা মুড়িসুড়ি দিয়ে এ দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে, জল আবার কোথা থেকে পড়বে? তোমার ঘরের মাথায় তো ছোটঠাকুর্দার ঘর, কতকাল থেকে চাবি বন্ধ পড়ে আছে।

আর জানলার ছাট?

জানলার ছাটের কথা ওঠে না কারণ এ ঘরে জানলা বলে কোনো বস্তু নেই। সাত শরিকের বাড়ির এক টুকরো অংশ পার্টিশান দিয়ে দিয়ে এই—ন্যায্য ভাগে আনা। ন'কর্তার এই একমাত্র নাতি নিতাইয়ের ন্যায্য ভাগে একতলার যে অংশটুকু পড়েছে তার থেকে বরদা সুন্দরীর ন্যায্য ভাগে পড়েছে এই জানলাহীন তিনদেয়াল ঢাকা অন্ধকূপটুকু।

বরদা বুড়ির খ্যানখেনিয়ে বলেছে, তুই তো বললি পড়বে কোথথেকে? জল তবে এলো কী করে? হাত দে দ্যাখ এসে, ভিজে কি না।

বরদা বুড়ির বিছানা হাত দিয়ে ছোঁবার প্রবৃত্তি তার নাতি নিতাইচরণের হয়না, সে একটু কুটিল হাসি হেসে বলে, তুমি নিজেই ভেজাওনি তো?

আমি? আমি ভিজিয়েচি?

বুড়ি একবার দিশেহারা হয়ে গিয়েই চেঁচিয়ে বলে ওঠে কী বললি মুখপোড়া লক্ষীছাড়া হাড়হাবাতে? ওই হারামজাদী পরিবারের সঙ্গে মিশে মিশেই এতো অধোপ্যাত হয়েছে তোর নেতাই! ওই হারামজাদী যেমন যা মুকে আসে তাই বলে, তুইও তেমনি—

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নিতাইচরণের টিকিটিও নেই অতএব আপনমনে গজ গজ করা ছাড়া আর কী করার আছে। আজ ছুটির দিন, বেইমান মুখপোড়া দু' দণ্ড এসে ঠাকুমার কছে বসতে পারে না? তা বসবে না। সর্বদা সেই সোহাগী বৌয়ের পায়ে পায়ে ঘুরে মরছে।

কাঁথাখানাকে উল্টে উল্টে শুকনো জায়গা খুঁজে বার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় বুড়ি।

কিন্তু সে তো তবু সকালের দিকে।

তখনো পেটে ভাত পড়েনি, আর আকাশও তখন এমন করে পৃথিবীর ওপর হুমড়ে পড়েনি।

এখন অবেলায় সেই স্যাঁৎসেঁতে কাঁথা কম্বল চাপা দিয়ে পরে থাকতে থাকতে বুড়ির শিরদাঁড়ার মধ্যে বরফের ড্যালা গলছে, আঙুলের হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, গাঁটে গাঁটে গুনছুঁচ ফুটছে, আর বাঁশের রলার মত পা দু'খানাকে কুকুরে চিবোচ্ছে।

কী করবে তবে বুড়ি ককিয়ে ককিয়ে না চেঁচিয়ে, অ-নবাবনন্দিনী নক্কীছাড়ি হারামজাদী। বলি সেই থেকে যে চেঁচিয়ে মরতেছি, একখাবলা কাঠ-কয়লার আগুন দে যা এঘরে, তার কী হল?

অনেকবার চেঁচানোর পর নাতবৌয়ের দেখা মেলে। দরজার কাছে এসে বলে কাঠকয়লা কোথায় পাবো?

'কোতায় পাব? বলি বলতে মুকে আটকালো না? কেন গতরে কি ছাতা পড়েছে যে জ্বলন্ত কাটে একছাট জল দে রাক্তে পারো না? কাঠকয়লা আবার কোথায় পায় মানুষ? আকার আগুন থেকেই পায়।

বৌ পাথুরে গলায় বলে, কোন যুগের স্বপ্ন দেখছেন? কাঠ জ্বেলে রাঁধি আমি?

বরদাসুন্দরী হাতমুখনাড়া ঝগড়া সইতে পারেন, সইতে পারেন না এই পাথুরে গলা, তাই নিজের গলাটা ভাঙা কাঁসার মত খ্যানখেনিয়ে বলে ওঠেন, 'তা, কেনই বা রাঁদোনা কাটে? যাতে সংসারের একটু সুসার হয়, তাতে মন যায় না নবাব কন্যের, কেমন?...তা কেন, হেঁশেলে বসে কাটের ধোঁয়া খেয়ে রাঁদতে গেলে যে বর চোকছাড়া হয়ে থাকে। শয়নকক্ষে বরের মুকোমুকি বসে এসটোব্ জ্বেলে চুড়্বুড়্ রাঁদবো, মুকোমুকি বসে খাবো, তবে না বাহার। ইদিকে বুড়ি মরুক। বুড়ির জন্য একটা আদলা পয়সা খরচ করতে বুক ফাটে, নিজেদের সক সৌকিনের কামাই নেই। ...ঠাণ্ডায় আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেতে চাইচে, হাত পা সেঁকতে একটু আগুন চেয়ে চেয়ে মরতেচি, আরতুমি নক্কীছাড়া মেয়েমানুষ সেজেগুজে এসে মুকের ওপর নাক নেড়ে বললে কিনা আগুন কোথথেকে হবে, কাটকয়লা নেই।

হিমানী তেমনি পাথুরে গলায় বলে, না থাকলে কী করব? নাতিকে বলে দেবেন বস্তা ভর্তি কাঠকয়লা এনে রাখতে, মালসা মালসা আগুন করে দিয়ে যাবো।

বরদা ককিয়ে ওঠে, ওরে বাবারে পা যে গেলরে! একটু ডলে দে হারামজাদী। দেখতে পাচ্চিস না শির খেচে ধরেচে।

ওতো সবসময়ই ধরছে—বলে চলে যায় হিমানী।

আসল কথা ওই নোংরা ময়লা বিছানাটায় হাত দিতে ইচ্ছে করে না এখন হিমানীর।...তিনদিন ধরে শাড়ি শুকোচ্ছে না বাধ্য হয়ে আজ হিমানী তার

সুদিনের একটুকরো স্মৃতি একখানা রংচঙে ছাপা আর্টসিল্কের শাড়ি বার করে পরেছে আর সেইটা পরেছে বলেই বাবুনের ঘামাচির জন্যে আনা পাউডারটার তলানি একটু মুখটায় বুলিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়েছে, ইচ্ছে হয়েছে একটা টিপ পরতে।…এখন ওই নোংরা বিছানা আর নোংরা বুড়িকে ছুঁতে মন যায়?

তা এই সাজটুকুও বুড়ির নজর এড়ায়নি দেখে আপাদমস্তক জ্বলে গেলো হিমানীর। শীতে হাত পা তারই কি কালিয়ে যাচ্ছে না? এই বর্ষায় ঠাণ্ডায় সংসারের জুতো সেলাই চণ্ডী পাঠ সব করতে হচ্ছে না? গরীবের সংসারে ঘটা না থাক ল্যাঠাটা তো আছে? আর ওই বুড়ি? তার কন্না করতে হয় না? সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় না? ধরে ধরে দাওয়ার বার করে এনে তাকে মুখ ধোওয়াতে নাওয়াতে প্রাতঃকৃত্য সারাতে হয় না? ভাতের গরস মেখে মেখে সামনে ধরে দিয়ে দুঘণ্টা বসে বসে খাওয়াতে হয়না? আঁচিয়ে দিতে হয় না? খাওয়া থালা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মাজতে হয় না?

থালা মানে পাথরের থালা।

পটপটানি বুড়ির আবার এদিক নেই ওদিক আছে। কাঁসার থালায় খেলে না কি তাঁর শুদ্ধাচার চলে যাবে।

এক একদিন পাথর মাজতে মাজতে হিমানী রাগ করে বলে, আমার থেকে ভারী। দেব একদিন আছাড় মেরে ভেঙে।

নিতাই শুনলে হেসে ফেলে বলে, একরাজা যাবে, অন্য রাজা হবে। পাথরের থালার কি অভাব আছে বুড়ির সিন্ধুকে? কাঁসা পেতলের মত ওগুলো তো আর বেচে খেতে পারেনি!

সব্বস্ব না বেচে, তোমরা যদি আমায় বেচে খেতে তো তোমাদেরও লাভ হতো, আমারও হাড় জুড়তো—বলে পাথরখানাকে সাবধান করে ঘরে তুলতে যায় হিমানী।

এই জন্যেই বুড়ি বলে, মুকে কিচু আটকায় না নক্কীছাড়ির।

হিমানী মুখঘুরিয়ে চলে যেতেই পৃথিবীর পরম নিষ্ঠুরতায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বরদা বুড়ি।

একদা যে মানুষটা ন'বৌ নামে এই বাড়িখানার অভিন্ন চেহারাটার মধ্যে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সকলের কন্না করে বেড়িয়ে 'নাম কিনতো।' বাড়ির তো বটে? পাড়ার জগতি শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীকে পর্যন্ত দ্বাদশীর সকালে তেল মাখিয়ে দিয়ে এসেছে ন'বৌ, একাদশীর সন্ধ্যেয় গা হাত পা টিপে দিয়েছে।

… … …

ওরে বাবারে গেলাম! গেলাম! অ নেতাই, নেতাই! ওরে চোকের চামড়া-

খেগো! প্রাণডা যে বেরিয়ে গেল আমার। তবে দে, এসে গলাটাই টিপে দে যা—যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাই।

... ...

বর্ষাকালে শীতকালে ছুটির দিনে একটা চালাকি খেলে হিমানী—। দুপুরে রান্নার শেষে খানিকটা জল গরম করে নিয়ে চা বানিয়ে কলাই করা পাত্রে ঢেলে ঢাকা দিয়ে রেখে দেয়, আর সেটাই ভাগ করে করে বারে বারে এক কাপ করে এনে বরের সামনে ধরে দেয় কাগজ জ্বেলে গরম করে। ভাবটা যেন না বলতেই বারে বারে এই চা বানানোর ক্লেশটি করছে হিমানী পতিপ্রেমে উদ্বেল হয়ে।

উপায় বা কী, এটুকু চালাকি না খেলে? সংসারের প্রতিটি জিনিস যে অঙ্ক কষে কষে খরচ করতে হয়। পতিপ্রেমে উদ্বেল হয়ে বারকয়েক জনতাটা জ্বাললেই তো রাতের রান্নার সময় স্টোভ জবাব দিয়ে বসবে। মাপা কেরোসিন।

অথচ হিমানী জানে ছুটির দিনে বরাদ্দর অতিরিক্ত এই চাটুকু পেলে কী খুশীই হয় নিতাই। এদিকে আবার তৈরী চা গরম করে খাওয়ার ব্যাপারে নিতাইয়ের একটু আতঙ্কের শুচিবাই আছে। ওতে না কি অসুখ করে।

হিমানী ওকথা বিশ্বাস করে না। এইটুকুতেই যদি অসুখ করত, হিমানী কবে মরে ভূত হয়ে যেত। স্বাস্থ্যবিধির কোন্ বিধিটাই বা পালন করে সে? ওটুকুতে কিছু হয় এ বিশ্বাস নেই বলেই বরের সঙ্গে এই লুকোছাপাটুকু করতে অপরাধ বোধ আসে না হিমানীর। ওর বদলে নিতাইকে যে খুশীটুকু দেওয়া যায় তার দাম কি কম?

চায়ে কাগজ পোড়া ধোঁওয়ার গন্ধ? বয়েই গেল নিতাইচরণের।

সে গন্ধ নাকে যায় নাকি তার? হাতলভাঙা মোটা একটা কাপের মধ্যেকার ওই তরল পদার্থটুকু পরম পদার্থ বলেই মনে হয় তার। ওর সঙ্গে অন্য একটি পরম বস্তুর স্পর্শ কল্পনা করে খুশীর মাত্রাটা আরো বেশী হয়ে ওঠে।

গালের হাড় ওঠা শীর্ণ মুখটায় সেই খুশীর আলোটা মেখে নিতাইচরণ বলে ওঠে, কী কাণ্ড! আবার এক্ষুনি!—না, তোমার এই এতো কাজের মধ্যে এতোবার চা করা! ছি ছি!

হিমানী একটি অপরূপ হাসি হেসে বলে একেবারে 'ছি ছি!' তাহলে দাও ফেলে দিয়ে আসি।

হিমানী এখনো এরকম হাসি হাসতে পারে? নিতাই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়, এবং তখন ওর বিশেষ সাজটুকুর দিকে চোখ পড়ে। হী হী করা শীতে ছেঁড়া র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে বসেছিল, তবু মুখেচোখে, বুঝি বা সর্বাঙ্গে

একটা আহ্লাদের হিল্লোল খেলে গেল নিতাইয়ের। বলে উঠল, কী ব্যাপার? কোথাও বেরোবে না কি?

আহা তা আর নয়। বেড়াবার দিনই বটে!

আরো একটা কথা মুখে এসে যাচ্ছিল হিমানীর, কিন্তু বলল না। পরিস্থিতিটা নষ্ট করতে ইচ্ছে করল না। নইলে বলবার কথা কি ছিল না?···নিতাইচরণের সংসারের ওই গন্ধমাদন পর্বতটিকে ফেলে বেড়াতে যাবার মত বিলাসিতা হিমানীর কবে দেখেছে নিতাই? নেহাৎ দারুণ দরকারে না পড়লে কোথায় যাচ্ছে? তাও সেটুকু সময়ও তো একা রেখে যাবার জো নেই ওনাকে। ছেলেটাকে বসিযে রেখে যেতে হয়।···হিমানীর বন্দীদশা আর ঘুচবে না।

ছেলেটা কত বায়না করে মার সঙ্গে যাবার জন্যে, তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিবৃত্ত করতে কম দুঃখ আসে হিমানীর? কিন্তু উপায় কী? তার এই ছোট্ট সংসারটিতে দুঃখের ভাত সুখ করে খেতে পাবতো হিমানী, সে ক্ষমতা ছিল তার, কিন্তু ওই পর্বতের বোঝা তার সব সুখ পিষে মেরে রেখেছে। তার আহ্লাদের মুহূর্তটুকু খান-খান করে দিচ্ছে।

এসব কথা যে তোলে না হিমানী তা নয়, সর্বদাই তোলে, আজ আর তুলল না। আজ তার অঙ্গে বর্ণাঢ্য সিল্কের শাড়ি, মুখে পাউডারের প্রলেপ। কপালে টিপ চুলে সরু চিরুণীর আঁচড। আজ তাই পরিস্থিতি ভাল রেখে বলে উঠল, কেন? বরের ছুটির দিনে বাড়িতে একটু সাজতে নেই?

কৃতার্থমন্য নিতাই হাস্যবদনে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না বরদাসুন্দরীর ভাঙা গলার চীৎকারটা এসে আছড়ে পড়ল অ নিতাই, নিতাইরে—অ-বেইমান হতোভাগা—মরে গেলাম যে!

কী হল! তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা রেখে উঠে দাঁড়াল নিতাই।

হিমানীও নামকাওয়াস্তে একটু চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, নচেৎ নিতাই নিজের থেকে ভাগ দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে। সেই ভাঙা পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে হিমানী বেজার গলায় বলল, কিছু হয়নি, তুমি খাও তো।

কিন্তু 'খাওতো' বললেই তো হয় না। শাঁখের আওয়াজের মত ওই ভাঙা গলায় আওয়াজটা যে আকাশে উঠছে, ওরে নিম্মায়িক নিষ্ঠুর পোড়ারমুকো ছেলে, দয়া মায়া কি কিছু নেই তোর শরীলে?

ততক্ষণে লেপমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা ঘুমন্ত বাবুনও ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, কী হল?

হিমানী কঠিন গলায় বলে, বলছি কিছু হয়নি, তবু—

কিন্তু নিতাই তো পাথরের পুতুল নয়? পাগল ছাগলও নয়। তাই ঠাকুমা বুড়ির ওই চীৎকার আর আক্ষেপবাণীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বসে বসে চা খাবে? ওতো রোজ সারাদিন দেখে না দেখলে হয়তো কানে ঘাঁটা পড়তো।

নিতাইকে চায়ের গেলাশ নামিয়ে রেখে উঠতেই হয়। বুড়ির ঘরের দরজায় গিয়ে জিগ্যেস করতেই হয় কী হল?

কণ্ঠস্বরে ঈষৎ সহৃদয়তা ফোটায়।

আগুন! আগুন! সোনা আমার দাদা আমার, এক ফোঁট্টা আগুন আমায় দে যা ভাই।

নাতিকে দেখে, অথবা ওই সহৃদয় স্বরটুকুতে বুড়ি গালমন্দের পথ ছেড়ে মিনতির পথে নামে, বুকে পিঠে খাল ধরে গেল মাণিক, হাত পাগুনো কুকুরে চিবোচ্ছে। ভেতরের সব রক্ত হিম হয়ে গেল, একটু সেঁকতে না পারলে এক্ষুনি মরে যাব দাদা। তোর বোর কাচে ত্যাখন থেকে ধন্না দিচ্চি, তা বলে গেল কিনা—কাটকয়লা কোথা পাবো? আগুন টাগুন হবেনি। আমার ইদিকে প্রাণডা ঠোঁটের আগায় এসে যাচ্চে।

এহেন কাতরোক্তিতে কে পারে অবিচলিত থাকতে? অন্ততঃ পুরুষ মানুষে পারে না। আর কী তুচ্ছ জিনিসের জন্যে এই করুণ আবেদন!

একটু উত্তাপ! একটু উষ্ণতা।

খানিকটা আগুনের পরিবর্তে যেটুকু পাওয়া যায়। আকাশের এই আবহাওয়ায় ওই বিরানব্বই বছরের বুড়ির তো সেটুকু ন্যায্য প্রাপ্য। অথচ নাতির সংসারে—সেই ন্যূনতম প্রাপ্যটুকুও পাচ্ছে না বুড়ি। বরং এই ঘন্টাকতক আগে ঠাকুমা যখন স্যাঁৎসেঁতে কাঁথা কম্বলগুলো নিয়ে কাতরোক্তি করেছিল, নিতাই তখন একটা হালকা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে সরে পড়েছিল।...তার কারণ নিতাইয়েরও রাত্তিরে বিছানা বালিশ লেপ কম্বল সব ভিজে ভিজে লেগেছে, তবে নিতাই জানতে যায়নি জল পড়ে ভিজেছে।

এই তিনপুরুষের পচা পুরনো বাড়িতে জীবনে যাতে মিস্ত্রির হাত পড়তে দেখেনি নিতাই, ঘরগুলো বালিখসা ছাদগুলো ঝুলে পড়া, সেখানে এহেন দুর্যোগে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক তা বোঝে নিতাই। অভিজ্ঞতাই বোঝায়। কিন্তু বহু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় জমতে জমতে অভিজ্ঞতায় যখন শ্যাওলা পড়ে যায়, তখন সে অবুঝ আর্তনাদে অন্যকে অস্থির করে তোলে।...

নইলে বরদা বুড়ির কি বোঝা উচিত ছিল না—এযুগে ভাতের চেয়ে জ্বালানীর দাম বেশী? আর অভাবই মানুষকে নিষ্ঠুর করে তোলে?

কিন্তু বুড়ির সেই ত্রুটির কথা এখন মনে এল না নিতাইয়ের।

লজ্জায় মাথা কাটা গেল নিতাইয়ের।

নিজেকে ঠাশ ঠাশ করে চড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করল। ভয়ানক পাপী মনে হল নিজেকে।

বিব্রত বিপন্ন অসহায় অসহায় মুখ নিয়ে তাড়াতাড়ি আবেদন করতে যাচ্ছিল বিপদতারিণীর কাছে, জল বল, আগুন বল সবইতো তার হাতে। কিন্তু যেতে হল না, ঘাড় ঘোরাতেই তার মুখ দেখা গেল।...কিন্তু ওই মুখ কি বিপদতারিণীর?

নাকি আগুনটা সে তার মুখেই বয়ে নিয়ে এসেছে? সেই আগুনটা ছড়িয়ে পড়ল নিতাইয়ের কানে প্রাণে।

'প্রাণডা' একেবারে ঠোঁটের আগা পর্যন্ত চলে এসেছে? আহা। চুক চুক। আর একটুকখানি পথ পার করে বাইরে বের করে আনতে পারলেন না? নাতির হাতে আগুনটুকু তা হলে কপালে জুটতো। আগুনের সাধ মিটতো।

এ ভাষা কি নিতাইয়ের অপরিচিত?

এমন ধরনের কথা কি হরবখৎই শুনছে না সে? তবু ঠিক এই মুহূর্তে এই মলিন নির্লজ্জ কথাটা হজম করে উঠতে পারল না, চেঁচিয়ে উঠল, হিমানী!

হিমানীর মধ্যে অবশ্য এতে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। হিমানী অবিচল গলায় বলে উঠল, খারাপ কি বলেছি? ওটুকুও যদি বরাতে জোটে, বলতে হবে পরম ভাগ্যি। তা কি আর হবে? যা দেখছি যাত্রা নাটকের পালা সাঙ্গ করে একেবারে শতরঞ্চি গুটিয়ে তবে ঘরে ফিরবেন। না কি হয়তো ফিরবেনই না, চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম নেই, বিধাতার কাছে অমর বর নিয়ে এসেছেন।

থামো! যতসব বাজে কথা!

নিতাই প্রায় স্বভাব ছাড়া জোরের সঙ্গে বলে ওঠে, একটু আগুনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষুনি।

হিমানী স্থির গলায় বলে, কী করে? জনতাটা জ্বেলে এনে বসিয়ে দেব? তাহলে কিন্তু রাতে খাওয়া বন্ধ। আর অগ্নিকাণ্ড হলে আমায় দোষ দিও না। সেবারের হ্যারিকেনের কথা মনে আছে তো?

হ্যাঁ মনে আছে বৈ কি। এই তো গেল শীতের কথা। কম্বলের মধ্যে হ্যারিকেন ঢুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে বসেছিল বুড়ি।

নিতাই একটু নরম গলায় বলে, ওসব কেন? আর কিছু নেই?

আর কি থাকবে? থাকতে আমার হাত-পাগুলো।

আঃ। মানে, কয়লা-টয়লা ? গুল-টুল ?

নেই। রান্নাঘরের চালা ভেঙে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত তো ওসবের পাট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কী আশ্চর্য ? তা বলে একটু আগুন হবে না ? আচ্ছা, আমি দেখছি। বলে গট গট করে চলে যায় নিতাই, এবং খানিক পরে একখানা ভাঙা লোহার কড়াইতে করে গনগনে খানিকটা আগুন এনে ঘরে ঢোকে।

ব্যাপারটা কী ঘটল তা অবশ্য হিমানীর বুঝতে বাকি রইল না। সেই চালা পড়ে যাওয়া রান্না ঘরটার মধ্যে ঢুকে সাবেককালের প্রকাণ্ড ওই ভাঙা কড়াইখানা সংগ্রহ করে, সেই চালাভাঙা বাঁশ বাখারি কাঠকুটো থেকেই চারটি ভেঙে চুরে কেরোসিন ঢেলে জ্বেলে নিয়ে এসেছে নিতাই। সাড়াশব্দে সবই টের পেয়েছে হিমানী।

কিন্তু কেরোসিনটা এলো কোথা থেকে ? বোতলে তো ছিল না। বোতলে ছিল না, জনতা স্টোভটাই উপুড় করে ঢেলে নিয়েই কাজ চালিয়েছে।

অব্যাপারেষু ব্যাপার ! ঢেলেছে দেদার।

হাউহাউ করে জ্বলেছে, দালানের দেয়ালে তার ছায়া পড়ছিল।…মাপা তেল। তার মানে রাত্তিরের রান্নায় ঘাটতি।

অনভ্যস্ত হাতে অগ্নিকাণ্ড না করে বসে এভয়ে বুকটা কেমন করে উঠলেও, হঠাৎ ছাপা সিল্কের শাড়ির আঁচলটা তুলে কপালের টিপটা খসখস করে মুছে ফেলে, দাঁতে দাঁত চেপে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাড়িয়েই থাকল হিমানী যেমন ছিল। নড়ল না।

… … …

চৌকীর ধারে একটা টুলের ওপর কড়াইটা বসিয়ে দিয়ে নিতাই রীতিমত আত্মপ্রসাদের ভঙ্গীতে জোরালো গলায় বলে, নাও বুড়ি, যত পারো হাত পা স্যাঁকো। রুটি সেঁকার মত।

কঞ্চির খোঁচার মত আঙুলগুলোকে প্রায় আগুনে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে, সেঁকতে সেঁকতে বুড়ি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে বেঁচে থাকো দাদা, দীর্ঘোজীবী হও। আকাশে যত তারা তত বছর পেরমাই হোক।

… … …

আগুনের আঁচে বুড়ির মুখটা আলোয় ভরে উঠেছে। আগুনের আলো আহ্লাদের আলো। হাত পা সেঁকতে সেঁকতে সারা শরীরের মধ্যে উত্তাপটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, জমে বরফ হয়ে যাওয়া রক্তে সাড় আসছে।

এ উত্তাপ কী শুধুই আগুনের ? না আর এক উত্তাপের স্বাদ ?

বলীরেখায় ভরা, যন্ত্রণা আর ক্ষোভে কুঁচকে যাওয়া মুখটার রেখাগুলো যেন আস্তে আস্তে আলগা হয়ে আসে, ক্রমশ ফুটে ওঠে এক চিলতে হাসির আভাস। কৌতুকের আর দুষ্টুমীর হাসি। ফিস ফিস করে বলে, সাধে কি আর বলেরে নিতে ঘরের ব্যাটা মারে আবার ধরে, পরের বেটি ঠিকরে ঠিকরে মরে। তুই আমার কষ্টটা যত বুঝলি, ও ছুড়ি কি আর—তা দোষই বা দেব কী? চৌপর দিন খেটে মরছে—কাঁহাতক আর পারবে।

এক গুঁড়ো সুখ।

এক ফোঁটা আরাম।

ক্রুদ্ধ চিত্তকে উদার করে আনছে।

… … …

তুইও হাত দুখানাকে একটু সেঁকে নে না দাদা!

ধ্যেৎ, আমি আবার কী জন্যে? আমি তোমার মত বুড়ো?

লোভটা প্রবলই হচ্ছে, তবু লজ্জাটা ততোধিক, একজোড়া চোখ যে এই দৃশ্যের উপর নিথর হয়ে পড়ে আছে।

বুড়ি ফ্যাঁসফেঁসে হাসি হেসে বলে, তা যা বলেচিস। কতায় আচে জাড় বড় আড, বুড়োর ভাঙে ঘাড়।…নাতবৌ বাইরে হিমে দাঁড়িয়ে কেন, ইদিকে আয় একটা কতা বলি শোন।

দেয়ালের ধার থেকে নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় হিমানী।

বরদা সুন্দরীর সহৃদয় গলা থেকে উচ্চারিত হয়, রাঁদা বাড়া বাকি তো?

—হ্যাঁ।

আরো কোমল হয়ে আসে গলা, আমার পরামশশো শোন। আজ আর এই হিমে শীতে ময়দা চটকাতে বসতে যাসনি। আমার কতা নে—এই আংরাটাতে আর চাড্ডি গুল কয়লা কিছু ফেলে দে। আঁচ জ্যাকিয়ে উঠলে বেশী করে গোটা কতক বেগুন পুড়িয়ে ফেল। তার সঙ্গে—

বেশী করে গোটাকতক বেগুন।

হিমানীর মুখে একটু বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, কি হবে? রুটির বদলে খাওয়া হবে?

আ গেল ছুঁড়ির কতা। শুদু বেগুনপোড়া না কি? দু'খোলা চাল ভেজে নেবার মুরোদ তো আর তোদের একেলেদের নেই। একবাটি করে মুড়ি মেকে নে ঝাঁজ ঝাঁজ তেল আর কাঁচা লঙ্কা দে। দেকবি অমর্ত হেন নাগবে।

মুড়ি বেগুন পোড়া।

হিমানী কুটিল গলায় বলে, আমাদের কথা থাক, তাতে আপনার পেট ভরবে ?

কণ্ঠের এই কুটিলতার কারণটা অকারণ নয়। বুড়ির সকালের 'খোল'। হিমানী নিতাই বাবুন তিনজনে মিলে যতটা খায়, বুড়ি একা তার থেকে বেশী খায়। ভাত-রুটি দুইই।

কিন্তু বুড়ির বোধের জগতে এই ওজনের হিসেব নেই, তাই সে সহজ বিস্ময়ে বলে ওঠে, শোনো কতা! ভরবেনা কি লা? বলে ভরা বয়েসেই এমন শীতের রাতে কতদিন! একটু হেসে ওঠে বুড়ি। বাড়ি সুদ্দু সকলের আহার মিটলে শেষমেষ থাকতাম আমরা চারজা। ত্যাখন ভাতটাত যেত ঠাণ্ডা হয়ে, হাঁড়িতে দু'ঘটি জল ঢেলেদে, 'আকার আংরা টেনে নে পুড়িয়ে নিতাম গুচ্চিরখানি ঢোলা ঢোলা বড় বড় মুক্তকেশী বেগুন, আর ভেজে নিতাম দু'খোলা চাল। ব্যস চার জায়ে গালগপপো আর ওই কাঁসি কাঁসি চালভাজা তার সঙ্গে থাবা থাবা বেগুন পোড়া। তাতে ঝাঁজ ঝাঁজ ঘানির তেল, আর কটমটে কাঁচা নঙ্কা! আহা, অমত্য। একনো যেন মুকে নেগে আচে!...বলে কিনা পেট ভরবে না, ভাত বেন্নুনের থেকে বেশী ভরতো লো!...মেজ জায়েরই ছেলো এই সব চেষ্টা বেশী। বলতো পেত্যেক্ দিন একঘেয়ে ভাতডাল। শীতের রাতে হাঁড়ির তলানী! দূর দূর এ বাবা বেশ নোতুনত্ব।...

হিমানী ব্যঙ্গের গলায় বলে, চারজায়ের ভরা বয়েসের পেট ভরা। তা কতো বেগুন পোড়াতেন।

বুড়ি ফ্যাসফেঁসিয়ে হেসে ওঠে, সে কি আর গোণাগুণতি করে লো? বেগুনের ঝুড়িটাকে হেঁসেল ঘরে নে এসে বসাতাম, টপাটপ আগুনে দিতাম আর উল্টে পাল্টে জব্দ করে ফেলতাম। আহা ত্যাখনকার সেই বেগুনের গুণই বা কী। মাখম হার মানে। আগুনের আঁচ লাগচে কি নেতিয়ে শুয়ে পড়চে।...আর সদ্য গরম চাল ভাজা।

আহা। কী তার বাস, কী তার সোয়াদ! আংরাটা একটু জ্বাকা নাতবৌ, একদিন আরাম করে সবাই মিলে একত্তর বসে—তেমনি করে—

হিমানী বরের দিকে তাকিয়ে ধারালো ছুরি গলায় বলে ওঠে, কই গো জ্বাকাও আগুনকে? আর ঢোলা ঢোলা বেগুনের ঝুড়িটা নিয়ে এসে বসাও এখানে।

আগেলো ঢঙিনী। বলি তোরা কত খাইয়ে যে ঝুড়িভত্তি নাগবে? গোটা ছয় সাত পোড়ালেই হবে।...ইদিকে তো তেমনি তোর অন্ন খাটনি বাঁচবে। খরচাও বাঁচবো...

সেতো দেখতেই পাচ্ছি।

হিমানী বলে, যাও ! গোটা ছয় সাতই নিয়ে এসো—

বরদা বুড়ি বেজার গলায় বলে, ও পুরুষ ছেলে ওকে ফরমাস কেন নাতবৌ ? তোমার গতরে কী হল শুনি ?

নিতাই অমায়িক গলায় বলে ওঠে, বুঝছনা ঠাকুমা, তোমার নাতবৌ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। আজ ঘরে বেগুনই নেই। বিষ্টির জন্যে বাজার যেতে পারিনি তো—

অ মা ! তাই বুজি ?

বুড়ি হতাশ গলায় বলে, তবে থাক, কালকেই হবে। অনেক দিন পরে মনে পড়ে গে মুকটা উসখুসিয়ে উটেছেলো।···তবে যাক তোর বৌ ময়দা চটকাতে, আমি ত্যাতোক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই। বড আরাম হলরে দাদা ! দ্যাক্ কঁ্যাতাখানা সুদ্ধু তপ্ত হয়ে উটলো। আঃ !

ভাল করে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে বুড়ি বলে, কাল একটু দেকে শুনে মুক্ত-কেশী বেগুনই নে আসিস নিতাই ! ত্যার ঘেরাণই আলাদা।

•• চোখটা বুজে আসে, সুখসুপ্তির পথ বেয়ে যেন ফেলে আসা কোন্ দূর দূরান্তরে পৌঁছে যায় বুড়ি।

দেখতে পায়—

কোথাকার একটা মেটে রান্নাঘরের মধ্যে গনগনে আঁচ কাঠের উনুনের সামনে বসে দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী এক বৌ বড বড় বেগুনের গায়ে তেল মাখাচ্ছে আর উল্টে পাল্টে পুড়িয়ে নিয়ে তুলছে।···বেগুনের জল মরার শেঁা শেঁা শব্দ উঠছে, লোভনীয় একটি ঘ্রাণে শীতকালের দোর জানলা বন্ধ চালা ঘরটা যেন 'ম ম' করছে।

ওদিকে আর একজন মেয়েছেলে বাঁশের চালুনিতে ভাজা চালগুলো ফেলে হাত ঘসে ঘসে বালি ঝরাতে ঝরাতে হেসে হেসে বলছে,—ন'বৌ আমাদের চালাক মেয়ে। বুজে বুজে ভাল কাজটি বেচে নেচে ! অগ্নি দেবতার একেবারে সামনা সামনি।

ন'বৌ হেসে বলে, তবে কাজ বদল করে ন্যাও।

না বাবা ! তোর মতন অমন মাখম হেন করে বেগুন পোড়াতে আমরা পারিনে।

'রা' মানে আরো দু-জন, তারা ততক্ষণ হাঁড়ি হেঁসেল তুলছে, সাফ সুৎরো করছে। তাদের একজন বলে ওঠে, ন' বটঠাকুর কাল কি বলছিলেন দিদি শুনেছ ? ···বলেন কিনা রান্নাঘর তোমাদের দখলে আমাদের আলাই বালাই দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেরা বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে ভালমন্দটি সাঁটা হয়।

দিদি বলে ওঠেন, কখন বলল? মহারাণীর কাচে বুঝি? আমার সামনে বলুক দিকি একবার, ঝেড়ে শুনিয়ে দেব না।

আহা ওতো ঠাট্টা করে।

আমিও ঠাট্টা করেই বলব। ওনাদের আলাই বালাই? বটে! মাচের মুড়োটি, দুধের সরটি, দইটি ক্ষীরটি কাদের পাতে পড়ে শুনি?···আমাদের ভাল মন্দ তো নিঃখরচায়। জালার চাল, পয়সায় দু সের বেগুন, আর গাচের কাঁচা নঙ্কা!

হেসে ওঠে চারজনেই।

কী মনোরম সেই দৃশ্য!

কী মধুর পারিবারিক সেই ছবি!

এখন আর কেউ কারো সঙ্গে হাসি গল্প করে না, সব কেজো কথা। কিন্তু এখন বুড়ি আর এই দুঃখেরকালে নেই, চলে গেছে দূর কালের···হারিয়ে যাচ্ছে সেই মনোরম দৃশ্যটার মধ্যে।···যেখানে একটা শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে একটা লোভনীয় গন্ধ দৃশ্যটাকে আরো রমণীয় করে তুলছে।···ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বুড়ির মুখের রেখায় রেখায় একটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ছাপ।

ঠিক তখন আর একটা বৌ, বোধকরি সেই ন'বৌয়েরই বয়সী, একতাল চোকড়ের আটা ঠাশতে ঠাশতে তিক্ত চিত্তে ভাবছিল একটা নিষ্প্রয়োজনীয় মেয়ে মানুষের বিরানব্বই বছর বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকার মত অশ্লীল আর কী আছে?···নাঃ, আছে। ওর চাইতেও অশ্লীল হচ্ছে সেই বিরানব্বই বছরের জীর্ণ জঠরের চিরজ্বলন্ত গনগনে আগুনটা। যে আগুন দু দুটো জোয়ান মানুষের খাদ্য অবলীলায় পরিপাক করে ফেলতে পারে।

গনগনে আগুনের কথা মনে পড়তেই বৌটার মেজাজটা আরো গনগনে হয়ে উঠল। তুচ্ছ একটু আগুনের জন্যে কত কষ্টই পায় সে। আগে তবু একটা উনুন থাকতো, রুটি সেঁকা হতো চক্ষের নিমেষে। রাতের রান্নায় সময় কত কম লাগতো।

রান্নাঘরের চালা পড়ে যাওয়া পর্যন্ত শোবার ঘরে রান্না। জনতা কুকার সার। আগুন কেমন দেখতে তা যেন ভুলেই গেছে বৌটা।

···শীতের দিনে নিজের চানের জন্যে একটু গরম জল, সে তো স্বর্গীয় বিলাসিতা।···গরম জলে সাবান ভিজিয়ে কাপড় কাচা? সে কথা আর ওঠে না।

আর উঠবেও না।

কয়লার আগুনের চাইতে যে কেরোসিন স্টোভের খরচা অনেক কম সেটা জানা হয়ে গেছে নিতাইয়ের।

গোকুলের জীবন সংক্রান্ত

অনীশ ঘোষ

বিয়ের প্রথম রাতেই গোকুল তার বউকে বলেছিল—'এই আমার সম্পত্তি, এ সবের ভার এখন থেকে তুমি নাও।'

তো সম্পত্তি বলতে ভোলা শীল লেনের পুরোনো বস্তিতে ছ হাত বাই আট হাত সাইজের গ্যারেজ মার্কা একটা বেঁটে ঘর, ইঁট দিয়ে খাড়া করা এক পা ভাঙ্গা একটা তক্তাপোষ, বহুকাল আগের একটা ফ্যাকাশে ও তোবড়ানো সুটকেশ, দুটো থালা, একটা বালতি, স্টোভ, রেডিও ইত্যাদি। পোশাক আশাক বলতে গেঞ্জী ও আণ্ডারওয়ার একটা করে আর দুটো জামা, পাজামা একটা, লুঙ্গী একটা। ঘরে কোন আয়না রাখেনি গোকুল। অবশ্য নতুন বছরের এক খানা ক্যালেণ্ডার দরজার উল্টো দেওয়ালে লটকে আছে। তাতে জীনাত আমন বুক দেখিয়ে হাসছে। সিগারেট কোম্পানীর এই ক্যালেণ্ডার টা গোকুলের খুব প্রিয়। যদিও সিনেমায় গোকুলের কোন নেশা নেই। তার নেশা অন্যত্র। যাই হোক, এই হোল গোকুলের পুরো সংসার। তো এতোদিন তার এই সংসার দেখার মতো কেউ ছিল না। প্রায় দিনই খাওয়াদাওয়া পথে ঘাটেই সারতে হয়। গ্যারেজ ঘরেও ঠিকমত ফেরার কোন তাগিদ নেই। সংসারে টান বলতে কিছু ছিল না। যদিও প্রতিমা ওকে মোটামুটি গভীর ভালোবাসে, তবু রোজ রাতের বেলা খদ্দেরটদ্দেরদের ঝামেলা মিটিয়ে, গা গতরে ব্যথা নিয়ে, সেই ভালোবাসা এতোটা দীর্ঘ হয়নি যে গোকুলের খিদের সময় যত্ন করে বসে খাওয়াবে, শরীর খারাপ হলে জোর করে ডাক্তারের কাছে পাঠাবে অথবা প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দেবে।

সারাদিন, কখনো সখনো সারা রাত, বড় মেজো ছোট আকারের ট্রিপ মেরে মাঝে মধ্যে গোকুলের লরী যখন ওঁ মা কালী অটোমোবাইল্সের খোলামেলা বিরাট চত্বরে একটু রেস্ট নেয়, সেই ফুরসতে হাতের কাছে একটা মেয়েছেলের শরীর আর তার সাথে দু-একটা মেড ইন কামদেবপুরের বোতল টোতল না পেলে গোকুলের মেজাজটা ভারী খিঁচড়ে যায়। তো সেই প্রয়োজনেই এতোদিন প্রতিমা ছিল। এবং মেয়েটার মনের কোথাও ওর প্রতি একটা আন্তরিকতার পুকুর খোঁড়া ছিল। যখন তখন গোকুল খুশীমতো ওর শরীর ঘাঁটাঘাঁটি করেছে—চওড়া হাতের খেয়ালী-

পানায় প্রতিমার শরীরের রঙ পর্যন্ত পাল্টিয়ে দিয়েছে—খিস্তি খেউড় করেছে—প্রতিমা সব মুখ বুজে সহ্য করে নিয়েছে। কেননা হাটখোলার সারিবাঁধা টিনের চাল ওলা সরু সরু খুপরি ঘরের মেয়েমানুষ হলেও পাঁচছ বছরের একটানা আনা-গোনায় প্রতিমা গোকুলকে কিছুটা হলেও ভালোবেসে ফেলেছিল। এই প্রতিমাই বারবার বলেছে 'এ্যাতো বয়েস হোল, আর কদ্দিন এরাম ছাড়া গরু হয়ে থাকবে? এবার এট্টা বিয়ে থা করো। শেষ বয়েসে একটা দেখার মানুষও তো চাই।'

গোকুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে ওঁ মা কালী অটোমোবাইল্‌সের হেড মেকানিক আদিত্য, খালাসী হরি আর দিশী মদের দোকানের ম্যানেজার দীননাথ বাবু। তিনকুলে কেউ নেই। এদের পীড়াপিড়িতে, বিশেষত: প্রতিমার নাছোড়বান্দায় এতোদিন না না করেও শেষে বিয়াল্লিশ পার করে দিয়ে গোকুল মাথায় টোপর চাপিয়ে ফেললো। এই বিয়েতে প্রতিমা তার লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙ্গে জমানো টাকায় গোকুলকে একটা দামী ফুরফুরে ধুতি আর বউয়ের জন্যে একটা মোটামুটি দামী সিল্কের শাড়ী উপহার দিয়েছিল। গোকুলের যথেষ্ট আপত্তি না শুনেই। তো সেই ধুতি পরে মুচিপাড়ার বিলিতি ব্যাণ্ড বাজিয়ে গোকুল, হালদার বাগানের কেষ্ট পালের মেয়ে রমাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। ওর বিয়ের গোছগাছ সব প্রতিমাই করেছে। হরিও দস্তুরমতো খেটেছে তার ওস্তাদের বিয়েতে। বরযাত্রী থেকে বৌভাত—কম ঝক্কি তো নয়! মানুষ জন বেশী নাই বা এলো, পুরুত আর নাপিত তো অন্ততঃ আনতে হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রতন্ত্র গুলো কি ফেলনা?

যাই হোক, গোকুলের বৌভাত প্রতিমার ব্যবসার গদীতে শুধু মদ্য আর মাংস সহকারে বেশ রমরম করে নির্বিঘ্নে কেটে গেলো। অজস্র দেশীয় তরল পান করে গোকুলের পেটটা যখন সদ্য পাম্প করা ব্লাডারের মতো ফুলে উঠলো আর মুখ দিয়ে হিন্দী ফিল্মের মশলা সংগীত নিজস্ব সুরে গুড় গুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকলো তখন প্রতিমা বুঝল যে এবার গোকুলের বাড়ী ফেরা উচিত। আর দেরী করলে তাকে এখান থেকে নড়ানো মুস্কিল হবে। এরপর সে আর হরি অতিথিদের সব বিদেয় করে দিয়ে ধরাধরি করে গোকুলকে একটা রিক্সোয় চাপিয়ে দেয়। হরি অবশ্য ওস্তাদের সাথে সাথেই এসেছে। কিন্তু গোকুলের পান্থশালায় পৌঁছে রিক্সো থেমে নামতে গিয়েই গণ্ডগোলটা ঘটে যায়। প্রিয় কুকুর কালুকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আদর করতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে রাস্তার পাশের বড় নর্দমাটার মধ্যে চলে যায় গোকুল। ঘর থেকে দেখতে পেয়ে নতুন বৌ রমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। তারপর গোকুলের প্রায় দুমনী বস্তাটা অনেক কসরৎ করে দুজনে মিলে তুলে আনে সেখান থেকে। ঘরে ঢুকেই কিন্তু গোকুল নিজের বিছানা চিনতে পারে। তারপর

সেই বিছানার ডান কোনে সম্রাটের মতো গ্যাঁট হয়ে বসে গোকুল রমাকে ডেকে বলে 'এই আমার সম্পত্তি, এ সবের ভার এখন থেকে তুমি নাও।'

তখনও ওর গায়ে নর্দমার যাবতীয় নোংরায় মাখামাখি ধুতিপাঞ্জাবী। আর তার থেকে একটা অবর্ণনীয় জয়েন্ট সেন্ট হাওয়ায় ভাসছিল। মাথাটা বার বার বুকের কাছে ঝুলে পড়ছিল। নাকের পাটা টলমল করছিল। কিছু সময় ধরে বেশ কয়েক বার 'আমার সম্পত্তি' কথাটা টেনে টেনে উচ্চারণ করে গোকুল হুড়মুড় করে রমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।

রমা নতুন বউ হলেও বেশ বুদ্ধিমতী। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত কর্পোরেশনের স্কুলে ফ্রি অফ কস্টে পড়াশুনো করেছে। বাপের পান বিড়ির দোকানে বসে বসে লোকজন ঠেকানোর কায়দা কানুন গুলোও ভালোই রপ্ত করেছে। ও গোকুলকে বললো 'সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। এখন শুয়ে পড়ো, আমি বাতাস করে দি।' তারপর ময়লা কাপড় চোপড় ছাড়িয়ে নিতে নিতেই গোকুল সেই যে সটান শুয়ে পড়লো, পরের দিন সূর্যমহাশয় যখন একচেটিয়া আলোর গুঁতোয় বাড়ীঘর, গাছ পালা, মানুষ জনকে নাজেহাল করে ছাড়ছে, তখনই গোকুল চোখ খুলে চারপাশে চেয়ে চোখে ও গলায় যথেষ্ট আকুলতা ঝুলিয়ে বললো 'আমার বউ কোথায়?'

গতরাতে রমা সেজেগুজে গায়ে আঁচল জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে লক্ষীপ্রতিমার মতো জানলার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে যখন গোকুলের জন্যে অপেক্ষা করছিল তখন কোথা দিয়ে আকাশে গভীর রাতের চাদর পাতা হয়ে গেছে বুঝতেও পারেনি। বসে থেকে থেকে ঘুম যখন ওর চোখে বেশ জোরালো হাজিরা দিতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়, তা রাত প্রায় দুটো আড়াইটে হবে, গোকুল বাড়ী ফিরতে গিয়ে ওই কেলেংকারীটা বাঁধিয়ে ফেলে। পরে সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেও বাকী রাতটা রমার আধো ঘুমে অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে কেটেছে। কাকভোর থাকতে উঠে স্নান সেরে সে রান্না করতে বসেছে। আগের দিন প্রতিমাই হরিকে দিয়ে বাজারহাট করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীওলার বৌ রাজলক্ষী অবশ্য বঁটি আর শীলনোড়া ধার দিয়ে বলেছিল—'কিছু লাগলে বোল। নতুন বৌ—আমাদেরি তো সব দেখতে হবে। ওটাতো একটা মদোমাতাল। কোন হুঁশগম্যি নেই।' রমা অবশ্য এ কথার কোন জবাব দেয়নি। তবে মানুষটার প্রতি তার একটা আকর্ষণ জন্মেছে। আর রাজলক্ষীর প্রতি রাগ।

আজ আর হরি এদিকপানে একবারও আসেনি। বোধ হয় আন্দাজ করেছিল আজ আর গাড়ী বেরুবে না। তাছাড়া নতুন বৌও হয়তো কালকের ব্যাপারে খচে ফায়ার হয়ে আছে। কাল আর অত রাত্তিরে কিছু বলেনি, আজ পেলেই নির্ঘাত

একচোট নেবে। তাই ও মনসাতলায় সরকারদের গ্যারেজে গিয়ে বসে থাকলো সকাল থেকে।

অনেকদিন পর আজ নিজের ঘরে আসন পেতে বসে খাওয়ার সময় গোকুলের মায়ের কথা মনে পড়ে। খুব ছোটবেলায় ও যখন গাঁয়ের স্কুলে পাঁচ ক্লাসে পড়ে তখন ওর মা হঠাৎ একদিন বুকের ব্যাথায় মারা যায়। বাবা নাকি সংসারের ঝক্কিঝামেলা সইতে না পেরে গোকুলের জন্মেরও আগে দুনিয়া থেকে সরে পড়ে। গোকুল ওর মায়ের আঁচল ধরেই বড় হচ্ছিল। তখন ওর বয়েস আর কতই বা, এগারো বারো হবে। ততদিন বিপদে আপদে গোকুলকে দেখার মতো শুধু মা'টাই ছিল। ছোট বেলা থেকেই গোকুল খুব দুরন্ত। সুযোগ পেলেই এটা ওটা ঝঞ্ঝাট বাঁধিযে বসতো। গাঁয়ের সাতঘর লোকের মুখঝামটা থেকে মা'ই ওকে দূরে দূরে রেখেছিল। তো সেই মা যেদিন মবে গেলো, গোকুলের পায়ের নীচের জমি আলগা হয়ে গেলো। আর কোন ভাই বোন কেউ ছিল না। গাঁয়ের হরিহর বাবু গোকুলকে স্নেহ করতেন। শহবে ওঁর চশমার দোকানের বিজনেস ছিল। মা মারা যাওযার পব গোকুল যখন সারাদিন বাউণ্ডুলের মতো এদিক সেদিক ঘুবে বেড়াতো, কেউ ডেকে খাওযার কথাটুকুও জিজ্ঞেস করতো না, তখন ওই হরিহরবাবুই ওকে সাথে কবে শহবে এনে একটা মোটর গ্যারেজে ঢুকিয়ে দেন। আর গোকুলেরও অসীম ধৈর্য্য! কিল চড ঝাঁটা খিস্তি সব সহ্য করে তিরিশ এই লাইনে কাটিয়ে তো দিলো! তখন ছিল গাডীর ক্লিনার আব আজ পাইলট। মাঝখানে কতবার গাড়ীবদল হযেছে, মালিকও বদলেছে গীয়ার চেঞ্জের মতো কিন্তু গোকুল ঠিক দেয়ালে পিঠ রেখে লড়াই চালিয়ে গেছে। আজ বিয়াল্লিশ বছরের গোকুলকে এ লাইনেব সবাই প্রায় 'ওস্তাদ' মানে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। সব কিছুই পেয়েছে গোকুল, চালিযে নেবার মতো টাকাকড়িরও কোনদিন অভাব হয়নি তার, কিন্তু মা'ব সেই স্নেহ, সেই ভালোবাসা কোথাও সে পায়নি! এমন কি এ জিনিস তাকে প্রতিমাও দিতে পারেনি। আর যা চেয়েছে গোকুল প্রতিমা দিয়েছে। সমযে অসময়ে অনেকবার জোর করে আদায়ও করে নিয়েছে। গালাগাল করে বলেছে 'শরীর দেখলে তো চামচিকেও পোঁদ ঘুরিয়ে চলে যাবেরে মাগী—অতো রেলা আসে কোত্থেকে? এই আমি বলে তাই এখনো আসি, অন্য কেউ হলে মুখে থুতু ছেটাতেও আসতো না।' তখন প্রতিমাও সমান জোরে গলা তুলে বলেছে 'তাই যাওনা দেখি বজ্জাত মিনসে, হাড় জুড়োয়। সেইতো ঘুরে ফিরে এই প্রতিমা না হলে রাত কাটে না।' আর গোকুলও 'তাই যাচ্ছিরে মাগী, ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!' বলে দুমদাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আবার দু চারদিন

পর গলির মোড়ে গোকুলকে দেখতে পেয়ে এই প্রতিমাই হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ঘরে নিয়ে এসে বসিয়েছে—'কতোদিন আসোনা গো, তোমার জন্যে মনটা কেমন যেন করে' বলে গোকুলের বুকের মাঝমধ্যিখানে বেড়াল ছানার মতো সিঁধিয়ে গেছে। কিন্তু এ টান তো অন্য রকমের—গোকুল বুঝতে পারে।

গোকুলের মনে পড়ে কতো বছর আগের কথা, মা ওকে চান করিয়ে, নিজের হাতে খাইয়ে চুলটুল আঁচড়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিতো। ছুটীর পরে গোকুলের দারুণ খিদে পেয়ে যেতো বলে নিজে না খেয়ে ওর জন্যে ভাত রেখে দিতো। চার পাঁচ বাড়ী ঝিয়ের কাজ করতে মাকে কি প্রচণ্ড খাটতে হোত শুধু গোকুলের জন্যে। কেউ যখন ওর মার কাছে এসে গোকুলের দুষ্টুমির ফিরিস্তি শুনিয়ে নালিশ করে যেতো, মা ওর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুল ঘেঁটে আদর করে বলতো 'কেন এমন করিস বাবা, একটু ভালো হয়ে চল্। তোর নামে পাঁচ জনে পাঁচকথা বললে আমার কতো কষ্ট হয়।' সেই মা মরে যাবার পর গোকুলের চোখ দিয়ে একফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। অথচ চোখ দুটো কি অসহ্য জ্বালায় চিড়বিড় করছিল, বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। আজ অনেকদিন পর রমা যখন আসন পেতে জল বেড়ে বাটিতে করে ডাল তরকারী দিয়ে ওকে খেতে দিল মায়ের সেই ক্লান্ত অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটো অবিকল গোকুলের সামনে ভেসে উঠলো। জীবনে এইপ্রথম আজ অনিয়ম হয়ে গেলো তার। সারাদিন ঘর থেকে বেরোল না। বসে বসে রমাকে ওর ছোটবেলার গল্প, ড্রাইভার হওয়ার গল্প শোনাল।

কখন আকাশের ঘোমটা থেকে সন্ধ্যে মুখ বার করে নতুন বৌ এর মতো মিটি-মিটি হাসতে শুরু করে দিয়েছে। বাতাসের একটা স্নিগ্ধ স্রোত মাঝে মাঝে জানলার বাইরে গাছের পাতা নাড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় লোকজন, গাড়ীর শব্দ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে, যাচ্ছে। গোকুল রমার কোলে হাত রেখে বললো—

'আমার মতো একটা ছোটলোকের সাথে তোমার বিয়ে হবে এ কথা নিশ্চই তুমি কোনদিন ভাবোনি রমা'

'ছিঃ অমন করে বলছো কেন। নিজেকে কি কেউ ছোট ভাবে?'

'লোকে তো তাই বলে। আমি লরীর ড্রাইভার, মদ খাই। মেয়েমানুষের ঘরে যাই।'

'আর যেয়োনা। মদ খেলে তো শুধু শুধু শরীর নষ্ট হয়। এখন তোমায় আমার কথা, সংসারের কথা ভাবতে হবে না? তোমায় নিয়ে পাঁচজনে পাঁচকথা. বললে আমার কতো কষ্ট হবে—'

আর কিছু শুনতে পারলনা গোকুল। তার শরীরের ভেতর দিয়ে দুড় দাড় করে

রেলগাড়ী চলতে শুরু করে। ঠিক সেই আকুলতা। আজ তিরিশ বছর পরে আরেক জনের চোখের তারায় ভেসে উঠেছে। গোকুলের রুক্ষ মরুভূমিতে যেন হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো। আকাশে কাঁসার থালার মতো চাঁদ উঠেছে। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সেই চাঁদের আলোর কিছু কোয়া রমার বাঁ গালের ওপর লটকে গেছে। ঘরে কোন আলো জ্বালা হয়নি। এইরকম আলো আঁধারিতে রমাকে বেশ মায়াবী লাগছে। গোকুল রমার একপিঠ কালোচুলের মিথেন অন্ধকারে মাথা রেখে ভাবে—এতোগুলো বছর ওর জীবনটাতো ব্রেকডাউন গাড়ীর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। রমা কি যাদু জানে? কোন্ যন্ত্রপাতি দিয়ে রমা এটুকু সময়ের মধ্যে ওর ভাঙ্গা ঝরঝরে গাড়ীটা এমন পাকা মিস্ত্রির মতো আশি মাইল স্পীডে চালু করে দিল।

অপারেশন ক্লিনিং

আশিস কমল সরকার

একজন যাত্রীর হাত থেকে দু' টাকার নোটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকের দরজা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর অসংরক্ষিত কামরাটি থেকে এক লাফে নিচে নেমে আর এক লাফে ছেলেটি উঠে এলো অন্য প্ল্যাটফর্মে। আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতেই আমার সব ক'জন স্টাফ প্রায় সমস্বরে বাধা দিয়ে উঠল—ওরা বড় সাংঘাতিক স্যার, ধরতে যাবেন না, যে কোন মুহূর্তে ওরা মার্ডার করে দিতে পারে।

ভয়ের কাছে সহজে মাথা নত করার মানুষ আমি নই। তাই ওদের সব সাবধানবানী উপেক্ষা করেই এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম —

কি নাম তোমার ?

তাতে আপনার কি প্রয়োজন ?—যেমন উস্কো খুস্কো চুল,রুক্ষ চেহারা ঠিক তেমনি রুক্ষতায় জবাব দিল ছেলেটি।

প্রয়োজন আছে বলেই প্রশ্ন করছি। কি করছিলে ওখানে ?

আমি কি করছিলাম, তা এখানকার সবাই জানে তা আবার প্রশ্ন করার কি আছে ?—ওর ঘামঝরা চেহারাতে, নোংরা ছেঁড়া জামা কাপড়ে যেমন সদ্য ধস্তাধস্তির চিহ্ন ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে আমাকে পাশে ঠেলে এগিয়ে যাবার চেস্টা করল সে। তার এমন অশোভন ব্যবহারে বিব্রত হয়ে উঠল টিকিট ইনস্পেক্টর দত্ত। চটকরে ওর হাত দুটো চেপে ধরে ধমক দিয়ে উঠল,—

হারামজাদা, কার সঙ্গে তুই কথা বলছিস, জানিস ? আমাদের বড় সাহেব কে অপমান ! চল তোকে আজ লক-আপে পুরবই।—

সে কথা শুনে ওর রক্তশুন্য মুখটা আরো যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি ওর ডান হাতটা উঠে কপালে ঠেকে গেল। বুঝলাম ঐপাথরের মাঝেও হয়তো একটা প্রাণ আছে। তাই আবার প্রশ্ন করলাম—

কি তোমার নাম ?—

আমার নাম ক্ষুধা।—

বড় অদ্ভুত নামতো তোমার।

হ্যাঁ স্যার এক অদ্ভুত অবস্থাতেই ক্ষুধার্ত এক নারীর অসহ্য জ্বালা মিটাতে জন্ম হয়েছিল আমার। তাই সে অভাগিনী মা আমার নাম দিয়ে ছিল্ ক্ষুধা—

কোথায় থাক তুমি ?

প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে ভাঙ্গা রোড ওভারব্রীজটার বেসমেন্টের নীচে ভিখারী গোষ্ঠের যে লোক গুলো তাদের সংসারের প্রহসন সাজিয়ে বসে আছে, ওদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে উত্তর দিল ক্ষুধা—ঐ যে ওখানে, ওখানেই আমরা জন্মাই, বড হই জন্ম দিই এবং ওরই আশে পাশে কোথাও এক সময় শেষবারের মত চোখ বুজি।

তোমার মা বাবা—

আমার মা এ ষ্টেশনের আশেপাশেই থাকে। প্রায় রাতেই দেখা পাই-কিন্তু কথা বলি না।—

কেন ?—

বড় ঘৃণা হয় স্যার।—

ঘৃণা ?—

হ্যাঁ স্যার ঘৃণা। বলতে পারেন কোন যুক্তিতে ছোট্ট একটা পঙ্গু মেয়েকে পৃথিবীতে এনে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে সে মুক্ত হয়ে যায় ? আর আমার জন্মদাতা ! তার পরিচয় আমার জন্মদাতৃ নিজেও বুঝি সঠিক বলতে পারবে না।—

অনেক দুঃখে, বেদনায়, আঘাতে-আঘাতে ক্ষুধার চোখের সব জল বোধ হয় অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে। ওর প্রতি কেমন একটা অনুকম্পায় ভবে গেল আমার মন। স্নেহের আবেগেই তাই প্রশ্ন করলাম,

—এ অন্যায় কাজ তুমি কেন কর ?

অন্যায় আমি করতে চাইনা স্যার। আমি বাঁচতে চাই। আমায় যে কোন একটা কাজ আপনি জুটিয়ে দিন, এ ষ্টেশন ছেড়ে চলে যাব।—

সপ্রতিভ ক্ষুধার সহজাত উত্তর আমার সাধ্যের সীমার কথাটাই শুধু মনে করিয়ে দিল। তাই মুহূর্তের মধ্যে দুর্বল আমাকে সামলে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সেই সরকারী অফিসার, —

সকলকে কাজ জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব আমার নয়। আমার সোজা কথা এ স্টেশনে আমি কোন অন্যায় কাজ বরদাস্ত করব না।—

সেকথা আমি বেশ ভালভাবেই জানি স্যার। তবে আপনি ভাববেন না। আর খুব বেশী দিন এ অন্যায়ের পথে আমি থাকব না। সত্যি কথা বলতে কি, দিন রাত যারা এসব এখানে করে বেড়ায় তাদের সঙ্গে পায়ের জোরে পেরেও উঠিনা সব সময়। আর মাত্র তিন-চারটে মাস আমায় সময় দিন স্যার তার পরেই আমি চলে যাব।

ওসব বাজে কথা ছাড়। এসব সিট সেলিং আর আমি বরদাস্ত করব না।—

স্যার দিনে আমি এই করেই ছ'-সাত টাকা পাই। তা থেকে সিপাই, হাবিলদার আর বাবুদের দিতেই চলে যায় দু'তিন টাকা। সর্দারকে দিতে হয় এক টাকা। আরো একটা করে টাকা আমি সর্দারের কাছেই জমাই। বাকী যেদিন যা থাকে তাই দিয়েই কোনক্রমে আমার আর বোনটার পেট দুটো চালিয়ে নিই স্যার।—

সিপাই-বাবুদের দাও সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু সর্দারকে কেন টাকা দিতে হয়?

সে কি বলেন স্যার। সেই তো আমার ভাগ্যবিধাতা। ওর নজরানা না দিলে আমার জায়গায় অন্য লোককে ঢুকিয়ে দিয়ে আমায় মেরে তাড়িয়ে দেবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ স্যার ওর ভয়ে শুধু আমরা কেন আপনার ঐ সব সিপাইরা শুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

ওর কথা শুনে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সিপাই এর মুখে চোখে পরিবর্ত্তনের ছায়া নেমে এলো—অবশ্য ভয়ে না ভক্তিতে তা বোঝা গেল না। তবু উৎসুক হয়ে আবার প্রশ্ন করলাম—

কোথায় থাকে তোমার সে ওস্তাদ। কি নাম তার?

—ওরে বাবা-সে কথা বলতে পারব না স্যার, আমাকে জেলে দিন, ফাঁসী দিন তবু বলতে পারব না।—

তুমি না বললেও ওকে খুঁজে বার করতে আমাদের খুব অসুবিধা হবে না, এবং আমর এবার তা করবই।—

সে আপনি যা হয় করুন স্যার-দয়া করে এবারকার মত আমায় ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন আমার জমার অঙ্ক পাঁচশ টাকা হয়ে গেলেই আমি এখান থেকে চলে যাব।—

পাঁচশ টাকা দিয়ে কি করবে তুমি?—

স্যার, এক বাবুকে আমি একদিন এমনি করেই ট্রেনে সিট জোগাড় করে দিয়েছিলাম। তিনিও আপনার মত জানতে চেয়েছিলেন এ কাজ আমি কেন করি? আমার কথা শুনে তাঁর খুব দয়া হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন যে রানাঘাটে তাঁর বাড়ীর সামনে একটা ছোট ঘর পড়ে আছে-আমি ইচ্ছে করলে এ কাজ ছেড়ে সেখানে দিয়ে একটা পানের দোকান দিয়ে বসতে পারি। এই টাকা জমিয়ে আমি পানের দোকানটা করব স্যার।

ঘর যখন দিচ্ছেন তখন দোকানটাও তোমায় তিনি করে দিতে পারতেন।

কি করে করবেন স্যার,-তিনিওতো আমারই মত গরীব। তাই আমার দুঃখ তিনি বুঝতে পেরেছেন।

গরীব হলে কি হয়েছে, ইচ্ছে থাকলে টাকা ধার করেওতো তিনি সেটা করে দিতে পারতেন।—

কি যে বলেন স্যার, আমাদের মত গরীব সর্বহারাদের কোন মহাজন টাকা ধার দেবে? সবাইতো শুধু তেলা মাথায় তেল দিতেই ভালবাসে।—

ওর সব কথা শুনলাম। বুঝলামও সব কিছু। কিন্তু ওদের মত অনধিকারী আর অবাঞ্ছিতদের স্টেশন চত্তর থেকে দূর করার অভিযানেই আমি লোক লস্কর সেপাই সান্ত্রি নিয়ে সেজে গুজে আজ নেমেছি, তাই কর্তব্যের খাতিরে ওকে আমায় পুলিশের হাতে তুলে দিতেই হল। অবশ্য আরো অনেক ছেলে, মেয়ে জোয়ান বুড়ো ধরা পড়ল আমাদের জালে। ক্ষুধাদের মত একদলকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়, আর অন্য অনেককে লরী করে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হল দূর সাগরের কাছাকাছি কোথাও ছেড়ে আসতে।

একান্ত নিষ্ঠাভরেই আমি অপারেশন ক্লিনিং শেষ করে ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু সাফল্যের সান্ত্বনার বদলে আমায় জড়িয়ে রাখল ক্ষুধার সেই শুকনো করুণ চোখ দুটো। বার বার কানে এসে বাজতে থাকল ওর কান্না ভাঙা কথাগুলো,—

আমায় ছেড়ে দিন স্যার, আমার পঙ্গু বোনটা না খেয়ে মারা যাবে।—

আমার নিশ্চিত মনে হল যে এ স্নেহের কেন্দ্র ছেড়ে ওর পালাবার আর কোন পথ নেই। তাই নিজের অজান্তেই যেন টেলিফোনটা হাতে তুলে নিলাম। ডায়াল ঘুরিয়ে কথা বললাম জি আর পির বড়বাবুর সঙ্গে—

ক্ষুধাকে আপনি ছেড়ে দিন বড়বাবু' আমি নিজে ওর জামিনদার থাকছি।—

সঙ্গে সঙ্গে জামিনের টাকাটাও পিয়ন দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম থানায়। আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। ও পালায়নি। পরদিন ওকে ডেকে এনে ওর পাঁচশ টাকা জমার অঙ্ক আমি পূর্ণ করে দিলাম। অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দের অশ্রুভরা চোখে পঙ্গু বোনটাকে কাঁধে তুলে ও বিদায় নিয়ে চলে গেল স্টেশন থেকে।

পঙ্গু বোনটাকে আগলিয়ে ক্ষুধার হেঁটে যাওয়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তে সরকারী খোলশ থেকে বেরিয়ে এসে কখন যেন ওদের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিলাম। ন্যায় অন্যায় সমাজ সংসারের আরসিতে নিজেকেই যেন খুঁজে নিচ্ছিলাম বারবার। হঠাৎ স্যার সম্বোধনটা আমার ভাবনার নরম অনুভূতিতে চিড় ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তে সরকারী তকমাআটা খোলশের মধ্যে আমি যেন ফের ঢুকে পড়ি।

সৈনিক

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা এবারে সত্যিই চলল তাহলে। অনেকদিন যাবে যাবে করেছে অনেকদিন বলেছে সময় হয়ে এলো। মেজর ঘোষ চৌধুরী এ-কানে শুনে ও-কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন। অপর্ণা উপেক্ষা ভেবেছে কিনা কে জানে। সদা ব্যস্ত স্বামীর কান-মন সজাগ নেই—ভাবত কিনা কে জানে। নইলে অতকরে বলত কেন?

ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে গাড়ী রেড রোডে পরতেই স্পিডের কাঁটা তিরিশ থেকে একলাফে পঁয়তাল্লিশের দাগে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে কাঁটা কেউ দেখছে না। মেজর ঘোষ চৌধুরী ঘড়ির কাঁটা দেখলেন একবার। বেলা চারটে বাজতে দশ। রাস্তা ফাঁকা। কতক্ষণ আর লাগবে। যাবেন আসবেন। এই জন্যেই আর কাউকে না পাঠিয়ে নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন। প্রতিটা মুহূর্তের অনেক দাম এখন। মরণ-বাঁচনের দাম। জীবনের একটাই মিনতি রাখা না রাখার দাম। না, একটানা তেত্রিশ বছরের যুক্ত জীবনে অপর্ণার আর কোন প্রার্থনা বা মিনতি এই মুহূর্তে অন্তত মনে পড়ছে না মেজর ঘোষ চৌধুরীর। অপর্ণা বলেছিল, তুমি এত ব্যস্ত, তাই ভয় হয়। শেষ সময় কাছে থেকো, নইলে ভয়ানক খারাপ লাগবে আমার—থাকবে তো?

একবার নয়, অনেকবার করে বলেছিল। এই গত পরশুও বলেছিল। কালও একবার বোধ হয় বলতে চেষ্টা করেছিল। আর আজ সকাল থেকে মুখে বলতে না পারুক হঠাৎ-হঠাৎ তাকিয়ে দেখেছিল তিনি আছেন কিনা।

চোখদুটো ভয়ানক চকচক করছে মেজর ঘোষ চৌধুরীর। অথচ ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। কাঁচাপাকা লোমশ দুই পরিপুষ্ট হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন। একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকলো। হুইস্কির ছোট বোতল বেরুলো। দাঁতে করে মুখ খুললেন। রাস্তাটা ফাঁকা, তাছাড়া কে দেখল না দেখল পরোয়া করেন না। দরকার বলেই খাচ্ছেন। মাথা ঝিমঝিম করলে চলবে না, চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না। সময়ের অনেক দাম এখন। হাত শক্ত, স্নায়ু সবল রাখা দরকার। ছোট বোতল উপুড় করে গলায় ঢাললেন খানিকটা। অর্ধেকের বেশিই খালি হয়ে গেছে গত দু'ঘণ্টার মধ্যে। সাধারণত বেশি খান না। দুদিন ধরেই বেশী খাচ্ছেন। দুদিনে

এরকম চারটে ছোট বোতল খালি হয়ে গেল···না, দিস ইজ দি ফোর্থ, খালি হতে চলেছে।

দাঁতে করে বোতলের মুখ আটকে আবার পকেটে রাখলেন। স্পীডের কাঁটা প্রায় পঞ্চাশ ছুঁয়ে আছে। একটু আধটু কমছে আবার পঞ্চাশের কাছে দাঁড়াচ্ছে। হাত একটুও কাঁপছে না মেজর ঘোষ চৌধুরীর। এজন্যেই আর কাউকে না পাঠিয়ে তিনি নিজে ছুটেছেন। আর্মিতে তাঁর দুরন্ত গাড়ি ছোটানো দেখে কত লোকের তাক লেগে যেত। তিনি গাড়ী চালাবেন শুনলে ভয়ে অনেকে সে-গাড়ী এড়াতে চাইত।

···সেই অপর্ণা সত্যিই চলল তাহলে।

মেজর ঘোষ চৌধুরীর মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা। কি কাণ্ড করেই না তিনি ঠিক ঠিক ঘরে এনে ছেড়ে ছিলেন তাকে। অথচ এরই মাঝে কিনা তেত্রিশটা বছর কেটে গেল।

আবার দুচোখ চকচক করছে, আবার একটু একটু ঝাপসা দেখছেন। সেই সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাসও।···তেত্রিশ বছর আগের নয়, মাত্র সেদিনের দৃশ্য যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে।

···ডাক্তারী পড়ার চতুর্থ বছর সেটা। পড়ার চাপ বেশি। একটা পাঁচ মিশিলি নামী হস্টেলে থাকতেন। জানালা খুললেই পড়ায় ব্যাঘাত হত। অথচ না খুলেও পারতেন না। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ীর মেয়ে অপর্ণা। নাম আরো দেড় বছর আগেই জানেন। তাঁর যখন ডাক্তারীতে ফোর্থ ইয়ার অপর্ণার তখন কলেজের থার্ড ইয়ার। সেই সময় গণ্ডগোলটা হল। এমন নতুন কিছুই করেননি। সেদিন চতুর্থ বছরের ডাক্তারী নবীশ ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুরী রোজকার মতই মাঝে মাঝে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য দিনের মতই মৃদু মৃদু হেসেছিলেন চোখাচোখি হতে। বাড়তির মধ্যে আভাসে হয়ত বা কথা বলার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন।

ব্যস। অপর্ণা ঠাস করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করেছিল। আধ ঘন্টার মধ্যে অপর্ণার মারমুখি দাদা কাকারা হস্টেলে এসে হাজির হয়েছিল। অন্য ছেলেরা তার হয়ে তুমুল বচসা করেছিল। আর তাঁর কান দিয়ে আগুন ছুটেছিল। সেইদিনই ডাকে তিনি অপর্ণার নামে চিঠি ছেড়ে ছিলেন। সার কথা, একদিন তাকে তাঁদের বাড়ীতে তাঁর ঘরে আসতেই হবে। ইচ্ছে হলে একথা সে তার বাবা মা দাদা কাকাদের জানিয়ে দিতে পারে।

মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসছেন একটু একটু। ঐ রকম গোঁয়ারই ছিলেন বটে। জানালায় এরপর আর খুব বেশি দাঁড়াতেন না। হঠাৎ একদিন কানে এল অপর্ণার বিয়ে পাকা হয়ে এসেছে। পড়াশুনা সিকেয় উঠলো তাঁর। মাথায় আগুন জ্বলল

তাঁর। একটা দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও বাড়ীর দূর সম্পর্কীয় এক লোকের মারফৎ বার করলেন কোথায় বিয়ে পাকা হয়ে এসেছে। ঠিকানাও সংগ্রহ করলেন। তারপর উড়ো চিঠি ছাড়লেন।—অপর্ণা এবং একটি ছেলে পরস্পরকে বিয়ে করবে বলে অঙ্গীকার বদ্ধ। অতএব ছেলের অন্যত্র বিয়ে করাই ভাল।

বিয়ে ভেঙে গেল। কারণও একেবারে গোপন থাকল না হয়ত। কারণ দিনকতক বাদেই অপর্ণাকে হস্টেলের এই ঘরের দিকে চেয়ে তাদের জানালায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আর ধীর পদক্ষেপে তিনিও নিজের জানালায় এসে দাঁড়ালেন। নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিলেন তিনিই এই ব্যবস্থা করেছেন।

পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি হস্টেল ছাড়লেন। রেজাল্ট বেরুলো। ভাল পাস করলেন। অপর্ণা জানেও না তিনি কি পড়তেন বা কোথায় চলে গেলেন।

অভাবিত একটা ভাল সম্বন্ধ পেলেন অপর্ণার বাবা-মা একজনের মারফৎ। সেই একজন ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুরীরই লোক সে আর কে বলতে গেছে। তাঁরা জানলেন, বড় ঘরের ছেলে বরাবর ভালো রেজাল্ট করে ডাক্তার হয়েছে।

মিথ্যে জানলেন না তাঁরা।

অপর্ণার বাবা নিজে এলেন খোঁজ-খবর করতে। এই ভদ্রলোক দেড়বছর আগের বিবাহের ঘটনা কিছুই জানেন না। তাঁর সবই ভারী পছন্দ হল। এত সহজে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে আশা করেন নি। ছেলের বাবা-মায়ের উদারতা দেখে তিনি মুগ্ধ। ছেলে দেখেও খুশি। মুখখানা চেনা চেনা লাগল। ফলে বাবা বলেই দিলেন, ছেলের পছন্দ বলেই তিনি এগোচ্ছেন, ছেলে মেয়ে দেখেছে—উল্টো দিকের হস্টেলেই থাকত।

জানাজানি হওয়া সত্ত্বেও বিয়েতে বিঘ্ন হল না। আর তারপর কটা দিন কি কাণ্ড। দুচোখ চক চক করছে মেজর ঘোষচৌধুরীর, কিন্তু অল্প অল্প হাসছেনও। ......বিয়ের পর অপর্ণা তাঁর দিকে আর চোখ তুলে যেন তাকাবেনই না! এমন অবস্থা।......সব যেন সেদিনের কথা মাত্র।

পিচের রাস্তা ঘষটে ঘ্যাঁচ করে থামল গাড়িটা। লাল আলো জ্বলে উঠেছে—রেড লাইট। গলা দিয়ে অস্ফুট একটা বিরক্তির শব্দ বার করলেন মেজর ঘোষ-চৌধুরী। সবুজ না হওয়া পর্যন্ত থাকো বসে। আরো অসহিষ্ণু বোধ করলেন তিনি, কারণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিকটার লাইন ক্লিয়ার—সেই রাস্তায় একটিও গাড়ী আসছে না বা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সময় ধরে রোড সিগন্যাল পড়ে, এদিক বন্ধ তো ওদিক খোলা, ওদিক বন্ধ তো এদিক।

পকেটে হাত। হুইস্কির বোতল। খুললেন। গলায় ঢাললেন। বন্ধ করে ওটা পকেটে রাখার অবকাশ পেলেন না। সবুজ আলো। বোতল পাশে পড়ে থাকল। গাড়ি ছুটল।

…সময় নেই।

আর্মিতে চাকরী নিতে অপর্ণা ঘাবড়েছিল। অনেক নিষেধ করেছিল, প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করার জন্যে ঝকাঝকি করেছিল, তার ভয় তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বদাই ও যে একটা চাপা আতঙ্কে ভুগত সেটা তিনি টের পেতেন। সিভিল পোস্টিং হলে তবু স্বস্তি, সঙ্গে থাকত বলে অত ছটফট করত না। ইমারজেন্সি এরিয়ায় বদলী হলেই অপর্ণার আহার-নিদ্রা ঘুচত যেন। এই জন্যেই অসময়ে পুজো-আর্চা ধরেছিল বলে বিশ্বাস। মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসতেন আবার বিরক্তও হতেন।……লেফ্‌টেনান্ট থেকে ক্যাপটেন হয়েছেন, ক্যাপটেন থেকে মেজর, তবু অপর্ণার ভয় ঘোচেনি। সে ছেলেমেয়েগুলোকে ঠিক মত মানুষ করে তুলেছে, তাঁর প্রতি সকল কর্তব্য করেছে আর সেই সঙ্গে একটা অহেতুক ভয় পুষেছে। আশ্চর্য, দৈব বিড়ম্বনায় অসময়ে আর্মি থেকে অবসর নিতে হল তাঁকে, তবু অপর্ণার ভয়ে ভয়ে থাকাটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পাথর পড়ে পা ভাঙার ফলে আর্মির চাকরী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাঁকে। মেজর ঘোষচৌধুরী ঠাট্টা করেছিলেন, ঠাকুর তোমার ডাক শুনেছে, মিলিটারির চাকরী ছাড়িয়েছে।

অপর্ণার নির্বাক চাউনিটা স্পষ্ট মনে আছে। দু'চোখে জল টলমল করছিল।

গাড়ি থামল। এই দোকানই। নেমে হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটলেন মেজর ঘোষ-চৌধুরী। পরক্ষণে আরো বেগে ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন। মুখ শুকনো, চোখের নিমেষে গাড়ি ওধারের বড় রাস্তার দিকে ঘোরালেন।

অপর্ণা চললই তাহলে। বড় দোকানে অষুধ মিলল না। মিলবে কিনা সন্দেহ ছিলই। পাওয়া গেলেও অপর্ণা থাকবে কিনা সন্দেহ—ডাক্তার তো তিনিও, আর নামী ডাক্তারই—সবই বোঝেন। তবু আশা, শহরের সব থেকে নামজাদা ডাক্তার বলেছেন, এই অষুধটা একটা কেস্‌-এ জাদুর কাজ করেছিল—পান কিনা এক্ষুনি দেখুন। অমুক জায়গায় যান—

সেই জন্যেই টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাঁচিয়ে নিজেই গাড়ী হাঁকিয়েছেন। আর কারো ওপর নির্ভর করতে পারেন নি। অষুধটা কোথাও থাকলে তাঁকে পেতে হবে। ওদিকের বড় রাস্তা ধরে গেলে আরো দুটো বড় দোকান আছে।

কিন্তু ওদিকটায় আবার ট্রাম বাস মোটর চলাচলের ভিড়। তার ফাঁক দিয়েই

গাড়ী বেগে ছুটেছে। এই অসুখটার জন্য তিনি যেন সর্বস্ব দিতে পারেন। টাকার তো অভাব নেই, অভাব যার ঘটতে চলেছে টাকা দিয়ে তা পূরণ হবে না।...অপর্ণা রাগই করত, সময়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই—তোমার এত টাকার কি দরকার?

মিলিটারি চাকরির যা পেনশন পান, সেদিকে তাকানও দরকার হয়না তাঁর। যে টাকা তিনি প্র্যাক্‌টিস করে রোজগার করেন, তা কল্পনার বাইরে। সেই এক আট টাকা ভিজিট করে রেখেছেন তিনি—তাই রোগী আসে কাতারে কাতারে। প্রায় তিন বেলাই হিমসিম অবস্থা হয় তাঁর। বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে চেম্বার। কিন্তু খোঁড়া মেজরের কাছে রোগী আসে পাঁচ সাত মাইল দূর থেকেও। পা জখম হবার পর থেকে একটু খুঁড়িয়ে চলেন বলে রোগীদের মুখে মুখে এখন এই নাম।

ওয়ার্থলেস!

মুখ বিকৃত করে চার রাস্তার মুখ সবেগে পার হবার মুখেই ঘ্যাচ করে গাড়ীটা থামাতে হল। লাল আলো। ভ্রূকুটি করে ওধারের রাস্তার গাড়িগুলোর দিকে তাকালেন তিনি, গ্রীন পেয়ে এখনো নড়তেও শুরু করেনি। এই ফাঁকে অনায়াসে যেতে পারতেন। বাবুরা সব গদাই লস্করি চালে গাড়ি চালায়।

ঘন ঘন লাল আলোর দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। অসহিষ্ণু হাতে পাশের হুইস্কির বোতল ট্রাউজারের পকেটে ঢোকালেন। গায়ে তো শুধু পুরু গেঞ্জি একটা।

সর্বদা অত ভয়ে ভয়ে থাকত বলেই একে একে হার্টের দু'দিকেরই ভাল্‌ব্‌ খারাপ হয়ে গেল কিনা অপর্ণার মেজর ঘোষচৌধুরীর এখন সেই সন্দেহই হয়। শয্যা নিয়েও তার দুশ্চিন্তা যায় না তাঁর জন্য। ঘড়ি ধরা সময়ে খেতে না এলে বা সময়ে শুতে না এলে বিছানায় শুয়েই ছটফট করবে। ছেলেরা আর মেয়েরা অনেকবার সেই নালিশ করেছে। আর এখন তো মুখে কেবল এক কথা, শেষ সময়ে তুমি যেন কখনো আমার কাছ ছাড়া হয়ো না, কাছে থেকো—থাকবে তো?

মেজর ঘোষ হেসেছেন, শেষ সময় অত সস্তা নয়, বুঝলে?

—তবু তুমি কথা দাও। কথা দাও না গো!

কথা দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার তবু ভয় যায় না দেখে বিছানার গায়ে টেলিফোন এনে দিতে হয়েছে। একটু খারাপ বুঝলেই অপর্ণা চেম্বার থেকে ডাকবে তাঁকে।

মা-কে বাবার এই কথা দেওয়ার খবরটা ছেলে-মেয়েরাও কি করে যেন জেনেছে। মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ির দিকে গড়াবার আগে তারা এই নিয়ে হাসাহাসিও করেছে। টেলিফোন হাতে পেয়ে ওদের মা যেন পরীক্ষা করার জন্যেই এপর্যন্ত দিন তিনেক ডেকেছে তাঁকে।

গ্রীন লাইট। গাড়ি ছুটল,

দ্বিতীয় বড় দোকানেও নেই। চললই তাহলে অপর্ণা। মিথ্যেই দুর্বল হচ্ছেন তিনি, অষুধ পেলেও যাবেই। তবু অন্য দোকানটাও দেখতে হবে। সময় নেই। ……বাড়ির সঙ্গে কানে একটা টেলিফোন লাগানো থাকলে বুঝি ভালো হত। বাকি বড় দোকানটা দেখেই সোজা বাড়ি। তিনি কথা দিয়েছেন পাশে থাকবেন, সে-কথা যে কি-কথা সেটা এখন অনুভব করছেন। যে অবস্থায় দেখে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছেন—আর দেরি করা ঠিক হবে না।

আশ্চর্য! অপর্ণা কি তাহলে থাকবে এ-যাত্রা? অষুধ পেয়েছেন! তিনি তো ডাক্তার, জীবন-মন্ত্র ভাবছেন নাকি এটা? অষুধ হাতে পাবার পর আশাও তেমন করতে পারছেন কই? এই অবস্থা থেকেও ফেরে কেউ? সত্যি মিরাকল্ হয়?

এবারে আরো বেগে ছুটেছেন।

……খাইয়ে তো দেবেন, যেমন করে হোক কিছুটা পেটে যাওয়া চাই। চাই-ই।

ইম্পসিবল্। ইম্পসিবল্! বিরক্তিতে অসহিষ্ণুতায় গলা দিয়ে জোরেই শব্দ বার করে ফেললেন মেজর ঘোষচৌধুরী।

লাল আলো। অর্থাৎ থামো!

অথচ মাত্র দুটো সেকেণ্ডের জন্য বোধহয়। প্রথম সাদা দাগ ছাড়িয়েই এসেছিলেন। দ্বিতীয় দাগটা ছাড়াতে পারলেই আর থামতে হত না। কিন্তু তার আগেই সবুজ আলো হলদে হয়েছে, তারপর লাল। ও-ধারে রাস্তায় গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে এমন কি হল্‌দে আলো সবুজ হবার আগেই তিনি হাওয়া হয়ে যেতে পারতেন।

কিন্তু কি আর করা যাবে। পিছনের দিকে দেখে নিয়ে দ্বিতীয় সাদা দাগের কাছে গাড়ি বরং হাত কয়েক পিছিয়ে নিতে হল।

……এরকম হয় না কেন যে রাস্তায় গাড়ি যাবে সে রাস্তায় শুধু যাবেই, যে রাস্তায় আসবে, শুধু আসবেই—চার রাস্তা থাকবে না—ক্রস রোড থাকবে না।

মাথা গরম হয়েছে বোধহয় তাঁর, কিন্তু এখানে বোতল খোলা মুস্কিল।

নাকের ডগা দিয়ে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, সেগুলিকে ভস্ম করার চোখ মেজর ঘোষচৌধুরীর।

আশ্চর্য, অপর্ণা যে তাঁর এতখানি একি নিজেই জানতেন? পাশে থাকতে কথা দিয়েছেন যখন, তখনও কি জানতেন? তখনো কি এরকম করে অনুভব করতে পেরেছিলেন?

ক্রস রোডে গাড়ি চলছে তো চলেছেই। এক মিনিট এত বড় হয় কি করে?

তবু তুমি কথা দাও, কথা দাও না গো!'

কথা যখন দিয়েছিলেন, তখনো কি সেই আকুতি এমন করে শিরাতে শিরাতে ওঠানামা করেছিল তাঁর? তিনি তো তার পরেও লোকের চিকিৎসা নিয়ে সদা ব্যস্ত ছিলেন। এমন দম আটকানো শূন্যতা তো কখনো অনুভব করেন নি?

· চিকিৎসার বাইরে আর সকল দিক অপর্ণা এভাবে ভরাট করে রেখেছিল বলেই অনুভব করেন নি। তাই বটে। কোনদিন আর কোনোদিকে তাকানোর দরকারই হয়নি তাঁর। দুটো মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বড ছেলেটার বিয়ে হয়েছে, আর একটা ছেলেও আগামী বারে ডাক্তারী পাশ করে বেরুবে। এরা সব ছোট থেকে হঠাৎ চোখের ওপর দিয়ে কেমন করে যে বড় হল, যোগ্য হল, তাও যেন ভাল জানেন না মেজর ঘোষচৌধুরী। সবদিক এমনই ভরে রেখেছিল বটে অপর্ণা। তেত্রিশ বছরের এই ভরাট দিকটাই শূন্য হওয়ার দাখিল। তাই সবদিকই শূন্য। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে কষ্ট। চোখে ভয়ানক ঝাপসা দেখছেন।

বিষম চমকে উঠলেন—সবুজ আলো গ্রীন! ব্লেসেড গ্রীন!

হাওয়ার বেগে গাড়ী ছুটলো। আশ-পাশের গাডীওয়ালারা তাঁব গাড়ীর এই গতি পছন্দ করছে না। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে ভাবছে। হলেই হল? মিলিটারি চাকরিতে কোন্ পথ দিয়ে কি স্পীডে গাড়ি চালাতে হয়েছে তাঁকে জানবে কি করে। চকচকে ঠোঁট, কিন্তু ঠোঁটে আবার যেন হাসির আভাস একটু— জানলে অপর্ণা বোধহয় সুস্থ শরীরে হার্টফেল করত। নির্ভয়ে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর দুটো চোখ আর সবগুলো স্নায়ু একত্র করেই এ্যাকসিলরেটরে চাপ দিচ্ছেন তিনি। গাড়িতে বসলে তাঁর খোঁড়া পা আর খোঁড়া থাকে না—ওন্‌লি ডোন্ট ডিস্টার্ব মি এনিবডি এ্যাণ্ড লেট দেয়ার বি নো রেড্ লাইট্ এনি মোর।

বাড়ি।

সিঁড়ির গোড়ায় পা রেখেই নিশ্চল স্থানুর মত দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। কানে গলানো শিসে ঢুকল এক ঝলক। ঝলকে ঝলকে ঢুকছে। তিনি নিস্পন্দ কাঠ।

দোতলার ঐ অনেক গলার আর্তনাদের একটাই অর্থ। অপর্ণা থাকল না। গেলই।

কয়েক নিমেষের মধ্যে বুঝি বুড়িয়ে গেলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। এত বুড়িয়ে গেলেন যে, সিঁড়ির শেষ নেই মনে হচ্ছে। ঝকঝকে দু'চোখে মুক্তোর মত দুটো কি। হাঁপ ধরছে। দাঁড়ালেন। কি যেন একটা ভুল হয়ে গেছে।…কি? মাথার ভিতর এরকম লাগছে কেন? তিনি ডাক্তার, জানতেনই তো অপর্ণা থাকবে না।

পকেটের বোতলটা উবুড় করে নিঃশেষে গলায় ঢাললেন।

দোতলা। অপর্ণা শুয়ে আছে। মেয়ে দুটো আর ছোট ছেলেটা আছড়া-আছড়ি করে কাঁদছে। বড় ছেলে, ছেলের বউ কাঁদছে। জামাইরা কাঁদছে।

তাঁকে দেখেই ছোট ছেলে আর্তনাদ করে উঠল, বাবা তুমি আর একটা মিনিট আগে এলে না? আর একটু আগে এসে কথা রাখতে পারলে না বাবা? যাবার দশ সেকেণ্ড আগেও মা যে চোখ তাকিয়ে চারদিকে খুঁজছিল তোমাকে।

মেজর ঘোষের এইবার মনে পড়েছে। তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন পাশে থাকবেন। কি আশ্চর্য, তিনি কি পাশে ছিলেন না এতক্ষণ?

অপর্ণার দিকে তাকালেন। ঘুমুচ্ছে যেন। হাসি মাখা মুখ। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ডেকে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করবেন তার? বলবেন, শোন অপর্ণা, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমিও তাই চেয়েছিলাম—চেয়েছিলাম!

নির্বাক, বোবা তিনি।

ঘণ্টাখানেক বাদে কান্নার প্রাথমিক আবেগ স্তিমিত হল। জামাইরা দেহ নেবার যোগাড় যন্ত্রে বেরিয়েছে। দুই ছেলে শিয়রে আর পায়ের কাছে বসে। পাশে তিনি।

ধরা-গলায় এক সময় বড় মেয়ে বলল, আর একটু যদি আগে আসতে বাবা······ মায়ের কাছে তুমি শেষ কথাটা রাখতে পারলে না···।

ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখে মেজর ঘোষচৌধুরী বললেন, হবার নয় বলেই হলনা রে,···তিন তিনবার রাস্তায় লাল আলোয় আটকে গেলাম—বড় ক্রসিং, এক মিনিট করে থামতে হ'ল। যাবার সময় অন্য রাস্তায় একটাও গাড়ি নেই, অথচ লাল আলো! আর আসবার সময় একেবারে বেরিয়ে আসার মুখে-মুখে দু'বার।

বড় ছেলে বেশ জোরেই বলে উঠল, বেরিয়ে আসার মুখে তো বেরিয়েই এলে না কেন? কে কি করত? বড জোর একশ' দেড়শ' টাকা জরিমানা হত—এর বেশি আর কি হত?

মেজর ঘোষচৌধুরী হতভম্ব বিমূঢ় হঠাৎ। বেরিয়ে আসা যেত ঠিকই। অনায়াসেই যেত। আর একশ' দেড়শ' টাকা ছেড়ে কথা রাখার জন্য এক হাজার দুহাজার দশ হাজারও বার করে দিতে আপত্তি ছিল না তাঁর। কিন্তু লাল আলো দেখেও বধি নাকচ করে ওভাবে বেরিয়ে আসা যেত সেটা মাথায়ও আসেনি তাঁর। এখনো .ধন ভাল করে আসছে না।

ছেলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মেজর ঘোষচৌধুরী।

বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি

অরুণ ইন্দু

ঝটিতি হাতটা বাড়িয়ে অরিন্দমের হাত থেকে বইখানা নিয়ে নিল অদিতি। ও মোজায়েক করা ঘরের মেঝেতে কাঁচের আলমারি ভর্ত্তি বইয়ের সামনে বসেছিল। অরিন্দম বুঝল অদিতি দারুণ উত্তেজিত। ভেতরে ভেতরে সাপের মতো রাগে ফুসছে। বইখানা নিয়েই আলমারির এককোনে রেখে পাল্লাটা বন্ধ করে গুম হয়ে বসে রইলো মেঝেতে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া ওর মা খাটের উপর বিছানায়, বালিশে মাথা রেখে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে কাশির দমক এলে কাশছেন। অরিন্দম ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভগ্ন বৃক্ষের মতো। কি করবে, এই সময় কি করা উচিৎ ভেবে পেলো না। একবার ভদ্রতার খাতিরেও , অদিতি মুখ তুলে তাকাল না ওর দিকে। আহত হোল অরিন্দম। দীর্ঘশ্বাস বেরুল বুক ঠেলে। কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটায় সময়ের মাপটুকু দেখে নিতে নিতে ওর মনে হলো এভাবে বিচ্ছিন্ন মানসিকতা নিয়ে দাঁড়িযে থাকাটা অনর্থক অপমান গ্রহণ করার সামিল। বরং চলে যাওয়াটা ভাল। ঠিক এই সময় অদিতি কথা বলে উঠলো ঃ দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন। কথাটার মধ্যে আগুনের উষ্ণতা ছিল। অরিন্দমের হৃদয়টা পুড়ে গেল। ও ইচ্ছে করলেই বলতে পারত ঃ বসব না, চলি। অথবা অপমানেব প্রত্যুত্তরেকোন কথা না বলেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রিয় হতে পারত। কিন্তু ওর সহ্য ক্ষমতা অত্যাধিক। তাই এসব কিছুই করল না। তাছাড়া অদিতির হঠাৎ এ ধরনের জ্বলে ওঠা অমানবিক ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষন ওর ক্ষমতাকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে তুলল। একটু ঝালিয়ে নেবার জন্য ও তাই নক্সা আঁকা কাপড়ের সুসজ্জিত চেয়ারে মৃদু পা ফেলে ফেলে গিয়ে বসল। অদিতির মা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন বলে বিনা দ্বিধায় পকেটে হাত গলিয়েসিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে থাকল। হংসগ্রীবার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে আড়চোখে একবার তা লক্ষ্য করলো অদিতি, তারপর আবার আগের মতো ঘাড় মেঝের সংগে কোনাকুনি রেখে চোখ দু'টো নামিয়ে রাখল সোজাসুজি। অরিন্দম চুপ থাকতে পারল না। এসবের অর্থ কি? কথার মধ্যে সামান্য ঝাঁজ থাকলেও বেমানান ছিল না।

অদিতি এবার সহজভাবে মুখটা তুলল। আগের দৃষ্টি তার অনেক বদলে গেছে। গলায় নরমস্বর এনে বলল : আমি দুঃখিত অরিন্দম দা। আমার মনে হয় আপনার আসাটা এ বাড়ির লোক তেমন ভাল ভাবে নিচ্ছে না। তাই—। কথাটা বলতে বলতে থেমে গেল অদিতি। অরিন্দম যেন আকাশ থেকে পড়লো। এবং এরপর অদিতি কি বলতো তা আন্দাজ করে নিযে বুঝলো ওকে জড়িয়ে অদিতিকে নিয়ে এ বাড়ির লোক বিশ্রী একটা ঘটনার অবতারণা করতে চাইছে। এবং বেশ কিছু অপ্রিয় আলোচনা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে হয়ে গেছে যা কিনা অদিতি সহ্য করতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন উগ্র হতে বাধ্য হয়েছে।

অদিতি বলল : আমি ওদের সব কথার জবাব দিতে পারতাম কিন্তু দেইনি আপনার কথা ভেবে। আপনার সোর্সে আমি এ বাড়িতে এসেছি, এই ঘরখানা ভাড়া পেয়েছি এবং আপনি এখানকার প্রতিবেশী। আজ বাদে কাল আমি এখান থেকে চলে গেলে পরবর্ত্তী সব আক্রমণ আপনার উপর দিয়েই হবে। হয়তো আমাকে জড়িয়ে আপনার স্ত্রীর কানে কথাগুলো তুলে জঘন্য একটা অপবাদ ছড়াত। আপনার সুনাম আছে, মিছেমিছি আমার জন্য আপনি কেন দোষের ভাগী হবেন। তার চেয়ে এখানে আপনার আর না আসাই ভাল।

কথাগুলো বলে দুই হাঁটুর মাঝে মুখ গুজল অদিতি। ওর চোখে জল বেরিয়েছে কিনা অরিন্দম বুঝল না। তবে বুঝল ভারী একটা কষ্টের পাথর ওর বুকে চেপে বসেছে।

কথাগুলো অরিন্দমের বুকে শেলের মতো বিঁধলো। সিগারেটে টান দিতে দিতে প্রশস্ত ঘরখানার দিকে আলতোভাবে চোখদুটো লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল দু'ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজার পরদার গায়ে একটা ছায়ামূর্ত্তি ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওদের কথোপকথন এ বাড়ির কেউ একজন এতক্ষণ ধরে শুনছিল। অরিন্দম তৎক্ষনাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার কাছে চলে এলো। সন্তর্পনে পা দিলো পাশের ঘরে। ইতিমধ্যে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে। পেছন থেকে অদিতি ডাকল : অরিন্দম দা, যাবেন না। অরিন্দম বিস্ময়ে তাকাল অদিতির দিকে। কিছু বলার আগেই অদিতি বলল : মিছেমিছি একটা অশান্তি বাধবে, তাতে আপনার আমার কারোরই ভাল হবে না। অরিন্দম ফিরে এসে চেয়ারে বসল। মনটা ক্রমেই বিরক্তিতে ভরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল : তুমি এ বাড়িতে সম্পূর্ণ পরাধীন। অথচ ঘরখানার জন্য রীতিমত ভাড়া গুনছ। এ বাড়ি তোমার ছেড়ে দেয়া উচিৎ।

—তাই ছাড়ব। তবে সবেত মাস দেড়েক হোল। আরও দু'একটা মাস যাক।

তাছাড়া এরা আপনার বহুদিনকার পরিচিত, হঠাৎ এসে চলে যাওয়াটা ভাল চোখে দেখবে না।

—বুঝলাম।

—কি?

—তুমি ওদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। এবং এতে তোমার আমার দেখাসাক্ষাতটা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তুমি যদি তাই চাও, তাই হোক, আমি চলি।

—না না ভুল বুঝবেন না। কেননা এ ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ এটা যে কলকাতা নয়, যেখানে কেউ কারও হাঁড়ির খবর নিতে যায়না। এখানে এই আধা-গ্রাম, আধা মফঃস্বলে সমাজের ভয়টা বড় বেশী। যে কোন ক্ষুদ্র ব্যাপারটা জটিল করে তুলবে। আমাদের দেখা সাক্ষাতে বাধা থাকবে না এতে। আমারও তো অফিস আছে।

কথা শুনতে শুনতে অরিন্দমের মনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। অদিতির যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো ওকে বড ভাবিয়ে তুলল। কেননা যতই আমরা প্রোগ্রেসিভ হই সমাজ সংস্কারের কথাটা একটুখানি ভাবতেই হয়। সমাজকে উপেক্ষা করার উপায় নেই কারও। যদিও অনেক সময ভাল থেকে ওরা মন্দটা করে বেশী। ক্ষুদ্র ঘটনায় রঙচঙ লাগিয়ে এমন কিম্ভূত করে তোলে যা বেশীরভাগ অর্থহীন। এবং ক্ষতি যার হবার তার হয়ে যায়। এক একটা পক্ষ তখন দূর থেকে মজা লোটে, হাততালি দেয়। জীবনের কত সুন্দর ছবি মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে যায়। কিন্তু এসব কথা কে কাকে বোঝাবে। অনেকসময় মানুষতো জেনেশুনেই কার। অন্যকে অপদস্থ করে আত্মতৃপ্তি পায়।

অরিন্দম জানে অদিতির সঙ্গে ওর সম্পর্কের দুর্বল কোন স্থান নেই। তেমন কোন মুহূর্তও আসেনি। আসতে পাবে কেউ কল্পনায আনতে পারে না। যদিও দু'জনের জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে একটা মিল রয়ে গেছে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা তো আলাদা। অদিতি যেমন লেখালেখির জগতে এক আত্মা এক প্রাণ, অরিন্দমও প্রায় সেরকমই। তা সত্ত্বেও অদিতির নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে অরিন্দম। ওর নিজের মধ্যে যেটার খুব অভাব। বেশী ভাল লাগে হয়তো এই কারণেই। তাছাড়া অদিতির মধ্যে এমন একটা ব্যাপার লুকিয়ে আছে যা কিনা আরও বেশী আকর্ষণ করে ওকে। একদিন অদিতি নিজেই বলেছিল, হয়তো কথায় কথায় এসে পড়েছিল: দেখুন অরিন্দম দা, আমি সব ছাড়তে রাজী, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে শব্দ দিয়ে ছন্দের যে মালা গাঁথা শুরু করেছি এবং প্রতিক্ষণে রক্তের মধ্যে যার স্পন্দন আমাকে পাগল করে তোলে তা আমি কোন অবস্থাতেই

ত্যাগ করতে পারবো না। পারবো না বলেই সংসার গড়ার প্রতি অহরহ একটা আতঙ্ক। ভাবি তাহলে হয়তো বা আমার স্বাধীন সত্ত্বার অপমৃত্যু ঘটবে।

অদিতি এ-কথাও জানিয়ে ছিল যে, নদীয়ায় তাদের বাড়িঘর আছে, কিন্তু সে সবই অবহেলায় ফেলে রেখে একমাত্র বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রথমে কলকাতায় এসেছিল। একমাত্র নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে। সেদিন থেকেই তার অনাগত ভবিষ্যৎ এবং অবিরাম সংগ্রাম। এইভাবে এম. এ শেষ করেছে সে। এবং সাফল্যের পথ প্রায় পেয়ে গেছে।

অরিন্দম নিজেও লেখক হবার স্বপ্ন দেখে। সংসার সামলে সেও লেখালেখির জগতে উত্তরণের পথ খুঁজছে। যে কারণে অদিতির সঙ্গে দেখা হোত কলকাতায় বিভিন্ন সাহিত্যবাসরে। কলকাতার আগের বাড়িটা অপছন্দ হওযাতে একটা ঘর খুঁজে দিতে বলেছিল অরিন্দমকে। দু'দিন চেষ্টা করে এই বাড়িটা পেয়েছিল সে।

কিন্তু কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সহজ খোলামেলা জীবন পছন্দ করে অরিন্দম। অদিতিকে জড়িয়ে এবাড়িতে আলোচনাটা এভাবে হবে ভাবেনি। কেমন যেন অশান্তির কাঁটা ফুটছে এখন।

ওকে চুপচাপ দেখে অদিতি প্রশ্ন করল : কি ভাবছেন ?

অরিন্দমের ভেতর একরাশ বিষণ্নতা। এখানে ঢোকার সময় যে উৎসাহ এবং প্রফুল্লতা ছিল সবই বুঝি সহস্র ব্লটিং পেপারে শুষে নিয়েছে। এতটুকু তাগিদ পাচ্ছে না কথা বলবার। অদিতির কথা কানে গেলেও ও চুপ করে রইল।

অদিতি তাই ফের কথা বলে উঠলো : অরিন্দম দা, কিছু বলুন। অমন চুপ করে থাকলে সত্যি রাগ করব কিন্তু।

অরিন্দম অদিতির মার দিকে লক্ষ্য করতে দেখল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই ভেবে বলল - চলো বারান্দায় গিয়ে বসি।

—তাই ভাল চলুন।

দু'জনে এসে পাশাপাশি চেয়ারে বসল। শুধু বসেই রইল কিছুক্ষণ। কেউ কিছু বলতে পারছে না। দীর্ঘ বারান্দার গ্রীলের গায়ে ঝুঁকে পড়েছে এক ফালি আকাশ। খণ্ডখণ্ড মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের ঝলক। দৃষ্টির মধ্যে চমকিত হচ্ছে গাছ গাছালির মাথা। অরিন্দম বুঝল অচিরেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবু নিস্পলক সেদিকে চেয়ে থাকতেই ভাল লাগছে বেশী। প্রকৃতির এই খেলা আজ বড় অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করছে ওকে। পাশে বসে থাকা অদিতির সান্নিধ্য তেমন কোন অনুভূতি জাগাচ্ছে না। আসলে পরিবেশটা এতই থমথমে যে বড় অসহ্য লাগছে সব।

এভাবে বসে থাকার থেকে চলে যাওয়াটাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে অরিন্দম যখন মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল সেই সময় এ বাড়ির কর্ত্রী মৌসুমী, যার সঙ্গে অরিন্দমের দীর্ঘকাল পরিচয় এবং যে কিনা এককথায় অদিতিকে ঘরভাড়া দিতে তার স্বামীকে রাজী করিয়েছিল, হঠাৎ ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে গ্রীলের দরজাটা একটুখানি খুলল। অদিতি এই ব্যাপারটা দেখে প্রশ্ন করল : কোথায় যাচ্ছ বৌদি ?

মৌসুমীর মুখময় ছিল ভারী মেঘের আস্তরণ। নিমেষে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে সহজ করার চেষ্টা করল—কোথাও না, বাইরে কাপড়চোপর আছে কিনা দেখছি। সে উঠোনে পা দিলে অদিতি অরিন্দমকে ফিস্ ফিস্ করে বলল—ওর সংগে একটু কথা বলুন।

—তার মানে ? ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল অরিন্দম।

—বাঃ, অন্যদিন বলেন আজ বলবেন না ?

—অন্যদিন আর আজ কি সমান ?

—যেমনই হোক আপনি সেটা বুঝতে দেবেন কেন ? উঠোনের কাজ শেষ করে মৌসুমী ফিরে এল। বলল—না, বাইরে কিছু নেই। ওর মুখখানা এখনও থমথমে। যেন কিছু ক্ষোভ কিছুটা অভিমান জমে আছে মুখে, তাতে আরও বেশী রাগী রাগী লাগছে। এবং সামনে সেটাকে ঢাকতে স্পষ্টই ধরা পড়ে যাচ্ছে : এই অবস্থাতেই মৌসুমী বারান্দা পেরিয়ে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল। তাতে পরিবেশটা যেন আরও ঘোলাটে লাগল। অরিন্দম কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। অদিতি চোখের ইশারা করল ওকে। কিন্তু ওর কান দুটো যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা অপমান বোধে তিল তিল করে পুড়ছে। যদিও এটা স্বাভাবিক। তবু মৌসুমীর এতখানি অভদ্রতা ও কল্পনা করেনি। আগের দিনগুলোতে সে যতখানি সম্বর্ধনা জানাত আজ ঠিক ততখানি অপমান করছে ওকে।

অদিতির চাপে পড়েই অরিন্দমের মুখ খুলল, সে ডাকল মৌসুমীকে। মৌসুমী হয়তো এই ডাকেরই অপেক্ষা করছিল। সে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল—কিছু বলছেন ?

মৌসুমীর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অদিতি কি একটা কথা বলল যেন। অরিন্দম বুঝল না। এবং কথাটা বলেই অদিতি ওখান থেকে উঠে গেল।

অরিন্দম মৌসুমীকে প্রায় রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করল—আমাকে কি চিনতে পারছো না ?

—কেন না চেনার কি দেখলেন ?

—বাঃ, বেশতো। চেনার ধরনটা কি কথা না বলে চলে যাওয়ার প্রমাণ ?

—অদিতির সঙ্গে কথা বলছিলেন তো, তাই—।

—তাতে কী, অদিতির সঙ্গে কথা বলাটা কি অন্যায় ?

—তাত বলিনি। আসলে বিরক্ত হতে পারেন ভেবেই বলিনি।

—বিরক্ত হ'ব কেন ?

—সেটা আপনার ব্যাপার। আমি কেন মিছেমিছি নাক গলাব।

—দ্যাখো এটা তোমার বাড়ি। তুমি যদি এরকম ব্যবহার করো তাহলে ধবে নেব আমার আসাটা তুমি পছন্দ করছো না। যদিও তোমার সহযোগিতায় অদিতির জন্য ঘর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এবং তার সঙ্গে আমার কিছু কথাও থাকতে পারে।

—তবে আপনারাই কথা বলুন, আমাকে কেন জড়াচ্ছেন এর মধ্যে ?

—কিন্তু তুমি তো আগে এরকম ছিলে না! সম্পর্কটাকে কেমন তেতো করে তুলছো। এত মেকানাইজড্ হবে জানলে অদিতিকে এ ঘরে তুলতাম না। খুব ভুল করে ফেলেছি।

—হয়তো তাই। কথাটা বলেই মৌসুমী কেমন কেঁপে উঠলো। ওর গলাটা এই সময় ভারী ভারী এবং ভাঙা শোনাল। চোখ দুটো ক্রমশঃ ঘোলাটে হয়ে উঠছে ওর। এ দৃষ্টির মানে সম্পূর্ণ আলাদা। বুঝিবা চোখ জুড়ে রাশি রাশি জল জমা হয়েছে। একটু টোকা লাগলেই অঝোরে ঝরে পড়বে নীচে। ও যেন আর কথা বলতে পারছিল না। থির থির করে ঠোঁটদুটো নড়ছিলো। মৌসুমী মাথাটা নীচু করে অস্পষ্ট স্বরে বলল—উনি ছাদের ঘরে অপেক্ষা করছেন, আমি যাই। পারলে আসবেন একবার। সে আর দাঁড়াল না। বাইরে এই মুহূর্তে আকাশ ঝলসে বিদ্যুৎ মিলিয়ে গেল। সংগে সংগে কড কড় শব্দ। এলোমেলো হাওয়া। হয়তো এখনি বৃষ্টি নামবে। কেউ নেই, অরিন্দম বারান্দায় একা। বুকে যন্ত্রণার স্পন্দন। যেন পাথরের মতো বোবা দৃষ্টিতে ওখানেই বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়াল। অদিতিকে লক্ষ্য করার জন্য দরজার কাছে চলে এল। দেখল অদিতি তার মা'র পাশে উপুর হয়ে শুয়ে আছে। নাম ধরে ডাকল তাকে। অদিতি সেই ডাক শুনে ওর কাছাকাছি এলে অরিন্দম বলল—অনেক রাত হোল আমি চলি।

ইতিমধ্যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হোল। অদিতি বলল—যাবেন কি করে, বৃষ্টিটা থামুক তারপর যাবেন।

অদিতির সুন্দর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের থাকতেই ইচ্ছা করছিল। কিন্তু মৌসুমীর ব্যথাতুর মুখখানার কথা মনে পড়তেই সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। তাই বলল—না অদিতি। বৃষ্টিতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। এরপর সময়করে অফিসেই তোমার সংগে দেখা করব।

অরিন্দম আর দেরী না করে গ্রীলের বারান্দা পেরিয়ে প্রথমে উঠোন এবং তারপর সদর দরজা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিল। মাথার উপর আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। ঝড়ের সংগে মুষল ধারে তখন বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি।

আম কাঁঠালের ছুটি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

কিছু খাচ্ছিস ?

হুঁ।

আমি টের পাই। ঘরের ভিতর থেকে ফোকলা গালে বুড়ী হি-হি হাসে। একটা কচমচ শব্দ আমার কানে আসছে বাপ।

তা আর টের পাবি না তুই! দাওয়ায় বসে শিবনাথ ঘরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে মুখ ঝামটা দেয়। দিন দিন তোর কানের ধার বাড়ছে যে বেটি।

এই দ্যাখো! রাগ করলি। বুড়ী আর হাসে না। বড় করে শ্বাস ফেলে। একজনই তো শব্দ করিস। হাঁটিস চলিস খাস—তাই কান পেতে শুনি। শুনতে ভাল লাগে।

তখন শিবনাথ চিন্তা করে, কথাটা মিথ্যা কি। অনেক শব্দ হয়েছে এ বাড়িতে, কত সোরগোল কানে এসেছে। এখন সব চুপ। যেন অনেক পাখি এল, সারাদিন গান করল, কিচমিচ শব্দ করল, বিকেল পড়তে না পড়তে কিম্বা ধিকিধিকি বেলা থাকতেই সব পালিয়ে গেল, উড়ে গেল!

যেমন এই উঠোনের আনাচে কানাচে। কতবার কতরকম গাছ গজিয়েছে, ফুল দিয়েছে, কিছু কিছু ফল ফলেছে। তারপর সব শুকিয়ে মরেহেজে একাকার। এখন ফল-ফুল গাছের চিহ্নও নেই। খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

হুঁ কত শব্দ ছিল, বুড়ী বিড়বিড় করে, উলুর শব্দ, শাঁখের ফুঁ, ঢাকের বাদ্যি, আঁতুড়ের ট্যাঁট্যাঁ, অন্নপ্রাশনের রান্নার ঘটর ঘটর আওয়াজ, আত্মীয়কুটুমের আনাগোনা, হইচই হাঁচিকাশি—এই বৈশাখে অন্নপ্রাশন গেছে, আর এক ফাগুনে আবার এই উঠোনে সানাইয়ের পোঁ পোঁ, উলু, শাঁখের ফুঁয়ে কান ঝালাপালা—

তারপর! থামলি কেন, বলে যা। বারান্দায় বসে শিবনাথ বুড়ীর বিড়বিড় শোনে। শাঁখের ফুঁয়ে কান ঝালাপালা, তার মানে আর একটা বিয়ে, ন' মাস না পেরোতে আবার আঁতুড়ের ট্যাঁটঁ্যা, আত্মীয় কুটুমের আনাগোনা, মুখে-ভাতের রান্নার ঘটরঘটর আওয়াজ। শিবনাথ ভেংচি কাটে। তারপর?

বুড়ী চুপ।

শিবনাথ চুপ থাকে না। চেঁচিয়ে বলে, ঘুরে ঘুরে বিয়ে শুনলি, বউ-ভাতের খাওয়া শুনলি, আঁতুড়ের ট্যাঁট্যাঁ কানে এলো—আর ঐ যে বড় আওয়াজটা—বলো হরি হরিবোল এই উঠোনে কবার শুনলি, কতবার কান ঝালাপালা হয়েছে তোর শুনি ?

যেন এবার বুড়ী মিইয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। টের পেয়ে দাওয়ায় বসে শিবনাথ ফ্যাফ্যা করে হাসে। তারপর চৌকাঠের ওদিকে গলাটা বাড়িয়ে দেয়। বুড়ীকে দেখে। আর কথা বলছিস না কেন বেটি, হুঁ ? শিবনাথ খোঁচা দেয়।

কি বলব রে বাপ। মানুষ কি মানুষকে ধরে রাখতে পারে। কাতর গলায় বুড়ী জবাব দেয়।

না তা পারবে কেন। তবে তো আমি আমার বাবাকে ধরে রাখতাম, ছোট ভাইটাকে ধরে রাখতাম, তুই তোর ছেলের বউকে ধরে রাখতে পারতিস, নাতি দুটোকে ধবে রাখতিস, সেই সঙ্গে তোর মেয়ে গঙ্গাকে, ওর বাচ্চাটাকে—আমাদের কত আগে সব পালিয়ে গেল…

বলতে গিয়ে শিবনাথের গায়ে কাঁটা দেয়। আর হাসে না সে।

বুড়ী কথা বলে না। বুড়ীর এই চুপ করে থাকাটা শিবনাথের অসহ্য। কি হল! কি বলছি তোকে, উত্তর দে।

যেন বুড়ী কাঁদে। নাকের ফ্যাচফ্যাচ শব্দ হয়।

এই দ্যাখো! শিবনাথ ধমক লাগায়। কান্নাকাটির হিড়িক পড়ে গেল। একটা আলোচনা হচ্ছে, অমনি ফ্যাচফ্যাচ শুরু—অ মা!

কি বলব বল্! ধরা গলায় বুড়ী বলে, ওরা সগ্গে গেছে, ভগবানের কোলে ঠাঁই নিয়েছে।

যা বলেছিস! শিবনাথ এবার জোরে জোরে হাসে যেন বুড়ীর সঙ্গে সে রগড় করে। হুঁ ভগবানের কোলে ঠাঁই নিতে সব চলে গেছে, আর তোকে রেখে গেছে এই খালি উঠোন পাহারা দিতে, তাই না ?

একটু থেমে থেকে আবার সে বলে, তা উঠোন তো একেবারে খালি হয়নি, এখনো তোর গভ্ভের একটা শত্তুর রয়ে গেছে। আর ওটা সারাদিন কি করছে—কি খাচ্ছে তোর চোখ কান পড়ে আছে সেদিকে। মিছা বললাম!

হুঁ, চোখ, সারাদিন চোখ পড়ে আছে তোর দিকে। এবার বুড়ীর অভিমানের গলা শোনা গেল। চোখের আমার কিছু আছে কিনা—সারাদিন তুই কি করিস কি খাস আমি কেবল তাকিয়ে দেখি।

নাকের ফ্যাচফ্যাচ শব্দ করে আবার বুঝি বুড়ীর কান্না শুরু হয়।

এই দ্যাখো! বাইরে থেকে শিবনাথ গলা ঝাঁকায়। তবে চল্ না একদিন হাসপাতালে নিয়ে যাই, চোখের ছানি কাটিয়ে আনি। তারপর নতুন চশমা নিবি—

ঠাট্টা করিসনে। নাকে কান্না থেমে যায় বুড়ীর। চোখ কাটাবার বয়স আছে কিনা আমার, নতুন করে চশমা নেব! যেন বাচ্চা খুকি আমি—কথা দিয়ে ভোলাচ্ছিস।

এই দ্যাখো, কথা দিয়ে ভোলাবার কি আছে, কে বলেছে তোর চশমা নেবার বয়স নেই। শিবনাথ গুজগুজ করে হাসে। আমি দেখছি তোর যৌবন ফিরে আসছে। তোর বয়স এখন বায় কি তেয়—

বুড়ী একেবারে চুপ। কেবল অভিমান না, এবাব বেটি রাগ করেছে টের পেয়ে শিবনাথ উঠে দাঁড়ায়।

অ মা! আদর করে ডাকে সে। জামরুল খাবি? বলছিলি কচমচ শব্দ শুনছিলি—আমি খাচ্ছি যে—

অ্যাঁ, জামরুল! নিমেষের মধ্যে বুড়ীর রাগ অভিমান কর্পূরের মতন উড়ে যায়। যেন পাঁচ বছরের খুকির মতন আহ্লাদে নেচে ওঠে। শিবনাথ তাই চাইছিল। এই জন্যই এত রগড়।—জামরুল বললি, না কি গোলাপজাম? শিবু! বুড়ী অস্থির হয়ে ঘরের ভিতর থেকে ডাকে।

এই দ্যাখো! বাইরে থেকে শিবনাথ চেঁচায়। সাধে কি বলি যত দিন যাচ্ছে, সব গুলিয়ে ফেলছিস তুই। কেবল কি চোখ গেছে, কানের মাথাটিও খাওয়া হয়ে গেছে অনেকদিন। যেন শিবনাথ খুশী হতে গিয়ে দুঃখ করে। আম বলতে আনারস শুনিস, লিচু বলতে কলা, কলা বলতে কাঁঠাল শুনিস—বলছি জামরুল—উনি শুনছেন গোলাপজাম। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না বেটি।

আমায় নিয়ে সত্যি আর পারা যায় না। তাই না বাপ! বুড়ী খুশীতে ডগমগ। তোর এই আড়াই বছরের মেয়েটাকে নিয়ে ভয়ানক মুশকিলে পড়ে গেছিস। আম জাম লিচু জামরুল কলা কাঁঠাল—রাক্ষসী আবার সব জায়গায় সব দেখতে চায়, এক সঙ্গে খেতে চায়—কেমন? বুড়ী হি-হি করে হাসে।

মিছা কি! শিবনাথ হাসির আড়ালে গাঢ় নিশ্বাস ফেলে। মনে মনে বলে দিন ঘনিয়ে এসেছে, যাবার ঘণ্টা বেজে গেছে—তাই সবকিছু খাবার জন্য তোমার জিভ চুকচুক করছে।

তা কে দিলে জামরুল। কিনলি তুই? বুড়ী একটু পরে শুধায়।

না, বাইরে রকে বসে ছিলাম, পাড়ার দুটো ছোঁড়া কোচড় ভরে জামরুল নিয়ে যাচ্ছিল—আমায় দিলে ওরা।

তুই চাইলি বুঝি ?

কেন চাইব, ওরা নিজে থেকে দিলে। বলে কি, শিবদাদু তুমি বুড়ো হয়েছ, গাছে চড়তে পার না, এই দ্যাখো নন্দীবাবুদের বাগান থেকে কত জামরুল পেড়ে এনেছি আমরা। নাও, তোমায় দুটো দিলাম—খাও।

বড়ো ভাল ছেলেরে ওরা।

হুঁ, নন্দীবাবুদের বাগানের জামরুলও ভারি মিষ্টি। শিবনাথ বেশ রস করে বলল।

খা। বুড়ী বলল।

ঐ একটা কথাই বলল। কেননা শিবনাথ টের পায়, এই মুহূর্তে একটার বেশি দুটো কথা বলা বুড়ীর পক্ষে সম্ভব না। মিষ্টি জামরুল শুনে বুড়ীর জিভে এত জল এসে গেছে। অবাক কাণ্ড, শিবনাথ চিন্তা করে, যত দিন যাচ্ছে, খাওয়ার নাম শুনলে শুকনো খেজুরপাতার মতন খসখসে একরত্তি জিভটা কেমন রসে টইটই করে ওঠে।

কি হল বেটি। খাবি একটা তুই ?

নারে বাপ। তুই খা। আমার কি দাঁত আছে, চিবোব কেমন করে। বলতে বলতে বুড়ীর ঠোঁট বেয়ে সত্যি দু ফোঁটা লালা ঝরে পড়ে। আর একবার চৌকাঠের ওদিকে উঁকি দিতে দৃশ্যটা শিবনাথের চোখে পড়ে। মনে মনে সে হেসে বাঁচে না। তক্ষণি আবার রগড় করে বলে, দাঁত নেই তো হয়েছে কি। কাটারি দিয়ে কুচিয়ে দেব, চুষে খাবি ?

বুড়ী মাথা নাড়ে। বড় করে শ্বাস ফেলে।

কি হল। গলাটা ওদিকে বাড়িয়ে রেখে শিবনাথ বলল, কুচিয়ে দিলে খেতে পারবি না ?

অমন করে জামরুল খেয়ে কি সুখ আছে। ছোট মেয়ের মতন বুড়ীর গলায় যেন নতুন করে খেদ অভিমান জাগল। যে জিনিস যেমনটি করে খাবার—।

তাই বলো। যে জিনিস যেমন করে খাবার তেমন করে না খেলে—শিবনাথ নিজের মনে চোখ টেপে। হাসে। এখনো বেটির কামড়ে কামড়ে ফল খাবার শখ!

আচ্ছা শিবু। তোর আর কটা দাঁত আছে বাপ ? বুড়ী শুধোয়।

চারটে।

ওপরের পাটির ? না কি নীচের।

এই দ্যাখো। কেবল একপাটি দাঁত থাকলে যেন জামরুল কামড়ে খাওয়া যায়। শিবনাথ খিঁচিয়ে ওঠে। সব ভুলে গেছিস বুড়ী। তোর কি কোনোদিন দাঁত ই,

ছিল না। আখ জামরুল কোনোদিন চিবিয়ে খাসনি? ওপরের নিচের দুপাটির দুটো করে দাঁত আছে আমার।

আহা! তুই কত সুখে আছিস, জামরুল পেয়ারা আখ সব চিবোতে পারিস—চিড়ে মুড়ি ছোলাভাজা বাদামভাজা। ঝর ঝর করে বুড়ীর ঠোঁট বেয়ে জল পড়ছিল, শিবনাথ টের পায়। তবু, বুড়ীর কথা থামছিল না। কাল সন্ধ্যেবেলা দাওয়ায় বসে টুকুসটুকুস করে চিনাবাদাম খেয়েছিলি, তাই না শিবু? আমি শুনেছি।

চুপ চুপ! শিবনাথ এবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বুড়ীকে ধমক লাগাল। যেন এই জন্মে কোনোদিন চিড়ে মুড়ি চিনেবাদাম তুই খাসনি, এখনো খাওয়ার আফসোস, হুঁ! আমি সুখে আছি, আমার চারটে দাঁত আছে।

ধমক খেয়ে বুড়ী মিইয়ে যায়। চুপ করে থাকে। তক্তপোষের ময়লা কাঁথার বিছানায় উবু হয়ে বসে আছে প্রাচীন মানুষটা। সব কটা পাকাচুল ঝরে পড়ে ছোট মাথাটা নেড়া হয়ে অবিকল কদবেলের চেহারা ধরেছে। পাকাটির মতন সরু ঠ্যাং ও কাঁকড়ার বাচ্চার মতন শুকনো খুদে খুদে দুটো হাঁটু। হাড় ছাড়া আর কিছু নেই বলে বুড়ীর হাঁটুর দিকে তাকালে শিবনাথের এখন দুটো বাচ্চা কাঁকড়ার কথা মনে পড়ে। দু হাঁটুর মাঝখানে থুতনিটা ঝুলিয়ে দিয়েছে বুড়ী।

শিবনাথ আরও দেখল বুড়ীর মাথার ওপর দিয়ে এধারের বেড়া থেকে জাল টেনে একটা মাকড়সা ওপাশের বেড়ার দিকে হেঁটে যেতে চাইছে। কাল দুপুরে ঝাড়ন বুলিয়ে শিবনাথ জালটা ভেঙ্গে দিয়েছিল।

আমি সুখে আছি, এখনো আমার চারটে দাঁত আছে। ইচ্ছে করে শিবনাথ গলায় ঝাঁজ ফুটিয়ে তুলল। যদিও মনে মনে সে হাসে। যেন বুড়ীকে চটাতে তার ভাল লাগে। আমি আখ খাই, পেয়ারা খাই, চিড়েমুড়ি চিবোই—তাই হিংসের তোর পেট ফাটে, তাই না মা?

না রে বাপ, এমন কথা বলিস না। তুই আমার পেটের সন্তান। তোর সুখ দেখলে আমার সুখ!

উঁহু, কক্‌খনো না। শিবনাথ মাথা নাড়ে। বুড়ীর মতন তার মাথার চুল ঝরে পড়েনি, তবে সবটা মাথাই এখন সাদা হয়ে গেছে। ভুরু জোড়া সাদা হয়ে গেছে। বুড়ীর অবশ্য ভুরুর লোমও উঠে গেছে। ফলে কুঁচকোনো কপালে ও ছানিপড়া চোখে লেপালেপি হয়ে গিয়ে সে এক আজব চেহারা ধরেছে মুখটা। সেদিকে চোখ রেখে শিবনাথ আবার একটু রগড় করে। হুঁ, আমি খুব টের পাই, রাত্তিরে আমি রুটি খেয়ে হজম করি—তুই সাবু ভিজিয়ে খাস, তাই তোর ঈর্ষে। রাস্তার কল থেকে এখনো আমি বালতি ভরে জল টেনে আনি—দেখে তোর মন খারাপ…

এ কি বলিস শিবু, অ্যাঁ। বুড়ী প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এমন করে তুই আমার মনে দুঃখু দিস, দশমাস দশদিন তোকে আমি গভ্ভে ধরেছিলাম।

শিবনাথ হাতের বাকি জামরুলটা চিবিয়ে শেষ করল। একটা ঢেকুর তুলল। কাঁধের গামছা দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। তারপর কোণা থেকে ঝাড়ুনটা তুলে নিয়ে আবার মাকড়সার জালটা ভেঙ্গে দিল। তারপর হাত থেকে ঝাড়ন নামিয়ে রেখে কাঁথাটা টেনেটুনে বুড়ীর বিছানাটা ঠিক করে দেয়।

এবার বুড়ীরও কান্না থামে। অর্থাৎ ছেলে তার পরিচর্যা করছে টের পেয়ে মনে সান্ত্বনা পায়। কিন্তু কান্নার ফোঁপানিটা থেকে যায়। হাড়গোড় বেরোনো পাতলা ছোট শরীরটা তখনও কাঁপে। শিবনাথ এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে। গায়ে একটা বোতাম ছেঁড়া ব্লাউজ। স্তন দুটো শুকিয়ে পাঁজরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে, কালো ফুটকি দুটো ছাড়া এখন আর কিছুই চেনা যায় না। মনে হয় আট বছরের একটি মেয়ের লেপাপোছা বুক। এই স্তন টেনে শিবনাথ বড় হয়েছিল, বিশ্বাস করতে কেমন বাধে। রোগা জীর্ণ শরীরে আস্ত একটা থান কাপড়ের বোঝা বইতে পারে না বলে শিবনাথ শুধু একটা সায়া পরিয়ে রেখেছে মানুষটাকে।

কি হল! কাঁপছিস কেন, শীত করছে বেটি? শিবনাথ তক্তপোষের কাছে ঝুঁকে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ বাপ। বাইরে বুঝি ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে।

কোথায় ঠাণ্ডা হাওয়া! সারাদিন খটখটে রোদ ছিল। রোদ পড়ে গিয়ে এখন বিকেল হচ্ছে।

তাই তো ঠাণ্ডা লাগছে। রোজ বিকেল পড়তে আমার কেমন শীত করে শিবু।

কম্বলটা জড়িয়ে দেব?

দে বাপ।

পায়ের কাছ থেকে ভাঁজ করা কম্বলটা তুলে শিবনাথ বুড়ীর গায়ে জড়িয়ে দিল।—হয়েছে?

হুঁ, বুড়ী আরাম পায়। হাঁটুর ভাঁজ খুলে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসে।

তোর কি বিকেল পড়তে শীত করে শিবু? বুড়ী প্রশ্ন করে।

আমার কেন শীত করবে! শিবনাথ হাসে। আমি কি তোর মতন ঐ যে বলে লাতুড়ে, লেতলেতে বুড়ি হয়ে গেছি। আমি এখনো শক্ত। আমার গায়ের রক্ত এখনো গরম।

বুড়ী চুপ করে থেকে বড় একটা শ্বাস ফেলে।

কি হল! শিবনাথ গলা চড়িয়ে দেয়। আবার বুঝি মন খারাপ হল?

কেন মন খারাপ হবে! বুড়ী চমকে ওঠে।

হেঁ হেঁ, আমি টের পাই। তোর শিবু এখনো শক্ত আছে। তার রক্ত গরম। তার শীত করে না। তোর মতন অচল হয়ে সে বিছানা নেয়নি—

ষট্‌ ষট্‌! কেন বিছানা নিবি। তুই যে আমার জোয়ান ছেলে। আমার কাছে তুই আজও ছটফটে দশ বছরের খোকা।

বটে! ঘরের চালে টিকটিকি ডাকে। শিবনাথ আবার গলা ছেড়ে হাসে। এটা জব্বর বলেছিস বুড়ী। তোর শিবু এখনো দশ বছরের খোকা থেকে গেছে। কথাটা শেষ করে শিবনাথ মনে মনে বলে, ভাগ্যিস তোর দু চোখে ছানি পড়েছে বুড়ী। না হলে দেখতে পেতিস তোর দশ বছরের খোকার ভুরু ও মাথার চুল রসুনের রং ধরেছে, কোমর বেঁকে গেছে, আজ পর্যন্ত আটাশটা দাঁত পড়ল আর যেহেতু তোর গর্ভের সন্তান, তারও একটা চোখে ছানি দেখা দিয়েছে।

আচ্ছা শিবু, তোর সঠিক বয়সটা এখন কত জানি বাবা? দুম করে বুড়ী প্রশ্ন করল। শিবনাথ যা আশঙ্কা করছিল। এইমাত্র সে লক্ষ্য করেছে, আঙুলের কড গুনে বুড়ি নিজের বয়েসের হিসাব বার করতে লেগে গেছে। যেন কিছুতেই হিসাবটা ঠিক রাখতে পারে না। গুলিয়ে ফেলছে।

কেন, তুই তো বললি আমি তোর দশ বছরের খোকা। ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল শিবনাথ। বলিসনি এই মাত্তর?

বুড়ী চুপ। শিবনাথ বিরক্ত হতে গিয়ে তখনি আবার হাসে। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে যায়। রোজ একবারটি করে বুড়ীকে শিবনাথের সঠিক বয়স মনে করিয়ে দিতে হয়। শিবুর বয়স জানতে পারলে বুড়ী এক ছুটে নিজের বয়সে চলে যেতে পারে, আর হোঁচট খায় না, হিসাবের গোলমাল হয় না।

কি হল! কথা বলিস না? বুড়ীর মুখের সামনে শিবনাথ লম্বা করে গলাটা বাড়িয়ে দেয়। আমার বয়স জানতে চাইছিস, তার মানে তুই তোর বয়স নিয়ে আবার গোলমালে পড়েছিস—এই তো? তাজ্জব কাণ্ড! যেন আমি বাপ তুই মেয়ে, যেন আমি তোর গভ্‌ভে জন্মাইনি। তুই যদি তোর বয়স ভুলে থাকিস, আমিও আমার বয়স ভুলে গেছি—কেমন, হল তো মজা!

যেন শিবনাথ চটে গেছে, এমন একটা ভাণ করল। তারপর এক সেকেণ্ড চুপ থেকে বুড়ির মুখটা দেখল। তারপর আবার বলল, অ্যাঁ, আমার আগে তুই পৃথিবীতে এলি। কত মাছ ভাত দুধ ভাত খেলি, আম জাম কাঁটাল কলা, কত চিড়ে মুড়ি লক্ষ্মীপুজোর নাড়ু পৌষ পার্বণের পিঠেপুলি ঐ পেটটার মধ্যে ঢোকালি। বাবা মরল পর থেকে আলোচালের ভাত আর শাকচচ্চড়ি বা কত খেলি, আকাশে

কত শতবার চাঁদ দেখলি, রোদ দেখলি—সেই সঙ্গে কুয়াশা। পাখির গান শুনলি এই জীবনে কত, ঝিঁঝির ডাক শুনলি, বর্ষার দিনে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর। সব তোর মনে আছে, কেবল বয়সটা মনে থাকে না, হিসাব গুলিয়ে ফেলিস। তোকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল।

বুড়ী স্তব্ধ হয়ে থাকে, যেন ভয় পায়। থুতনিটা তুলে অসহায় ঘোলা চোখে ঘরের চাল দেখে। তাই তো। এ বড সাংঘাতিক কথা যে! এত বছর বেঁচে গেল, তার কোনো হিসাব জানল না বুড়ী। হিসাব না জেনে হঠাৎ যদি আজ হার্ট-ফেল করে! চোখ বোজে? এই আফসোস রাখার জায়গা কোথায়।

শিবনাথ মিটিমিটি হাসে। চোখ টেপে আর নিজের মনে বলে, রগডটা জমেছে ভাল।

শিবনাথ এখন সেই গল্পটা শুনতে চাইছে, যে গল্প শুনে মানুষের আশ মেটে না। জন্মের পর থেকে লক্ষবার শুনেও যে-গল্প পুরোনো হয় না।

শোন্ বুড়ী! ঘাড় তুলে শিবনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

এবার সে খিক্‌খিক্ হাসে। হেসে বুড়ীকে আশ্বাস দেয়, সান্ত্বনা দেয়। হুঁ আমি আমার সঠিক বয়স বলতে পারব, যদি তুই ঠিক করে বলতে পারিস আমি সকালে জন্মেছিলাম, না কি বিকেলে। ভর দুপুরে না কি নিশুতি রাতে। জোছনার রাত ছিল, না কি কাঠফাটা রোদ্দুরের দিন? শীতকাল ছিল! ঝমঝম বর্ষা? না কি ভয়ানক গরম কাল—কোন্‌টা?

এবার বুড়ীর ধূসর শুকনো চামড়ায় উজ্জ্বলতার ছাপ দেখা দেয়। ঘোলা চোখে একটা চকচকে চমক। রোজই এমন হয়। আজ যেন আরও বেশি পুলক জাগল বুড়ীর শরীরে মনে।

তা আমি খুব বলতে পারি শিবু। বুড়ী খনখনে গলায় হাসে। সেই সময়টা কি কোনদিন ভুলব! তোর জন্মদিনের ছবিটা আমার বুকের মধ্যে গেঁথে আছে।

এক মিনিট চোখ বুজে ছবিটা বুঝি আর একবার নিজে নিজে দেখে নেয় বুড়ী। তারপর ছেলের মুখের দিকে মুখটা তুলে ধরে।

শোন্, তখন একটা ঘুঘু ডাকছিল, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। আম পেকেছিল, পাকা কাঁঠালের গন্ধে জগতসংসার ভুরভুর করছিল। লিচুফল আগেই পেকে শেষ হয়ে গেছে। জামরুল পাকতে শুরু করেছিল। আর কালো জাম। এক একটা গাছের মাথায় যেন থোকা থোকা মেঘ ঝুলছিল।

ব্যস, এখন মনে পড়েছে, আর বলতে হবে না। শিবনাথ উৎসাহে মাথা ঝাঁকাল। তার মানে জষ্টি মাস ছিল ওটা। পচা ভাদ্দর না, কুয়াশা মরা কার্তিক

না। হুঁ, তবে তো ঠিকই আছে—চোখের নিমেষে আঙুলের কড় গুণে শিবনাথ বলল, আমার বয়স আজ পর্যন্ত টায় টায় সাতাত্তর, একদিন বেশি না কম না। এবার তোরটা ঠিক করে ফেল বেটি।

সোজা অঙ্ক, এখন আর কঠিন কি বাপ। মাড়ি ছড়িয়ে বুড়ী হাসে। তোর বয়সের সঙ্গে পনেরো যোগ কর—টুক করে আমার বয়সটা বেরিয়ে পড়বে।

বুড়ীর চোখেমুখে, খড়ি ওঠা গায়ের চামড়ায় হঠাৎ যেন রামধনুর সাতটা রং ঝিকিয়ে ওঠে। শিবনাথ অবাক হয়ে দেখে। বিরানব্বুই বছরের একটা পুরোনো শরীরে ঠিক এই সময়টায় সত্যিকার লাবণ্যের মতন কিছু উঁকি দেয়?

হি-হি! বুড়ী তখনও হাসে। বুঝলি শিবু, তোরা বলিস গরমের ছুটি—ওরা বলত আম-কাঁঠালের ছুটি। সেবার কলেজ ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও দেশের বাড়িতে চলে আসে। আগেব বছরও এসেছিল! কিন্তু আগের বারের মজা সেবার আর ছিল না।

কেন! কৌতূহলী চোখে শিবনাথ তাকায়।

হুঁ, বুড়ী ঘাড় নাড়ল, বাড়ির পেছনে মস্ত বাগান। তিন তিনটে জামগাছ। আগের বছর আমিও গাছকোমর বেঁধে ওর সঙ্গে এত উঁচু ডালে উঠে জাম পেড়ে খেয়েছি। সেবার আর পারলাম না। হাঁ করে সারাক্ষণ গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

গাছে চড়তে পারলি না কেন? শিবনাথ ঢোক গিলল।

কি করে পারব বাপ। পেটটা ফুলে তখন জয়ঢাক। আঁচলটা কোমরে জড়াতে গেলেও লাগে। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়।

তারপর?

গাছে চড়ে একা একা ও অনেক জাম পাড়ল। একটাও মুখে দিচ্ছিল না কিন্তু। আমার জন্য ওর মন খারাপ লাগছিল টের পেলাম। ওপর থেকে পাতার ফাঁক দিয়ে বার বার যেমন করে আমায় দেখছিল।

হুঁ, তোকে দেখছিল, তারপর? শিবনাথ ভুরু কুঁচকোয়।

একটু পরে এত জাম নিয়ে গাছ থেকে নেমে এসে ও সব আমার কোঁচড়ে ঢেলে দিল।

শিবনাথ একগাল হাসল। তখন বুঝি নুন-লঙ্কা মাখিয়ে আরাম করে বসে সবগুলো খেলি।

কখন আর খেলাম। রোদ থাকতে থাকতে ব্যথা উঠল। তক্ষুণি আঁতুড়ে ঢুকলাম। একটু পরে তুই ট্যাঁ করে উঠলি।

আততায়ী

অশোক রায় চৌধুরী

অসীম গেট্ খুলে রাস্তায় বেবোতেই মুখোমুখি হয়ে গেল পিওনের সঙ্গে। সাইকেল থেকে নেমেই সে অসীমেব দিকে দিল একটা এনভেলপ্। অসীম চিঠিটা হাতে নিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করল কাব হ'তে পাবে। সম্ভাব্য সব কটি নামই মনের বুড়ি ছুঁযে গেল। অসীম হাঁটতে হাঁটতেই নিজেব নামেব মত কৌতূহল নিয়ে খামের চিঠি লেখা ঠিকানার ওপর চোখ রাখলো।

কাটাকুটি করে লেখা নাম ও ঠিকানা। বি-ডাইবেকটেড হযে এসেছে। প্রথমে লেখা ছিল মিস্ অরুনিমা সান্যাল, বিশ্বাস পাড়া, রানাঘাট, নদীযা। পবে নীল কালি দিয়ে লেখা, মিসেস অরুনিমা ব্যানার্জী, কেয়ার অব, অসীম ব্যানার্জী ৩৫নং দমদম সাউথ সিথি, কলিকাতা। এনভেলাপের মাথায় রেখাঙ্কিত একটা লাইন—এক্সক্লুসিভ্লি প্রাইভেট্ ইফ্ নট এ্যাড্রেসি ফাউণ্ড টু রিটার্ণ টু সেণ্ডার।

অসীম অবাক হ'ল। এমন কি গোপনীয় সংবাদ? যা অন্য কাবো দেখা চলবেনা? অসীমকে যেন আচম্কা গোয়েন্দা শার্লকহোমস্-এ পেয়ে বসল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলো চিঠির লেখক জানেনা নিশ্চয়ই যে, অরুনিমা এখন বিবাহিতা। তার মানে পত্র লেখকটির সংগে অরুনিমার বছর পাঁচেকের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। পাঁচ বছর কি তার আগে অরুনিমার সংগে পত্র লেখকের পরিচয় ছিল। একবার অসীমের মনে হল; পত্রের প্রেরকটি তো মহিলাও হতে পারে। পুরুষই যে হবে তাই বা অসীম আগে ভাগে ভেবে বসছে কেন? যদি পুরুষ হয়, তবে এদের দু'জনের পরিচয়ের গভীরতা কোন স্তরে ছিল? চিঠিটার গন্ধ শুঁকে তাতে যেন খানিকটা আঁচ করতে পারছে অসীম। চিঠিটা হাতে নিয়ে অসীম বাজারের ভেতর একটা চায়ের দোকানের নির্জন কোণ বেছে নিয়ে বসল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই অসীম ভাবতে লাগলো আকাশ পাতাল। লজিকের সুতোয় যুক্তির জাল বুনে চলল মনে মনে। তার পর একসময় গরম চা আঙ্গুলের ডগায় লাগিয়ে আল্তো করে চিঠিটার বন্ধ মুখে লাগাতে থাকে, এবং একটু একটু করে অতি সন্তর্পণে খামের বন্ধ মুখ টেনে খুলতে থাকে। এক সময় খামের মুখখানা খুলে গিয়ে দু'খানা রুল টানা নীল কাগজ উঁকি মারল। রাবিন্দ্রীক ধাঁচে লেখা—চিঠি। কিন্তু চিঠিটার উপরে চোখ বুলোতে সাহস পেল না

অসীম। একটা অপরাধ বোধ শাসাতে লাগলো অসীমকে। নিজের স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠি খুলতে এবং অসাক্ষাতে পড়তে অসীমের নীতিজ্ঞান তখনো খোঁচা মারছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হলনা সে বিবেকের শাসন।

এক সময় পড়তে শুরু করল অসীম। সম্বোধনটা পড়েই অসীম হোঁচোট খেল। প্রিয়ব্রতা অরু, অসীমের সন্দেহ এতক্ষণে দৃঢ় মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হল। দ্রুত পড়ে চলল অসীম—শর্ত ভঙ্গ করে আজ তোমার কাছে চিঠি লিখছি। কারণ কয়েক-দিনের মধ্যে, পৃথিবীর সবার সাথে সব রকম শর্ত ভঙ্গ করে একেবারে চম্পট দেব যেখানে তোমরা কেউ এ অপরাধীর নাগাল পাবে না আর। আসছে ১০ই মার্চ আমার অপারেশন। ক্যানসার রোগ! বুঝতেই পারছো আমার ভবিষ্যত। জানি এ পড়ে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তোমাদের সবার কাছ থেকে চম্পট দেবার এমন সুযোগই বা হাত ছাড়া করি কি করে। ভাবতে খুব ভাল লাগছে, এই চিঠিটা পেয়ে তোমার মুখের চেহারা কেমন দাঁড়াবে। সেই কলেজ জীবন। প্রথম পরিচয়। ভীরু ভীরু চোখে, লাজুক লাজুক আমন্ত্রণ। আহারে! কতদিন দেখি না। ছ বছর, মনে হয় ছ'শো বছর। তোমায় ছেড়ে এই ছ'বছর, কেমন করে বেঁচে আছি, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তুমি ভাল আছো তো? এতদিনে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার ছেট্টো সঞ্চয় কি নিঃশেষ হয়ে গ্যাছে? একটু আধটু তলানিও কি পড়ে-টড়ে নেই? যদি পারো, এসো একবারটি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। আর মাত্র দশদিন সময় আছে। যাবার আগে তোমার মুখের সেই মিঠে স্বরে—মিতু ডাকটুকু শুনে যেতে ইচ্ছে করছে। জানিনা এখন তুমি কোথায়। আমার এ চিঠি পাবে কিনা। তবু আমার বিশ্বাস, আমার এই শেষ ডাক। হৃদয়ের রক্তের ডাক—তোমায় খুঁজে পাবেই। তোমার হয়ত মনে আছে সেই যে কে একজন দার্শনিক বলে ছিলেন—'মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি কেউ পরম নিষ্ঠা নিয়ে তৃষ্ণার জল চায়, তবে জলও নাকি তার কাছে এসে হাজির হয়।' অর্থাৎ পর্বতও মহম্মদের কাছে আসে। তুমিও কি আসবে না? তোমার প্রতীক্ষায় দুচোখ খুলে—

মিতুন দত্ত

পুনঃ আমি বহরমপুর সদর হাসপাতালে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বেড নং ৪০-এ ভর্তি আছি।

অসীম চিঠিটা হাতে করেই বসে রইল ঃ যেন সে এখন এক স্বপ্নের ট্রাংকুলাইজারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে…। ক্রমে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে অনেক দিন আগের একটি পরিচিত মুখ ভেসে উঠলো। চোখের পাতা খুলল। ডাকলো—অসীম.

আমি চলে যাচ্ছি। হাজারিবাগ গিয়ে তোমার চিঠির আশায় থাকব। এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি বাবা, মার সাথে কথা না বলো, তবে আমাকে হয়তো বাবার দেখা সম্বন্ধই মাথা পেতে নিতে হবে। এরপর অসীম ওর হাত দুটো ধরে বলেছিল—বেনু! তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমি এখন নিরুপায়। আমায় দু'টো বছর সময় দাও। আমার আর একটু···। পা দুটো একটু তুলবেন বাবু, টেবিলের তলাটা ঝাঁট্ দেব। চায়ের দোকানের ছেলেটির কথা শুনে অসীমের সম্বিত ফিরে এল। অসীম স্বপ্নের প্যারাস্যুটে উড়ে উড়ে, যেন এই মাত্র ভূমি স্পর্শ করল। হাতের কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখলো। বেলা এগারটা বাজে।

অসীম উঠে দাঁড়াল। যেন একটা যুগকে সে অতিক্রম করে এল। বেনুকে ভীষণ মনে পড়ছে। এখন ও কোথায় আছে কে জানে। তবু একটিবার যেন ইচ্ছের হেলিক্যাপটারে উড়ে যেতে মন চাইছে—বেনু নামের সেই স্বপ্নের কাছে। অতীত যৌবনের সেই পরিচিতা। এখন কি বেনু চিনতে পারবে অসীমকে? ভালবাসা শব্দটি যদি, ডিক্স্‌নারীর পোষাকী শব্দ হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই পারবে। একদিন তো এই অসীমের জন্যই বেনু পাগল হয়ে ছিল। দেহ মন যৌবন সব তুলে দিয়েছিল এক গ্লাস পানীয়ের মত অসীমের হাতে। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেই, অসীমের হাতের চিঠিটার দিকে নজর পড়ল।

তাইতো কি করে এখন এটা অরুনিমাকে দেওয়া যায়। একান্ত গোপনীয় চিঠি। একটা অপরাধ বোধ এখন পীড়া দিচ্ছে অসীমকে। চট্ করে মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে অসীম ডাকঘরের দিকে চলল। মনে মনে পরিকল্পনা এঁটে নিল। ডাক পিওন রমেশকে দিয়ে চিঠিটা সে পাঠিয়ে দেবে, অরুনিমার কাছে। যাতে সে বুঝতেও না পারে, এ চিঠি সে দেখেছে বা পড়েছে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অসীম পোষ্টাপিসে গিয়ে আঠা দিয়ে অতি সন্তর্পণে চিঠিটার মুখ আগের মত লাগিয়ে দিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল একবার। না এবার কেউ দেখলেও বুঝবেনা যে এটা এর আগেও একবার ইজ্জত খুইয়েছে। অসীম মনে মনে চিঠিটার সংগে স্ত্রী অরুনিমার মিল খুঁজে পেল। দিব্যি একটা খোলা ও পড়া চিঠির মত, মানুষ কেমন কৌশলে নিজেকে একটা অ-খোলা এবং অ-পড়া চিঠির মত উপস্থাপিত করে। নিখুঁত অভিনয়। সতীত্ব, সতত্বঃ এইসব শব্দগুলো একবার মনে মনে আওড়ে নিল অসীম।

অসীম তার পরিচিত পিওন রমেশের হাতে চিঠিটা ও দুটো টাকা আগাম বকশিস দিল এবং বুঝিয়ে দিল তাকে কি করতে হবে। পিওনটি যথারীতি সেলাম ঠুকে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অসীম কিছুক্ষণ নির্জন রাস্তায় আনমনে

পায়চারী করতে লাগল। বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ যেন ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। কয়েকটি সিগারেট সে নিঃশেষ করে ফেলল অল্প সময়েই। মনে মনে হিসেব করে দেখল পত্রলেখক মিতুনের অপারেশন ১০ই মার্চ। অর্থাৎ আগামী কাল। চিঠিটা অনেক ঘুরে রিডাইরেকটেড হয়ে আসতে আসতে দিন আটেক কাবার হয়ে গ্যাছে। আগামী কালই তো ১০ই মার্চ। একটা নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ এবার অসীমকে পিন্ ফোঁটাতে লাগলো। অসীম রাস্তার দু' একজন পরিচিত লোকের সংগে অযাচিতভাবে আলাপ করে একটু ডাইভারসন খুঁজলো। কিন্তু নিজের কথা নিজের কাছেই কেমন যেন অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে লাগলো।

ঘন্টা খানেক পরে অসীম বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লো। গেট্ খুলে উঠোনে পা দিয়েই দেখতে পেল, অরুনিমা জানালার শিক্ ধরে কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে প্রগাঢ় যন্ত্রণার ছাপ। অসীম ঠিক বুঝতে পারলো ওই যন্ত্রণাকে। অন্য কেউ এই মুহূর্তে অরুনিমাকে দেখলে বুঝতেই পারবে না, এই সুন্দর ও লাস্যময়ী মুখের অতলে কি ক্ষত লুকিয়ে আছে। রান্না করতে করতে হয়ত চিঠিটা পেয়েছে। বাটনা লাগা শাড়ীর আঁচল। এলো চুল। অবিন্যস্ত মন নিয়ে, যেন স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছে অরুনিমা। তাই অসীমকে সে দেখতেই পেল না। অরুনিমাকে ডিসটার্ব না করেই, অসীম তেল মেখে তোয়ালে সাবান হাতে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুক্‌লো। অনেক সময় নিল স্নান করতে। অসীম শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে, গরম মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা করে নিতে লাগল। অসীম ভাব্‌ছে ; কি আশ্চর্য জীবন, মানুষ বেশ আছে, দিনগুলো বেশ ছন্দময় কাট্‌ছে—কাট্‌ছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, কোথা থেকে খ্যাপা হাওয়া এসে, মাঝে মাঝে সব কিছু ওলট পালট করে দেয়! অসীম ভাবছে, যদি এমন একটা চিঠি, বেনুর কোন দুঃসংবাদ বয়ে আনত ? অসীম তখন কি করত ? নিশ্চয়ই অরুনিমাকে বলত না। দিব্যি কাজের অছিলায় টুক্ কোরে গিয়ে দেখে আসত বেনুকে। অরুনিমার মুখখানা এখন অসীমকে পীড়া দিতে লাগ্‌লো। একটা বোবা যন্ত্রণা যেন গুমরে গুমরে উ্‌ঠতে লাগ্‌লো। একে বারে বুকের নরম জায়গাটিতে। যে যন্ত্রণা অরুনিমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এতক্ষণ, কেমন করে তা সংক্রামিত হল অসীমের মধ্যে। যেন এ এক সার্বজনীন যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণা শুধু মিতুনকে ঘিরেই নয়। মিতুন, বেনু, অসীম, অরুনিমা, পৃথিবীর সবাইকে ঘিরেই।

যেন এক যন্ত্রণার এক রূপকতা সবাইকে তাড়া করছে। ক্লান্ত করছে। কেউ বুঝি সুখী নয় এখানে। সব মুখই দুঃখের মুখ অসুখের মুখ।

এর পরে খাবার টেবিল। দুজনে মুখোমুখি। অরুনিমা জিজ্ঞাসা করল অসীমকে,

আর ভাত লাগবে কিনা ? অসীম ঘাড় নেড়ে নিষেধ করল। আড় চোখে অরু-নিমার মুখের দিকে তাকিয়ে অসীম আঁচ করতে চেষ্টা করল—অরুনিমার ভেতর-কার দাহ। এক সময় জিজ্ঞেস করল—কি হল তোমার শরীর ভাল নেই নাকি ?

অরুনিমা উত্তর দিল না।

অসীম মনে মনে পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলল। অরুনিমাকে আজই নিজের কাজের অছিলায় সংগে করে বহরমপুর নিয়ে যাবে। যাতে করে আগামীকাল সে বহরমপুর হাসপাতালে মিতুনকে দেখতে যেতে পারে। মনে মনে অসীম ইতস্তত করতে লাগলো—কিভাবে কথাটা পাড়বে সে। অরুনিমা যদি বুঝে ফেলে। তার কাজ ও অরুনিমার হাসপাতাল এক জায়গায় কি করে হঠাৎ ঠিক হল। কাকৃতালীয়ও তো হতে পারে। যা বোঝে বুঝুক। অরুনিমা নিশ্চয়ই জানেনা সে চিঠিটা খুলে পড়েছে। সব ঘটনা সে জেনেছে।

খেতে খেতেই অসীম হঠাৎ মনে পড়ার মত বলে উঠ্‌লো। ভাল কথা অরু, আজই আমাকে মুর্শিদাবাদ যেতে হবে। ওখানে ট্যুর প্রোগাম আছে দু'দিনের। হেড্‌-অফিস থেকে—চিঠি এসেছে। জরুরী প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে পাঠিয়েছে। না গেলেই নয়। সাংবাদিক মানেই তো বুঝতে পারছো, রথের ঘোড়া। ছুট বলতে ছুট দিতে হয়। তুমিও আমার সংগে চল, দুদিন তোমারও আউটিং হয়ে যাবে। মুর্শিদাবাদ জায়গাটা বেড়াবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। এই সুযোগে নবাব প্যালেসও দেখা হয়ে যাবে। অরুনিমা নির্বাক, কাঠের পুতুল। হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

বিকেলে অসীম অরুনিমাকে নিয়ে লাল্‌গোলা মেল ধরল। সারা পথ অরুনিমা গাড়ীতে নীরব রইল। অসীম বুঝতে পারলো অরুনিমার ভেতরে এখন দুর্যোগ চলছে। তাই তাকে কোন ডিসটার্ব না করে ফার্স্ট ক্লাসের বাঙ্কএ উঠে শুয়ে পড়ল। মনে মনে অরুনিমার প্রতি এক মিশ্র অনুভূতি জেগে উঠ্‌ল অসীমের। একটা ঘৃণা, বিরূপ মনোভাব ; শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সংগে মাখামাখি হয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া অসীমকে ক্লান্ত করতে লাগলো। যে নারী তার পূর্বপরিচিত একজনের অসুখের সংবাদে এত বিমূঢ় হয়ে পড়তে পারে, যাতে করে বাহ্যিক সমস্ত লৌকিক অনুভূতি পর্যন্ত বিস্মৃত হতে পারে, সে নারী নিঃসন্দেহে মহৎ। ভালবাসার ঐশ্বর্যে সে নারী ঐশ্বর্যময়ী। ছ'বছর আগের পরিচিত একজনের সারা মনে ভালবাসা এত প্রকট, অসীম তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারে না। অন্যকোন সো-বল্‌ড্‌ বিদুষী মেয়ে হলে কি অতীতের পরিচিত একজনের চিঠি পেয়ে—এমন বিহ্বল হয়ে পড়ত ? নিশ্চয় না। হয়ত আমলই দিত না। স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে দিব্যি হেসে খেলে এড়িয়ে যেত, জীবনের এইরকম একটা বাতিল অধ্যায়।

রাত্রি আটটা নাগাদ ওরা যেয়ে পৌঁছল বহরমপুর স্টেশনে। শহরের কাছাকাছি এক আবাসিক হোটেলে ওরা উঠ্‌লো। সারাদিনের ধকল—শরীর ও মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। ওরা দুজনে রাত দশটা নাগাদ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। খুব ভোরে উঠে অসীম বেরিয়ে গেল। অরুনিমাকে বলে গেল—কাজ সেরে ফিরতে ফিরতে রাত্রি হতে পারে। সারাদিন চুপচাপ ঘরে বসে না থেকে—রিক্সায় করে ইচ্ছে হলে একটু এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসতে পারো। অসীম আরেকবার মনে মনে হিসেব করে দেখলো, হ্যাঁ আজই মিতুনের অপারেশনের তারিখ।

অসীম বেরিয়ে গেল। অরুনিমা চুপ চাপ হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। অসীম যেতে যেতেই একবার পিছন ফিরে তাকালো, হাত নাড়লো।

রাত ন'টা নাগাদ হোটেলে ফিরল অসীম! রিক্সা থেকে নেমে ওপর দিকে তাকালো। অন্ধকারে মনে হ'ল, দোতালার বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে, বুকের ভেতরটায় কেমন বেশ একটা দরদ ভরা যন্ত্রণা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে লাগলো; অরুনিমাকে ছেড়ে অচেনা, অজানা জায়গায় এতক্ষণ থাকাটা মনে মনে বরদাস্ত করতে পারল না অসীম। খুব অন্যায় হয়েছে। যে অরুনিমা তাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে ভয় পায়, তাকে সারাটা দিন একলা ফেলে রাখা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে মনে হতে লাগলো। তাড়াতাড়ি অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দু'দুবার হোঁচোট খেল অসীম। হাঁটুর কাছটায় মনে হল, ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুলো। অসীম আমল দিল না। এখন অরুনিমার চিন্তায় তার সমস্ত অনুভূতি নিয়োজিত। একরকম ছুটেই উঠে এল অসীম। হাতে একটা বড় কিটস ব্যাগ। ঘরের কাছে গিয়ে দেখতে পায়, অন্ধকার এক কোণে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অরুনিমা। অসীম তার কাছে এসেই প্রশ্ন করল—কোন অসুবিধা হয়-নিতো? খুব দেরী করে ফেলেছি, এতক্ষণ তোমায় একা রেখে যাওয়া আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গ্যাছে। অরুনিমা নীরব কাঠের পুতুল। অসীম ওর কাঁধে হাত রাখে। কাছে টানে, জিজ্ঞাসা করে—ভয় পাওনিতো একা একা? একটি কথাতেই অরুনিমার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন বন্যার জলে ভেসে গেল। সে ছুটে এসে অসীমকে প্রানপণ জড়িয়ে ধরল—বলল—আর কখ্‌খোনো আমায় এভাবে একলা রেখে যাবে না। অসীম ঝুঁকে পড়ে ওকে আদর করল। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল—আর কখখ্‌নো তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।

হেমাঙ্গর ঘরবাড়ি

বিমল কর

রবিবার সকাল থেকেই হেমাঙ্গর দু হাত ভরে কাজ। অবসর পায় না। সকালে দু-চার গাল মুড়ি আর গ্লাসটাক চা খেয়ে হেমাঙ্গ কাজে নেমে পড়ে। প্রথমে ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঝুল ঝাড়া। বাড়িটা বাবার আমলের। একতলা। ছোট-বড় মিলিয়ে গোটা চারেক ঘর। মাথায় টালির ছাদ। তলায় সিলিং। আগে চটের সিলিং ছিল। পোকা মাকড় ইঁদুরে উত্যক্ত হয়ে হেমাঙ্গ চট ফেলে প্লাই-উডের সিলিং লাগিয়ে নিয়েছে।

এই বাড়ির ওপর হেমাঙ্গর বড় মায়া। কেন, কি জন্যে বোঝা যায় না। হেমাঙ্গর কেউ নেই, বাবা নয়, মা নয়; বউ বাচ্চাও নেই। তবু মায়া। প্রতি রবিবার নিজের হাতে ঘরদোর পরিষ্কার করে; প্রতি বছর বর্ষা কেটে গেলে পুজোর পর টালি মেরামত করায়, দরজা জানলার খড়খড়ির কাঠকুটো পালটায়।

রবিবারের সকালে ঘর দিয়ে শুরু করে হেমাঙ্গ। অনেকটা সময় চলে যায়। তারপর বসে তার সাইকেল নিয়ে। চাকার টাল, হ্যাণ্ডেলের ঢিলেমি, ব্রেক-ট্রেক সবই নিজের হাতে শুধরে নেয় হেমাঙ্গ, পাংচার সারাই করে—তারপর হাওয়া-টাওয়া দিয়ে, ঝেড়েঝুড়ে রেখে দেয় মাঝের ঘরে।

সাইকেল সারাইয়ের পর নেমে যায় বাগানে। তেমন কিছু বাগান নয়, বাড়ির সামনে মামুলি কিছু ফুলগাছ; জবা, করবী, বেল, দু চারটে লতাপাতা। পেছনের দিকে পেঁপে আর কলাঝোপ। একটা বাতাবি লেবু গাছও মস্ত বড় হয়ে উঠেছে; অথচ ফল ধরে না।

বাগানের কাজ সেরে হেমাঙ্গ হাত-মুখটা ধুয়ে নেয়। জল খাবার খায় ভেতর বারান্দায় বসে। মোটা মোটা রুটি গোটা দুই, ডাল কিংবা কুমড়ো ভাজা। গ্লাসটাক চা খায়। খেতে খেতে ঝিমলিকে দু চারটে উপদেশ দেয় কাজকর্মের।

ঝিমলি এ বাড়ির সব। রান্নাবান্না করে, বাসনকোসন মাজে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, সারাদিন ফাঁকা বাড়িটার পাহারাদারী করে। ঝিমলি তার মায়ের সঙ্গে কোলিয়ারীর সাইডিংয়ে কয়লা বোঝাই করত একসময়। টব্ গাড়িতে পায়ের আঙুল উড়ে যায়। মেয়েটা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। বাঁ পায়ে খুঁত, খোঁড়া মতন।

কাটি নিয়ে হাঁটাচলা। ঝিমলির মা মারা যাবার পর থেকেই সে এখানে। হেমাঙ্গ তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে কাজের মানুষ করে নিয়েছে। এ বাড়িতেই সে আজ পাঁচ সাত বছর।

বয়াদ্দ সিগারেটটা শেষ করে হেমাঙ্গ সোজা চলে যায় কুয়োতলায়। নেড়িকে ডগ্ সোপ মাখিয়ে রবিবারের স্নান করাবে। রবিবারের স্নানপর্ব কোনোদিনই নেড়ির পছন্দ নয়, কিন্তু হেমাঙ্গর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া তার সাধ্যে কুলোয় না।

নেড়িকে স্নান করাতে করাতে হেমাঙ্গ তার সাধের কুকুরের সঙ্গে কথা বলবে। নেড়ু, তুই বেটা মোটা হচ্ছিস না কেন রে? খাচ্ছিস দাচ্ছিস লাটের মতন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস, তবু তোর এই হাড়গিলে চেহারা! ছো ছো—লোকে বলবে কি? মাংসটাংস খেলে পালবাবুদের ডালকুত্তার মতন হতে পারতিস। কিন্তু এটা বোস্টমের বাড়ি বুঝলি? নো মিট নো এগ···। মাঝে মাঝে ফিশ।···নেড়ু, আমার মাংস ডিম খাওয়া বারণ ছিল অসুখের জন্যে। না খেতে খেতে অভ্যেস চলে গেছে। এখন পিঁয়াজ রসুনের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারি না।···তুই নেড়ু, বিলেতে জন্মাস নি—এখানে জন্মেছিস বেটা, ডালভাত খেয়ে তাগড়া হতে পারিস না? ঝিমলি কী খায় রে হারামজাদা? ও কেমন তাগড়া হচ্ছে দেখিস না?'

নেড়ি হেমাঙ্গর সঙ্গে বাক্যালাপে যোগ দেয় না। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ তুলে বোধ হয় সকরুণ মিনতি জানায় ছেড়ে দেবার। ছাড়া পেলেই রোদে গিয়ে গা ঝাড়ে।

এরপর হেমাঙ্গ বসে নিজের কাপড় চোপড় নিয়ে। ঝিমলি সোডা-সাবানে ফোটানো জামাকাপড়ের বালতিটা রেখে দিয়ে যায় কুয়োতলায়। হেমাঙ্গ আরও খানিকটা বার সাবান নিয়ে কাপড়, জামা, চাদর কাচতে বসে পড়ে। নিজের কাপড়চোপড় নিজেকেই কেচে নিতে হয় হেমাঙ্গর। এখানকার কোনো ধোপী তার কাপড় নেবে না। কোনো লণ্ড্রিঅলাও নয়।

আজ বছর দশ হেমাঙ্গ এক আশ্চর্য ব্যাধিতে ভুগছে। ব্যাপারটা কী সে জানে না। অন্যেও নয়। বাবা ছেলের বিয়ে দিয়ে, সবে মারা গেছেন। মা বেঁচে। হেমাঙ্গ তার নতুন বউ নিয়ে তখন খুব রসকষে মেতে আছে। সকাল থেকেই পেছনে লেগে আছে বউয়ের। দুপুরটুকু অফিস। বিকেলে ফিরে এসে কোনোদিন 'দেশবন্ধু সিনেমা', কোনোদিন নতুন রেকর্ড কিনে এনে গ্রামোফোনে বাজানো, মাঝে মাঝে এস্রাজ টেনে নিয়ে বউকে শেখানোর চেষ্টা। ওরই মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে বাজার থেকে সেন্ট এনে দিচ্ছে বউকে, বোম্বাইঅলার মিঠাই, দু একটা পল্কা গয়নাও গড়িয়ে দিচ্ছে। একেবারে ভরভরে রয়রয়ে জীবন।

হঠাৎ একদিন হেমাঙ্গর নজরে পড়ল তার গায়ে মুখে কেমন সাদা সাদা দাগ ফুটেছে।

'এই দেখো তো, এগুলো কী?'

হেমাঙ্গর বউ ভাল করে দেখলেও না। পান খাচ্ছিল। বরের মুখের সামনে হাঁ করে শ্বাস ছেড়ে বলল, কিচ্ছু না।

হেমাঙ্গর বুকের মধ্যে ঘ্রাণ চলে গিয়েছিল পানের আর মুখের। বউয়ের গাল টিপে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

এইভাবে শুরু। দাগগুলো ক্রমশ ছড়াতে লাগল, বাড়তে লাগল।

হেমাঙ্গর মনে খুঁত খুঁত শুরু হল। সারা দিনই নিজে দেখে, বউকে দেখায়। 'কি করি বলো তো? এ যে বেড়েই যাচ্ছে। কুষ্ঠটুষ্ঠ হবে নাকি?'

বউ এখন আর উপেক্ষা করতে পারল না। মুখ ভারী করে বলল, 'ডাক্তার দেখাও।'

মা বলল, নিমজলে চান কর, নিমতেল মাখ, সেরে যাবে।

নিমতেল, নিমসাবান, চন্দন, শাঁখের গুঁড়ো যখন চলছে মা মারা গেল। মা মারা যাবার পর হেমাঙ্গ নিজের দিকে তাকাতেই ভয় পেত। সর্বাঙ্গে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী কিছুই বাদ নেই—তবু গায়ের চামড়া সাদা হয়ে গেল। এ-এক অদ্ভুত সাদা রঙ, গাছের ওপরকার ছাল ছাড়িয়ে ফেললে যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম।

হেমাঙ্গর বউ ততদিনে সাবধান হয়ে গিয়েছে। ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায়। ফেরার সময় একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসে, কোন এক দাদাটাদা।

হেমাঙ্গর বউ বলল, 'তুমি একবার কলকাতায় যাও। দেখিয়ে এস।'

কলকাতায় যাবার মতনই অবস্থা তখন হেমাঙ্গর। মাথার চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে সব। ভুরু সাদা। চোখের পালক সাদা। মুখ, হাত, পা সবই শ্বেত। ঠোঁট দুটো যেন আগুনে ঝলসে যাবার মতন রঙ ধরেছে।

হেমাঙ্গ কলকাতায় গেল।

দিন চার পাঁচ পরে ফিরে এসে দেখল পায়রা চলে গেছে। হেমাঙ্গর বউয়ের ডাক-নাম ছিল, পায়রা। ভাল নাম সন্ধ্যামণি। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় পায়রা দু-লাইন চিঠি লিখে রেখে গেছে। 'তোমার সঙ্গে আমি আর থাকতে পারি না। শুতে পারি না তোমার পাশে। তাকাতে পারি না। আমার গা ঘিনঘিন করে। বমি আসে।'

পায়রা চলে যাবার পর হেমাঙ্গ ঘরে বসে কেঁদেছিল খুব। বছর আড়াই তিন,

তার মধ্যে হেমাঙ্গ কোথা থেকে কোথায় নেমে এল। হেমাঙ্গর চেহারায় আর কোন স্বাভাবিকতা নেই। গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। পায়রা যে চলে যাবে হেমাঙ্গ কিছুদিন ধরেই আঁচ করতে পারছিল। কার সঙ্গে যাবে তাও সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের হালে পায়রার পেটে ডিম এসেছিল। কার ডিম? কী হবে তার—? কেমন হবে সে? ভগবানের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করল হেমাঙ্গ।

তখন থেকেই হেমাঙ্গ একা। বাড়িতে, বাড়ির বাইরেও। ঝিমলি পরে এসেছে। নেড়ি আরও অনেক পরে।

মানুষ একে একে সবই সয়ে নেয়। হেমাঙ্গও নিয়েছিল। শান্ত ভাবে। বাইরের সঙ্গে তার একটু-আধটু সম্পর্ক না রাখলেই নয় বলে রেখেছিল, নয়ত পেট চলবে না। অফিসে যেত। মাইল দেড়েক দূর। ব্যাধিটা প্রকট হবার পর তার আগের অফিস থেকে তাকে সরিয়ে নিয়েছিল, নিয়ে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিল যেখানে তিন চারটি মাত্র লোক। কাজ প্রায় কিছুই ছিল না। চুপচাপ বসে থাকা, মাঝে মাঝে চাপরাসী গোছের দু-তিন জনকে স্টোর খুলে তেলটেল বার করে নিতে বলা, হিসেব লেখা। ম্যালেরিয়া কনট্রোলের এই ডিপোয় বসে দিন কেটে যাচ্ছিল হেমাঙ্গর।

হেমাঙ্গ জানত অফিসে তার দিন এই ভাবেই কেটে যাবে। চেয়ারে বসে, কখনও খোলা জানলা দিয়ে বনতুলসীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে, কখনও ফাঁকা আকাশ, কিংবা মেঘের পাল দেখে। অফিসে তার চেয়ার টেবিল কাঠের সস্তা একটা আলমারি অস্পৃশ্যের মতন পড়ে থাকে, স্পর্শ করে না কেউ। সাইকেলটা রাখা থাকে বাইরে। কেউ ছোঁয় না। নিজের হাতে জল নিয়ে খায় হেমাঙ্গ, নিজের হাতে গ্লাস ধোয়। দুপুরের টিফিন খেয়ে কৌটোটা ধুয়েটুয়ে রেখে দেয় টেবিলে।

এই অফিস ওই বাড়ি। অফিসে একরকম একাই। বাড়িতেও তাই। বাড়িতে অবশ্য ঝিমলি আছে, নেড়ি আছে। তবু একা বইকি!

হেমাঙ্গ এখানকার পুরোনো লোক। চেনাজানা সবাই। কাকা, দাদা, মাসীমা পিসীমা বলার লোক অগুনতি, বন্ধুবান্ধবও কম ছিল না। এখন কেউ নেই। হেমাঙ্গ নিজেই বুঝতে পেরেছিল—তার কাছ থেকে লোকজন সমাজ সামাজিকতা সরে যেতে চাইছে, অন্তত আড়ষ্ট বোধ করছে কাছাকাছি থাকতে, বুঝেসুঝে হেমাঙ্গ নিজেই সরে এল। বাড়ির মধ্যে গুটিয়ে ফেলল নিজেকে, বাইরের সঙ্গে সম্পর্কে যেটুকু না রাখলে নয় মাত্র সেইটুকু রাখল। বাজারঘাট যেতে হয়, অফিস ছুটতে হয়, কেউ মারাটারা গেলে একবার তার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়—এই রকম

সম্পর্ক সে রেখেছিল। বিয়েটিয়েতেও তার নেমন্তন্ন থাকত মাঝে মাঝে। হেমাঙ্গ জানত, ওটা ভদ্রতা—আন্তরিকতা নয়। হেমাঙ্গও ভদ্রতা রক্ষা করত, পোস্ট অফিসে গিয়ে পনেরো বিশ টাকা মনি অর্ডার করে দিত।

শুধু একজন হেমাঙ্গকে হঠাৎ হঠাৎ এসে কেমন চমকে দিয়ে যেত। বিলাস। হেমাঙ্গর বন্ধু। বয়সের বন্ধু নয়, একটু ছোটই বয়েসে। মাইল তিরিশ দূরে ব্যারাজে কাজ করত। বিলাস মাঝে মাঝে আসত মোটর বাইকে ঝড় তুলে। এসেই চেঁচাতো—'হেমদা আমার দুটো ডবল ডিমের ওমলেট চাই, গোটা চারেক রুটি, দু কাপ চা। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

হেমাঙ্গ চাইত না বিলাস আসুক। চমৎকার ছেলে বিলাস, তাজা বাঘের মতন চেহারা, টগবগ টগবগ করছে। বিয়ে করে নি। বছর চৌত্রিশ বয়েস হয়ে গেল। হেমাঙ্গ অস্বস্তি বোধ করত। কিন্তু কে ঠেকাবে বিলাসকে!

কাছেই মতিয়ার দোকান। ঝিমলি গিয়ে ডিম কিনে আনত, ওমলেট বানাবে।

এই বিলাসই মাঝে মাঝে বলত, 'হেমদা, আমায় কে একজন বলেছিল— সাপে কামড়াবার পর নাকি কারও কারও এই রকম হতে দেখা যায়। এতটা নয়। তোমায় না একবার সাপে কামড়েছিল?'

হেমাঙ্গকে একবার সাপে কামড়েছিল বিয়ের আগের বছর। ওষুধ ইনজেকশান কম হয়নি। তবে এটা সাপের কামড়ের ফল না অন্য কিছু হেমাঙ্গ জানে না। কেই বা জানে!

এই বিলাসই মাঝে মাঝে রবিবারে চলে আসত। দেখত, হেমাঙ্গ তার বাড়ি, বাগান, সাইকেল, গ্রামোফোন, কুকুর আরও কত কি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

বিলাস হেসে বলত, 'আচ্ছা হেমদা তোমার এই স্থাবর অস্থাবর জঙ্গম সম্পত্তি মানে পদার্থগুলো কি তুমি যাবার সময় বুকিং করে স্বর্গে নিয়ে যাবে? কিসের পরোয়া তোমার। তুমি মরে গেলে এ-শালা তো ভূতের বাড়ি হবে, পাঁচ ভূতে ঠ্যাং ঝুলিয়ে নাচবে। তুমি কেন এই বাড়িফাড়ি নিয়ে এত মায়া কর?'

কথাটা মিথ্যে নয়, তবু হেমাঙ্গর পছন্দ হত না, ভাল লাগত না শুনতে। স্পষ্ট কোনো জবাবও দিত না, বলত, 'এই নিয়েই তো আছি রে! নিজের জিনিস নিজে না দেখলে চলে…।'

'নিজের জিনিস দেখার জন্যে তুমি যেন বসে থাকবে?'

হেমাঙ্গ জবাব দিত না।

হেমাঙ্গ নিজের জিনিসই দেখত: তার বাড়ি, ঘর দোর, তার বাগান, তার সাইকেল, গ্রামোফোন, তার যা কিছু এখনও তার অধিকারে আছে—সব।

এই ভাবেই চলে যাচ্ছিল হেমাঙ্গর। রবিবার বাদে অন্যান্য দিন সে তেমন করে নিজেকে বাড়ি এবং প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত না, অবসর পেত না। রবিবার হেমাঙ্গ সকাল থেকে বসত, কাজকর্ম সেরে স্নান খাওয়া সারতে দুপুর। দুপুরের পর খানিকটা গড়াত বিছানায়। বিকেলে কাপড় চোপড় তুলে নিয়ে ইস্ত্রি করতে বসত। তারপর সন্ধ্যের মুখে রামসোহাগের দোকানে চলে যেত শিশি হাতে দিশি মদ কিনে আনতে।

বাড়ি ফিরে এসে হেমাঙ্গ নেশা নিয়ে বসত। কোনো কোনো দিন গ্রামোফোনে তার পুরোনো রেকর্ডগুলো বাজাত, কোনো কোনোদিন এস্রাজটাকে সুরে তুলতে চাইত, পারত, পারত-না। নেশা কানায় কানায় পৌঁছে গেলে হেমাঙ্গ তার সাবেকী বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ডান হাতটা যত দূর পারে ছড়িয়ে দিত, যেন কাউকে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার কিংবা ধরার চেষ্টা করছে।

আরও রাত হলে ঝিমলি এসে দাঁড়াত। ডাকত; 'বাবু—এ বাবু।'

হেমাঙ্গ মাতলামি করত না। উঠত। খাওয়া সারত। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ত।

মাঝ কিংবা শেষ রাতে ভাঙা ঘুমের মধ্যে হেমাঙ্গ কেমন স্বপ্নের ঘোরে দু হাতে বিছানা হাতড়াত, ভাবত কেউ যেন পাশে এসে রয়েছে। কেউ আসত না।

আবার ঘুমিয়ে পড়ত হেমাঙ্গ।

দুই

রবিবারে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসে সাইকেল সারাচ্ছিল হেমাঙ্গ। কার্তিক মাস। শীত নামছে। রোদে বসে সাইকেল সারাতে সারাতে হেমাঙ্গ কাঠের ফটক খোলার শব্দ পেল। এখান থেকে দেখা যায় না। হেমাঙ্গ কিছু দেখতে পেল না। বিলাস হলে মোটর বাইকের শব্দটাই আগে কানে পড়ত।

ঝিমলির কাছে এসেছে কেউ। দু-চার জন দেহাতী আসে মাঝে মাঝে লাউ কুমড়ো, বেগুন কিংবা আরও কিছু বেচতে। নদীর চুনো মাছও হতে পারে।

হেমাঙ্গ সাইকেল নিয়ে মেতে থাকতে থাকতে শুনল নেড়ি চেঁচাচ্ছে। দু-চার বার চেঁচাবে, তারপর থেমে যাবে। ঝিমলি লাউ-কুমড়ো-কচু, কখনও কখনও চুনো মাছ কিনবে। নেড়ি বেটা মাছের গন্ধও বুঝতে পারে।

ঝিমলির কাছে যারা আসে সোজা পেছনে রান্নাঘরের দিকে চলে আসে। কেউ এল না। এলে হেমাঙ্গ দেখতে পেত।

নেড়ি সমানে চেঁচাচ্ছে।

হেমাঙ্গ সাইকেল রেখে উঠল। বাইরে বারান্দায় এসে দেখল, ফটকের বাইরে

রাস্তায় টাঙা দাঁড়িয়ে, একটি বউ আর মেয়ে ফটকের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হেমাঙ্গ অবাক হল। বুঝতে পারল না। বাগান দিয়ে ফটকের কাছে চলে এল হেমাঙ্গ। নেড়িকে ধমক দিল।

কাছে এসে তাকাতেই হেমাঙ্গ কেমন চমকে উঠল। পায়রা নাকি? চেনা যায় না। মুখের আদলই যেন বদলে গেছে। তবু পায়রা বলেই মনে হচ্ছে।

মানুষ যেভাবে চোখের ওপর হাত আড়াল করে সূর্যের গ্রহণ দেখে অনেকটা সেইভাবে হেমাঙ্গ বউটির মুখ দেখতে লাগল। "কে?"

'আমি' হেমাঙ্গকেও দেখছিল বউটি।

"পায়রা?"

মাথা নোয়াল পায়রা।

হেমাঙ্গর পা কাঁপছিল, হাত কাঁপছিল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ঘা মারছিল। পিঠ নুয়ে আসছিল, মেরুদণ্ডে টনটনে ব্যথা।

হেমাঙ্গ ফটক খুলতে গিয়ে দেখল, ওপরের আঙটা খোলা, পায়রা ফটক খুলে ঢুকেছিল—নেড়ির চেঁচানিতে ভয় পেয়ে আবাব পিছিয়ে গেছে।

"এসো," হেমাঙ্গ ডাকল। ডেকে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

পায়বা পা বাড়াল। মেযেটির হাত ধরে বলল, "টাঙায় আমার বাক্স পুঁটলি রয়েছে।"

"নামিযে নেব। তুমি এস।...তোমার মেয়ে?"

পায়বা মেয়েটিকে বলল, "প্রণাম করো।"

মেয়েটি পায়রার হাত চেপে ধরে হেমাঙ্গকে দেখছিল ভীষণ ভয়ে ভয়ে, চোখ বড় বড।

হেমাঙ্গ বলল, "পরে হবে। তোমরা ভেতরে এস। টাঙাঅলাকে ছেড়ে দি আগে।"

পাযরা মেয়ের হাত ধরে দঁাড়িয়ে থাকল বাগানে। নেড়ি তফাতে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। ঝিমলিও কখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। দেখছিল পায়রাদের।

টাঙা ছেডে দিল হেমাঙ্গ। বাক্স, পুঁটলি ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখল। তারপর পায়রাদের ডাকল, "ঘরে এসো।"

কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। পায়রা বলতে যাচ্ছিল। হেমাঙ্গ বলল, "পরে হবে। ট্রেনে এসেছ বললে। জিরোও। কাপড়চোপড় ছাড়। কিছু খাও। পরে শুনব।"

রবিবারটা অন্ত রকম হয়ে গেল হেমাঙ্গর। জল তুলে দিল কুয়ো থেকে, পায়রা আর তার মেয়ে স্নান করবে। নতুন সাবান বার করে দিল। ঝিমলিকে বলল, আবার করে রান্না চাপাতে, শাকসবজি রঁাধতে বেশী করে। মাঝের ঘরে বাবার আমলের খাট পড়েছিল। পুরোনো সতরঞ্জি চাপা দেওয়া। সেটা পরিষ্কার করে রাখল।

নিজে স্নান করে, মেয়েকে স্নান করিয়ে পায়রা রোদে এসে দাঁড়াল। এলো ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। সামনের দিকের অনেক চুল পেকে গেছে পায়রার। কানের পাশেও সাদা হয়েছে। মুখ ভারী, ফোলা, গালে দাগ ধরেছে। শরীরটাও বেশ ভারী লাগছিল। হেমাঙ্গর চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট ছিল পায়রা। হেমাঙ্গর এখন বছর বিয়াল্লিশ বয়েস। পায়রার ছত্রিশ সাঁইত্রিশ। এই বয়েসেই পায়রার এত চুল পাকল কি করে, শরীরটাই বা এমন ভারী হয়ে উঠল কেন—হেমাঙ্গ বুঝতে পারল না। যুবতী বয়েসে পায়রার চেহারা ছিল ছিপছিপে, গালটাল উঁচু ছিল, দাঁত ছিল ধবধবে। এখন একেবারে গোল। দাঁতে ছোপ ধরে ধরে কালচে দাগ হয়েছে।

হেমাঙ্গ কুয়োতলায় বসে তাড়াতাড়ি কাপড়জামা কেচে নিচ্ছিল। পায়রা এসে দাঁড়াল।

হেমাঙ্গ চাদর কাচতে কাচতে বলল, "তোমার মেয়ের নাম কি ?"

"পুতুল।"

"কত বয়েস হল ?"

"ন' শেষ করেছে।"

হেমাঙ্গ একবার সামনের দিকে তাকাল। আতাগাছের ডালে শালিখ বসে আছে একটা।

"কোথায় ও ?" হেমাঙ্গ জিজ্ঞেস করল।

"ওই তো— ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। কাশি হয়েছে ঠাণ্ডা লেগে।"

"আহা—রে! ওকে ঠাণ্ডা জলে চান করালে কেন ? ঝিমলিকে বললেই গরম জল করে দিত।"

পায়রার সাদা খোলের শাড়ির ঝোলানো আঁচল মাটিতে পড়ছিল। তুলে নিতে নিতে বলল, "রোদে জলে পড়ে পড়ে থেকেছে, সয়ে গেছে সব। কিছু হবে না। সেরে যাবে।"

হেমাঙ্গ পায়রার মুখের দিকে তাকাল। ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ, উদাসীন মুখ।

দুপুরেও হেমাঙ্গ এড়িয়ে গেল পায়রাকে, যেন তার কোনো ব্যস্ততা নেই, কৌতূহল নেই পায়রার কথাবার্তা শোনার। পরে শোনা যাবে। এখন এই দুপুরে একটু ঘুমিয়ে-টুমিয়ে নিক পায়রা। সারারাত রেলে এসেছে, প্যাসেঞ্জার গাড়ি তো! সে জানে কী ভিড়।

পায়রা ঘুমোল না। মাঝের ঘরে শ্বশুরের পুরোনো খাটে মেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকল। হেমাঙ্গ তেমন কিছু বিছানাপত্র দিতে পারে নি। দিতে হলে নিজেরটা দিতে হয়। তা কি দেওয়া যায় পায়রাদের।

হেমাঙ্গও ঘুমোল না। সামান্য গড়াগড়ি করে বাইরে গিয়ে বসে থাকল।

বিকেলের গোড়ায় হেমাঙ্গর নজরে পড়ল, প্রতিবেশীদের দু-একজন তার বাড়ির সামনে দিয়ে পায়চারি করে যাচ্ছে, উঁকি দিচ্ছে রাস্তা থেকে। হেমাঙ্গর বাড়িতে কেউ কোনোদিন আসে নি। কে এল টাঙায় চড়ে, মেয়ের হাত ধরে?

হেমাঙ্গর মনে হল, পায়রা ফিরে এসেছে এটা বোধ হয় এখনও কেউ জানতে পারেনি। জানা সম্ভব নয়। কে আর মনে রাখতে গেছে পায়রার মুখ।

এমনি করেই বিকেল হল, ফুরিয়ে গেল। পায়রার মেয়ে সামান্য ধাতস্থ হয়েছে, তবু কেন যেন হেমাঙ্গর দিকে ঘেঁষছে না। ভয় পাচ্ছে বোধ হয়।

চা-টা খাওয়া হলে হেমাঙ্গ বলল, "আমি একবার বাজার ঘুরে আসি?"

পায়রা বলল, "কেন?"

"দত্ত স্টোর্সে রেডিমেড তোশক বালিশ পাব। সাইকেলে বেঁধে নিয়ে আসি।

"পুরোনো নেই?"

"না।"

"খুঁজেপেতে কিছু বার করা যাবে না?"

"না।"

পায়রা কিছু বলল না আর। হেমাঙ্গকে দেখতে লাগল। ফর ফর করছে সাদা চুল, সাদা মুখ, চোখের ভুরু পালক সবই সাদা, গায়ের লোমও ধবধব করছে। চোখের মণিটুকুই যা এখনও কালো। কিছু বোঝাই যায় না হেমাঙ্গকে দেখলে, কী ভাবছে সে।

হেমাঙ্গ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কার্তিকের বিকেল ফুরোলো হু হু করে। সন্ধ্যে হল। এদিকে এখনই কুয়াশা নামতে শুরু করেছে। অন্ধকারে তারা ফুটে উঠল আকাশে।

হেমাঙ্গ ফিরল। সাইকেলের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে তোশক এনেছে, তোশক

বালিশ চাদর। হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো থলি একটা। তার মধ্যে থেকে পুতুলের কাশির ওষুধ, এক শিশি তালমিছরি, টুকিটাকি বার করে রাখল।

নতুন বিছানাটা পায়রা নিজেই পেতে নিল। মেয়েকে এক চামচ কাশির ওষুধ খাওয়ালো।

সন্ধ্যের পর হেমাঙ্গ কেমন ছটফট করতে লাগল। একবার করে বাইরে যায়, আবার ঘরে ঢোকে। বারবার পায়রার দিকে তাকায়। কি যেন বলতে যায়, পেরে ওঠে না।

পায়রা বলল, "কী ?"

হেমাঙ্গ ইতস্তত করে বলল, "আমি একটু ইয়ে খাই—এ সময়।"

পায়রা বুঝল। বলল, "খাও না।"

"তোমার মেয়ে ?"

"ওর দেখার অভ্যেস আছে।"

হেমাঙ্গ তাকাল। পায়রার কোনো সঙ্কোচ নেই। হেমাঙ্গ বলল, "আমি ওপাশের ছোট ঘরটায় যাই বরং। এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া যাবে না।"

"যাও।"

এতোদিন নিজের ঘরে বসেই খেত হেমাঙ্গ। মাঝে মাঝে গ্রামোফোনের পুরনো রেকর্ড বাজাত। এস্রাজ তুলে সুর ফোটাত। আজ নিজের ঘর ছেড়ে কোণার দিকের একটা কুঠরিতে চলে গেল হেমাঙ্গ। বাতিও জ্বালল না। জানলাটা খুলে দিল। পেছন বাগানের দিকে জানলা। কুয়াশা জড়ানো ঝাপসা আলোর ভাব এল একটু জানলা দিয়ে।

হেমাঙ্গ সামান্য খাওয়ার পর পায়রা এল।

বসার কিছু নেই, পুরোনো ভাঙা বাক্সর ওপর বসল পায়রা।

হেমাঙ্গ বলল, "তোমার মেয়ে কোথায় ?"

"ঝিমলির কাছে, রান্নাঘরে।"

"আসবে না ?"

"না।"

হেমাঙ্গ আবার খানিকটা ঢেলে নিল।

পায়রা বলল, "রোজ খাও ?"

"না। রবিবারে খাই। কোনো কোনোদিন…"

"আগে তো খেতে না ?"

"না।"

"কত দিন খাচ্ছ ?"

"তা পাঁচ সাত বছর।"

পায়রা চুপ করে থাকল। হেমাঙ্গও চুপচাপ। অন্ধকারে কেউ কারুর আকৃতি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিল না, ভাসা ভাসা আবছা চোখে পড়ছিল! অন্ধকার যেন দু জনকেই পরস্পরের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। অবস্থাটা স্বস্তিদায়ক।

অনেকক্ষণ পরে পায়রা বলল, "আমি কপাল ঠুকে চলে এলাম।"

হেমাঙ্গ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। নামিয়ে রাখল। সিগারেট ধরাল। পায়রা এলো চুল কোনো রকমে জড়িয়ে খোঁপার মতন করেছে। শাড়ি পালটায় নি।

হেমাঙ্গ বলল, "তোমার শরীর তো ভাল মনে হচ্ছে না।"

"কেন ?" পায়রা অন্যমনস্কভাবে বলল।

"ফোলা ফোলা লাগছে। অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে যেন। তোমার বয়েস তো বেশী নয়।"

পায়রা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি ঠিকই আছি। ন' দশ বছর পরে আমায় দেখছ, তাই। মেয়েদের আর এই বয়েসে শরীরের কি থাকে! তার ওপর আমার মতন মেয়েদের।"

হেমাঙ্গ খেয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। পায়রা তার খুব কাছাকাছি। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। এত কাছাকাছি এমন করে কোনো মানুষ তার কাছে বসে নি আজ দশ বছর। বিলাস বাদে। কিন্তু বিলাস আলাদা।

"অসুখ বিসুখ করেনি তো ?" হেমাঙ্গ জিজ্ঞেস করল।

"বড় কিছু নয়। জানি না। কে আর দেখতে গেছে!"

"তোমার চুল পাকছে, দাঁত কালো হয়ে গেছে..."

পায়রা যেন কানে শুনল না। নিজের মনেই বলল, "এখান থেকে চলে যাবার পর আমার বরাতে ভাল কিছু জোটে নি। এখানে দু বছর, ওর কাছে ছ' মাস, তার ঘরে এক বছর—এই ভাবেই কেটেছে। নন্তদা—আমায় বছর আড়াই রেখেছিল, তারপর যা হয়..."

বাধা দিল হেমাঙ্গ, বলল. "থাক, ও কথার দরকার নেই।"

"শুনবে না ?"

"কি হবে শুনে! এ-রকম তো হয়। নতুন কিছু নয়।...আমি ভেবেছিলাম নন্তর কাছেই তুমি থাকবে।"

পায়রা তাকিয়ে থাকল হেমাঙ্গর দিকে। চোখের মণিও দেখা যাচ্ছে না। সব সাদা। দিশী মদের গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। পায়রার নাকে লাগছিল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পায়রা বলল, "তোমার কাছে ফিরে আসার মুখ আমার ছিল না, তবু এলাম। কপাল ঠুকে। আমার কোনো উপায় ছিল না। যদি তুমি বাড়িতে ঢুকতে না দিতে..."

"আমি তোমায় চিনতে পারিনি প্রথমটায়—"হেমাঙ্গ বলল, যেন কথা এড়িয়ে

পায়রা বলল, "চেনা মুশকিল। তখন একরকম ছিলাম, এখন অন্যরকম। তুমিও অনেক বদলে গেছ।"

"কেন! আমার সবই তো সেই রকম আছে। তুমি যাবার পর..."

"না, তুমিও বুড়ো হয়ে গেছ।"

"কোথায় বুড়ো—" হেমাঙ্গ হাসল, "রোজ মাইল চারেক করে সাইকেল ঠেঙাই।"

পায়রা চুপ করে থাকল।

নেড়ি বার কয়েক ডাকল। সে বাইরের বারান্দা থেকে যেন ছুটে কোথাও গেল। রাস্তা দিয়ে গাড়ী যাচ্ছিল। শব্দটা মিলিয়ে গেল সামান্য পরে। জানলার বাইরে কুয়াশা গাঢ় হয়ে আছে। ঠাণ্ডা আসছিল হেমন্তর।

পায়রা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যে এইভাবে এলাম—আসা আমার উচিত হয়নি। কোন মুখে আসব বল?"

হেমাঙ্গ বলল, "না না, তোমার আর কি দোষ!" বলে আবার খানিকটা ঢেলে নিল গ্লাসে। বলল, "আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখেছি, তুমি কিছু অন্যায় করোনি। আমায় নিয়ে কে থাকতে পারত, পায়রা? কেউ নয়। দেখো না, বাইরের লোক যারা—আমার মুখ ছাড় যাদের আর কিছু চোখে পড়ে না আমার সঙ্গে খায় না শোয় না—তারাও আমায় সহ্য করতে পারে না। আমার পুরোনো অফিস থেকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছে। বাজারে দোকানটোকানে গেলে আমায় কোনো জিনিস ছুঁতে পর্যন্ত দেয় না, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়—এটা দাও ওটা দাও। বিলাস ছাড়া আমার বাড়িতে কেউ আসে না।" হেমাঙ্গ গ্লাস তুলে নিয়ে বড় করে চুমুক দিল। গলা পরিষ্কার করল। বলল, "যারা আমায় দু চার ঘণ্ট চোখেও সহ্য করতে পারে না তারা বাইরের লোক। তুমি বউ হয়ে আমার চব্বিশ ঘণ্টা বারো মাস কেমন করে সহ্য করতে? পারতে না।"

পায়রা বলল, "তখন পারিনি।"

"কেউ পারত না।"

হেমাঙ্গ চোখ তুলে পায়রার দিকে তাকাল। কিছু বলল না।

পায়রার মেয়ের গলা পাওয়া গেল।

হেমাঙ্গ বলল, "তোমার মেয়ে। যাও দেখো গিয়ে। নতুন জায়গা, ভয়টয় না পায়।

পায়রা বলল, "পাক ভয়। আমি আর কত ভয় থেকে বাঁচব।" বলে উঠে গেল।

হেমাঙ্গ সাড়া দিল না।

পায়রা চলে গেল। সে চলে যাবার পর অন্ধকারে হেমাঙ্গ শান্ত স্বাভাবিকভাবে বসে থাকল। বসে বসে বাকিটা শেষ করতে লাগল।

নেশা গাঢ় হয়ে গিয়েছিল হেমাঙ্গর। কপালে ঘাম। চোখ সামান্য জড়িয়ে আসছিল· নিজের নিঃশ্বাসেই গন্ধ পাচ্ছিল দিশী মদের।

হেমাঙ্গ উঠল। ভেতর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল এদিক ওদিক। ঝিমলি তখনও রান্না ঘরে। আলো জ্বলছে। এতটা রাত সে করে না। রান্নাবান্না শেষ করে পশ্চিমের কুঠরি ঘরে তার খাটিয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আরও রাত বাড়লে, হেমাঙ্গ যখন তার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে, ঝিমলি কাছে গিয়ে তাকে ডাকে, বাবু—এ বাবু! রান্নাঘরের ওপাশে কলাঝোপ। অন্ধকারে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকাল হেমাঙ্গ, তার চোখে তারাটারা ধরা পড়ল না।

পায়রা মেয়েকে খাওয়াচ্ছে, ঘরে বসে। খাওয়াতে খাওয়াতে কথা বলছিল।

হেমাঙ্গ মেয়েটার সঙ্গে এখনও কথাবার্তা বলতে পারে নি। দু-একবার 'কি খুকু কি করছ' গোছের কথা বলেছে। পায়রার মেয়ে হেমাঙ্গকে দেখে ভয় পাচ্ছে, না কি পছন্দ করছে না—বুঝতে পারছিল না সে। মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখছে হেমাঙ্গ। পায়রার ছাঁদ রয়েছে মুখে। নাক চোখ পায়রার মতন।

নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিল হেমাঙ্গ।

পায়রা মেয়েকে বলছিল, "খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে।"

"তুমি শোবে না?"

"না। আমার রাত হবে। খাব দাব। তারপর…"

"আমার ভয় করবে।"

"কিসের ভয়! এখানে কি ভূত থাকে?"

"এটা কার বাড়ি মা?"

"তাতে তোমার দরকার কি। পাকা পাকা কথা কেবল!"

পায়রার মেয়ে চুপ করে গেল।

নিজের ঘরে এল হেমাঙ্গ। বাতি জ্বালল না। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল

উপুড় হয়ে। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে হেমাঙ্গ একবার চেষ্টা করে দেখল, তার মাথা ঠিক মতন কাজ করছে কিনা! দত্ত স্টোর্সে কত টাকা দিয়েছিল মনে করার চেষ্টা করল। পারল। মাথা ঠিক আছে।

হঠাৎ অনেক পুরোনো কথায় চলে গেল হেমাঙ্গ। পায়রা কোন রঙের শাড়ি পরতে ভালবাসত? টিয়া-সবুজ রঙ। তার কোন দাঁতটা বেঁকা ছিল? নীচের পাটির ডান দিকের সামনের একটা দাঁত। পায়রার কোন্ বুকের তলায় বড় আঁচিল ছিল? ডান? নাকি বাঁ? ডান।

হেমাঙ্গ আচমকা হেসে উঠল। পায়রার কোথায় কি ছিল হেমাঙ্গ কি সত্যিই জানত? না আজও জানতে পারছে?

সংসারের এইটেই মজার। সব জিনিসই গায়ের চামড়া নয় দেখা যায় না, দেখা যায় না। হেমাঙ্গকেই কি দেখা যায়?

তিন

হেমাঙ্গ ঘুমিয়ে পড়েছিল। নেশার মধ্যে গভীর ঘুম। প্রথমে তার খেয়াল হয় নি, পরে খেয়াল হল কে যেন তাকে নাড়া দিচ্ছে।

"কে ”

"আমি। অনেক রাত হয়েছে।"

"তুমি শোও নি?"

"শুয়ে ছিলাম। উঠে এলাম। নতুন বিছানার গন্ধ বড় নাকে লাগছে।"

"গন্ধ? কিসের গন্ধ?"

"কোরা গন্ধ। তোশক, বালিশ, চাদর···।"

হেমাঙ্গ উঠে বসল। "খেয়েছ?"

"না। তুমি খাবে চলো।"

"ঝিমলি কোথায়?"

"শুয়ে পড়েছে।"

হেমাঙ্গ উঠে দাঁড়াল। "চলো।"

খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে এল হেমাঙ্গ। সিগারেটটা শেষ করে নিচ্ছিল। পায়রা ঘরে এল।

হেমাঙ্গ বলল, "আর রাত করো না, শুতে যাও।"

পায়রা দরজাটা ভেজিয়ে দিল। পিঠ দিয়ে দাঁড়াল দরজায়।

অবাক হচ্ছিল হেমাঙ্গ। "কী?"

"ওই নতুন বিছানায় আমি শুতে পারব না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"ভীষণ গন্ধ লাগছে।"

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, "আর তো বিছানা নেই।"

পায়রা জবাব দিল না। না দিয়ে হেমাঙ্গর বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

হেমাঙ্গ হাত ধরে ফেলল পায়রার। শক্ত করে। বলল, "ও বিছানায় আরও গন্ধ। তুমি ঘেন্নাটেন্না ভুলে গেছ?"

"গিয়েছি। কবেই—।"

"কেমন করে গেলে?"

"গেলাম। আমার কপালে কত বিছানা জুটেছে জান তুমি?"

হেমাঙ্গ শক্ত হাতে পায়রাকে টানল। বলল, "আমি কিছু জানতে চাই না। কী লাভ আমার জেনে। তুমি কেন গিয়েছিলে তা জানি, কেন ফিরে এসেছ তাও জানি।"

"আমিও জানি।"

"কী?"

"তুমি এতকাল কেন এই ঘরবাড়ি আগলে বসেছিলে।"

হেমাঙ্গ কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "তুমি ও-ঘরে যাও। কাল বিছানা পালটে দেব।"

পায়রাকে ঘর থেকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল হেমাঙ্গ।

পরের দিন বেলায় পায়রা হেমাঙ্গর ঘরের ভেজানো দরজা খুলে দেখতে পেল না মানুষটাকে। ঝিমলিও দেখে নি। নেড়ি চেঁচাচ্ছিল। পায়রার মেয়ে রোদে দাঁড়িয়ে লেবুগাছের মাথায় পাখি দেখছিল।

পায়রা বার বার হেমাঙ্গর ঘরে আসা ছল।

হঠাৎ চোখে পড়ল হেমাঙ্গ এক টুকরো কাগজ রেখে গেছে। একদিন সে নিজে যেমন রেখে গিয়েছিল।

কাগজটা দেখল পায়রা। তারপর ছুটে গেল কালকের সেই ছোট ঘরটায়, যেখানে বসে হেমাঙ্গ সারা সন্ধ্যে দিশী মদ খেয়েছিল।

বোতলের ভাঙা কাঁচে গলার নালী কেটে হেমাঙ্গ মরেছে। তার সাদা শরীরে রক্তগুলো জমাট বেঁধে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। পায়রা দু'চোখ বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠল।

শব্দের খেলা

কালীকুমার চক্রবর্তী

আসুন বাবুরা, আসুন। একবার গ্রাম ঘুরে আসি চলুন। গ্রামে এখন হরেক মজা। ডাক্তার যেমন রোগীর নাড়ি ধরে তাপ-উত্তাপ বোঝে, আপনিও গ্রাম দেখে দেশের স্থিরতা-অস্থিরতা, এগোনো-পেছোনো, দেশবাসীদের সুখ-দুঃখ, রাগ-বিদ্বেষ বুঝে নিন। তাছাড়া ওই যে বলে না, গ্রামের গর্ভে শহর-টহর, এমন কি গোটা দেশটা লালিত হচ্ছে, তা একটু পরীক্ষা করে দেখবেন না?

আসুন না। শেয়ালদা থেকে বনগাঁ সেকশনের একমুখী লাইনের যে কোন গাড়ীতে উঠে সোয়া ঘণ্টা। তারপর দেখবেন অশোকনগর। আগে ছিল হল্ট। এখন এটা পুরোপুরি ষ্টেশন।

ষ্টেশনঘরের দিকে নয়, ঠিক তার উল্টো দিকে একটু ঝুঁকে লাফিয়ে পড়ুন। ডাইনে-বাঁয়ে সামান্য আড়ে তাকান। দেখবেন আশ্রাফাবাদ, শাঁখারী পট্টি, ইতিনা, বাণীপুর নামের সব রিফুজি কলোনী। কিছু আইনী, আবার কিছু সরকারী ভাষায় দখলদার মানুষের বে-আইনী কলোনী।

চলুন, থামবেন না বাবুরা। কষ্ট করে ধুলো-বালি পায়ে, প্যান্টটা ফোল্ড করে নিন না, দাঁতে দাঁত চেপে টলতে টলতে মাঠের সরু আল ধরে এগোতে থাকুন। যেতে যেতে দু'পাশে গর্ভবতী মাঠ, দূরে দূরে বাবলা, কয়েত্, মাদার, হিজলের সারি দেখবেন। কোন এক গভীর রাতে, সে এক গোপন কথা বাবু, আকাশটা নাকি নেমে আসে মাটিতে। উবু হয়ে মাটির গন্ধ শোঁকে। হামলে পড়ে চুমু খায়, আদর কাড়ে, তারপর কী ছুটোপাটি ছুটোপাটি। আকাশ মাটি একাকার হয়ে গিয়ে জন্ম নেয় নতুন পৃথিবী।

মাঠে ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ী। কোনটা বাঁশ গাছের খুঁটির তৈরী, কোনটা পাকাপোক্ত ইটের ভিতের, বাঁয়ে ঘুরলেই দেখবেন দুয়েকটা বাড়ী, আশ্চর্য হবেন না বাবুরা, এই অজ পাড়াগাঁয়েও দোতলা-তিনতলা ভিতের।

পূবের তেতলাটা হিরণবাবুদের। তার বাবা সুরেনবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মগজের সূক্ষ্ম খেলায় এই বাড়ী তৈরী। পুরুষ-সিংহ সেই মানুষটা, আহারে, কী সব রোগ-টোগে এখন আক্রান্ত। একেবারে বিছানায়। তো তার ছেলে হিরণ

পঁয়ত্রিশের যুবক, বুদ্ধিতে পাকা বুড়ো, মেজাজে রক্তখেগো বাঘ হতে পারায় বাপের সম্পত্তি রক্ষার কায়দা-কানুন ভাগ্যিস জেনে ফেলেছিলো, নইলে হা ভগবান, সুরেনবাবুর কপালে কি যে হতো ভাবাই যায় না।

আর তিন ফার্লং বাঁয়ে চলুন। সামনে এক বিরাট পানাপুকুর। অনেকগুলো জলচর পাখি সেখান থেকে মুখ তুলে সূর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ ভোরের আকাশ লালচে হলেও সূর্য এখনও শুয়ে। এবার একটু পেছন ফিরুন বাবুরা। খড়ো চালের একটা ঘর দেখবেন। তার নড়বড়ে গাছের খুঁটি, উঁই-খাওয়া বাঁশের বেড়া। তাও ভাঙাচোরা, এইসময় ভেতর থেকে একটা গোঙানি শোনা যাবে। গোঙানি ঠিক নয়, হেঁপো বেড়ালের শব্দ জড়ানো একটা চীৎকার—কেডা? জবাবে কোন কথা শোনা না গেলে আবার চীৎকার উঠবে—বলি কেডা ওহানে?

এবার হয়তো উত্তর আসবে—আমি।

—আমি কেডা? বিশাখা?

—হ, হ।

—ভোর হইচে নাকিরে?

—হ। জাগান থাইকো। যাতিচি আমি।

—অ, মরণখাগী, উড়তি যাচ্চেন…

—এ্যাই বুড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যাবে বুড়োর গলা। খুক্ খুক্ কাশবে সে। যন্ত্রণায় শরীর বেঁকে যাবে। ঘন ঘন দম নেবে, ফেলবে। তবে তার ওই কাশি চৌহদ্দীর পাহারাদার, বাইবে কে আসে, যায়, ওই কাশির ওঠা-পড়াতে তা র‍্যাডারের মতো ধরা পড়ে যাবে।

একটা ভাত টিপে-টুপে যেমন হাঁড়ির খবর জানা যায়, এই পরিবারটাকে লক্ষ্য করলে হয়তো এ গাঁয়েব রক্তবহা ধমনীর টান বোঝা যাবে। একটু দাঁড়িয়ে আপনারা বাবু সেই টান লক্ষ্য করুন না।

কাশির মধ্যেও চমকে ওঠে জগৎ দাস, মানে বিশাখার বাপ্। এ গলা তার চেনা। হুবহু তার বুড়ির মতো। ও মারা যাবার পর এখন এই গলা ব্যবহার করছে বিশাখা। তেজী, ধারালো, একগুঁয়ে গলা। ভাবতেই অতীত রোমন্থনজনিত বুড়োর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে এক দিন ছিল তার।

আসলে কি জানেন বাবুরা, জগৎ দাসের পেছনে এক পোষমানার ইতিহাস আছে। পেটের দায়ে যদিও জমি-জিরেত হারিয়েছে সে, যদিও ঋণের দায়ে তার চুল পর্যন্ত বিক্রি, কিন্তু সুরেনবাবুদের অকৃত্রিম দয়ায় বাগানের কাজটি

হাতছাড়া হয়নি তার। বাগাল মানে জগৎ দাস মূলতঃ চাকর বনে গিয়েছিল। টাকার বিনিময়ে নয়, বাপ্-বেটির খোরপোষের পরিবর্তে বাবুদের জোতজমিতে কাজ করতো সে।

'অপারেশন বর্গা' অর্থাৎ জমি চাষের যে ফসল পাবে সে কথাটা আজকাল খুব চালু। গ্রামে গ্রামে এই নতুন শব্দটি ছাড়িয়ে গেলে চাষীরা মুচ্‌কি হাসে আর মাথা চুলকায়—হেঃ হেঃ দিন আসতিচে, আসতিচে। বাবুদের চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়।—বেইমানী, এ বেইমানী, হাভাতে ব্যাটাদের…সাতদিনের মাথায় বাবু বলেছিল—পাঁচ বিঘে তোর। আহ্লাদে গলে গিয়ে জগতের তো মুখে কথা ছিল না, শুধু গালের কষ বেয়ে নাল গড়াচ্ছিলো টস্ টস্।

গা-গতর শেষ করে বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখিয়েছিল সে। পুরুষ্ট ধানে ভরাভর্তি মাঠ দেখে সবাই বলছিল—হ্যাঁ, চাষ করতি জানে বটে জগৎ। কিন্তু সেই ধান ঘরে তুলতে পারেনি সে। মাট থেকেই চুরি হয়ে গিয়েছিল। শুনে সুরেনবাবুর সে কী রাগ,—বিশ্বাস ভেঙে দিলি রে জগৎ, বিশ্বাসঘাতকতা করলি ?

জগৎ কিন্তু নিরুত্তর। আসলে বুঝতেই পারছিলো না সে, হাসেব না কাঁদবে ? বাবুর পায়ে আছ্‌ড়ে পড়ে লুটোপুটি খাবে, না লাঙ্‌লের ফাল্ মাথায় বসিয়ে দিয়ে জেলে যাবে ? অবশ্য কিছুই করতে হয়নি তাকে। পরের বছরই জগৎকে ছেড়ে দিয়েছিলো সুরেনবাবুরা। ঋণমুক্ত সে। তারপর বাগাল তো নয়ই মুনিষও করে রাখেনি তাকে। কি থেকে কি হয়, বিশ্বাস কি ?

ক্রমশঃ শরীর ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে জগৎ পঙ্গু, অথর্ব হয়ে যায়। ঘরের নড়বড়ে খুঁটির মতো এখন যেন মাথার চালা ধরে থাকে সে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি সামলায়, রোদ সামলায়, কিন্তু ঝড়-তুফান ঠেকাতে পারে না একদম।

তা ঠেকায় বিশাখা নিজে। সে বাতাসে গন্ধ শোঁকে। কান খাড়া রাখে। তেমন কোন শব্দ পেলে নড়েচড়ে বসে। তৈরী হয়। কোনদিন নির্মল মুদি আসে। লোকটা, বাবুরা একটু চোখ খরখরে করুন, মুদির দোকানের সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটো ব্যবসা সুদে টাকা খাটানো ও শহরে মেয়ে চালান দেওয়া, তলে তলে চালু রেখেছে বলে একটা কানাঘুষা শোনা যায়। ফলে বিশাখা সজাগ থাকে।

ঠারে-ঠারে নির্মল অনেক কথা বলে। বিশাখার দুঃখে গলে যায়। এবং শেষমেশ এমন বাঁচার কোন অর্থ হয় না বলে ওকে সাহসী হতে উপদেশ দেয়। বিশাখা নতমুখে হাতের চুড়ি নাড়াচাড়ার বিচিত্র শব্দ শোনানো ছাড়া আর কিছুই শোনাতে পারে না ওকে। ফলে বিরস মুখে তখনকার মতো ফিরে চলে যায় নির্মল।

আরেকজন হল রিক্সাওয়ালা রতন ছোকরা, ওপর-মাস্তান, বদ্ মেজাজী। কথায় কথায় বোমা ফাটায়। কি সব য়ুনিয়ন-টুনিয়নও নাকি করে। রিক্সা মালিকদের সঙ্গে সবসময় ঝগড়া-ঝাগড়ি, মারামারিতে মেতে থাকে সে। অথচ সময় পেলেই এই ভাঙ্গাচোরা বাড়ীটার চাদ্দিকে কেন যে ঘুর ঘুর করে বিশাখা বুঝেও না-বোঝা থাকে। শব্দ করে হাসের মতন, শিস দেয়। তার মধ্যে এক গভীর কান্না দেখতে পায়। এবং একটা উপোসী মনও। গেঁয়ো, গেঁয়ো, এইসব গেঁয়ো তামসা। বাবুরা তো জানেন, শহরে এইসব দারুণভাবে হাস্যকর।

ক'দিন ধরে কী বরাত, হিরণবাবুও নাকি আসা যাওয়া করছে এই বাড়ীতে। জগৎ দাস-বিশাখার খোঁজ-খবর নিচ্ছে। তার দু'চোখে উদাস ব্যথা। ঠোঁটের ডগায় বিষণ্ণ গানের কলি। পায়ের খচ্ মচ্ খচ্ মচ্ শব্দ ঘুরে বেড়ায় চাদ্দিকে, সেই শব্দের একেক বার একেক অর্থ। যাবার সময়, হৃদয় দেখুন বাবুরা, দয়ার খেলা দেখুন, একগোছা টাকা বের করে জগৎ-এর হাতে দিতে গেলে বিশাখা মেয়েটা বরফ-ঠাণ্ডা গলায় প্রতিবাদ জানায়,—না বাবু, খালি খালি টাকা দিতিচেন কেন? ফিরায়ি নিয়ি যান।

হিরণবাবু বাধ্যতঃ দুঃখের হাসি চিবিয়ে ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। ভারী স্বরে বলে—তাহলে আমাদের বাড়ীতে কাজ কর না তুই। শাক-পাত বেচে কি পাস্ বল তো? উত্তরে বিশাখা এত মিষ্টি মোলায়েম হেসে ওঠে যে হিরণবাবুর ভেতরটা খাঁ-খাঁ মাঠের মতো শূন্য হয়ে যায়।

—কি দরকার বাবু, এতে খারাপ চলতিচে কিসি?

ভাবাই যায় না, যে মেয়েটার শরীর এত টগবগে, সে এত টাণ্ডা-ভিজে গলা পেল কি করে? বিশাখার চোখে শুধু সরল শালুক ভাসে, নালফুল ফোটে। না-বুঝ দৃষ্টি নিয়ে বর্ণচোরা পাখিদের রঙ্ পাল্টানো দেখে। এবং সেই সুরু। খচ্‌মচ্ খচ্‌মচ্ একটা শব্দ। প্রায় শুনতে পায় বিশাখা। যেন পায়ে পায়ে হাঁটে। তার ভেতরে ঢুকে পড়ে।

বিশাখা ভাঙাচোরা বাঁশের দরজাটা টেনে দিতেই ক্যাচোর কোচ্ শব্দ ওঠে। ভেতরে বুড়োর গোঙানি বাড়ে। —কপাল, কপাল মারতিচে কপাল, সাথে সাথে খুক খুক কাশি ওঠে। কথা শেষ হয় না তার।

বাইরে এসে দাঁড়ায় বিশাখা। চাদ্দিকে তাকায়! তার মাথার ওপর ভোরের সূর্য পাঁশুটে। রাতজাগা ক্লান্ত মানুষের মতো ঢিলেঢালা, আলসে। চাদ্দিক আবার দেখে নিয়ে সব্‌জির ঝুড়ি মাথায় তুলে নেয় সে। হাঁটতে থাকে।

বাণীপুরের মোড়ে আসতেই হঠাৎ একটা ছায়া, ছায়া নয়, মানুষ যেন, বাঁ থেকে ডাইনে সরে যায়। চমকে ওঠে বিশাখা। না, কিছু দেখা যায় না। মনের ভুল বুঝি। পাশের গাছ থেকে কি এক আহ্লাদী পাখি ডেকে ওঠে—চিড়িক্, চিড়িক্। এবং তারপর আবার সেই খচ্‌মচ্ শব্দ।

এইসব শব্দ আজকাল তার চেনা। অর্থও তার জানা। বাইশের বিশাখা তো আজ নয়, ক'বছর ধরেই নানা শব্দ শুনে আসছে। শব্দের অর্থ বুঝে আসছে। তো বাবুরা বুঝুন, যুবতী বিশাখার হরেক বিপদ। তার গুড়গুড় করে ওঠে বুক। ভেতরে একটা ভয় ঢুকে যায়। নিজেকে অসহায় মনে হয়। জোরে জোরে পা চালায় সে।

চৌমাথায় রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডে রতন গাড়ী নিয়ে বসে। মুখটা তার ডাইনে কাৎ করা। বিশাখাকে দেখে নড়েচড়ে বসে রতন। ঠোঁটে শিস্ তোলার মতো অদ্ভুত শব্দ করে। —গুণ্ডা, গুণ্ডা, মনে মনে বিড় বিড় করে, হেসে ফেলে বিশাখা। সত্যি বলতে কি এখন তার সাহস ফিরে এসেছে।

হাঁটার ভঙ্গি দামী করতে গিয়ে তার শরীরে নদীর ঢেউ ওঠে, পড়ে। কোমর ভেঙেচুরে হাঁটতে থাকে। বুকের কাপড়ে অযথা হাত উঠে আসে। বাতাসে গলা ছেড়ে রতন তখনই চেঁচিয়ে ওঠে—ইষ্টিশন যাতি হবে নাকি কারো?—আহা, পা দু'টো কমতি কিসির? নীচুগলায় বলতেই রতন রিক্সা নিয়ে আরো কাছে আসে। —চেঁচাতি হবে নাকি? লোক জড়ো করতি হবে?

বিশাখার এই রাগ, বাবুরা বুঝে নিন, নকল এবং গাঁইয়া। বলতে পারেন চুলবুল উস্কানিমূলক। তবু দাঁড়িয়ে থাকে রতন। মুখ বেঁকিয়ে বলে—অ, দেমাক হতিচে, আচ্ছা দেখতি চাই আরো! বিশাখাও মিনমিন করে—গুণ্ডামি চইলবে না বলি দেলাম।

ষ্টেশন বাজারে সব্‌জির ঝুড়ি নামাতেই হঠাৎ চমকে ওঠে বিশাখা। আবার সেই হিরণবাবু। তার সামনে খচ্‌মচ্ শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবুর মুখে অভয় হাসি। ঘুরে তাকায় বিশাখা। দেখন-হাসি হাসে। কথা বলে না। —কি এনেছিস্ আজ? তবুও তাকিয়ে থাকে বিশাখা। উত্তর দেয় না।

হিরণবাবুর পরণে বেলবটস্, ফুলছাপ হাফ শার্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট। ঠোঁটে সিগারেট নাচাতে নাচাতে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। দু'চোখে টলটল খুশি। খুশি না লোভ? লোভ না খিদে? ঠিক বোঝা যায় না।

—সব্‌জি আনিচি।

—কি সব্‌জি? কাঁচকলা? কি দর রে?

—জোড়া চল্লিশ।

—ঠিক আছে, সব দিয়ে দে।

—সব দিতি পাইরবো না।

—কেন ?

অন্য খদ্দেরকে দিতি হবে না ?

—রাখ তো, আমি ছাড়া তোর খদ্দের নেই।

হঠাৎ রুখে ওঠে বিশাখা। তার দু'চোখ লাল হয়, জ্বালা করে। শরীরে ধিকি ধিকি রাগ জ্বলে। কাঁপা শক্ত গলায় চেঁচিয়ে বলে,—না, বেচ্‌পো না আমি। কি পাইয়েছ বাবু ? কি বলতি চাও ? মাইয়ে মানুষ পাইচো বলে……

লোক জড়ো হয়ে যায় চাদ্দিকে। ওদের কথাবার্তা উচ্চগ্রামে উঠবার আগেই হিরণবাবু নিজেকে সামলে নেয়। দাঁতে দাঁত চেপে হাসে। —তাহলে দিস্ না, বলেই পায়ে পায়ে সরে যায়। তার উদ্ধত হাঁটা রাগী। ঘন ঘন সিগারেট টানতে টানতে গিয়ে চোয়াল ওঠে, পড়ে, চৌকোণা হয়ে যায়। —হারামির বাচ্চা, বিড় বিড় করে বিশাখা উঠে দাঁড়ায়। মনুর মা'র কাছে ঝুড়িটা রেখে কি সব নির্দেশ দিয়ে চলে যায়।

রিক্‌সা ষ্ট্যাণ্ডে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। এদিক-ওদিক তাকায়। কোথাও সে নেই। আজ খেপেছে ছোক্‌রা। পাগলা, পাগলা। বিশাখা ভেতরে হাসে। পাগলামি ছুটিয়ে দিতি হবে। গাছতলায় জগা, নিতাই, বাবলুরা রিক্‌সায় বসে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় বিশাখা। ওদের সঙ্গে কি সব দরকারী কথা সেরে নেয়।

রোদ যদিও ঠাণ্ডা-মিঠে, এখন বিশাখার মেজাজ নেই। তার পেটে খিদে, নাড়ি-ভুঁড়ি ছোবলাচ্ছে। পেছনে সেই খচ্‌মচ্‌ শব্দ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তার শরীরটা এখন ভয়ের, যন্ত্রণার, জ্বালার।

গাঁয়ের যুবতী শরীরে, জানেন বাবুরা, একটা বিশেষ গন্ধ থাকে। বাতাসে তা নেশা ধরায়। বিশেষ নাকে তা ধরা পড়লে শরীর কাঁপায়। বিপরীতে যুবতী-নাক, কান, চোখেও সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশাখার মধ্যেও, বিশ্বাস করুন বাবুরা, এখন সেই প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে।

রাত গভীর হয়। বুড়ো জগৎ দাসের খুক খুক কাশি বাড়তেই থাকে। তার গলায় হেঁপো বেড়ালের গোঙানি চৌহদ্দী পাহারা দেয়। হঠাৎ একেকবার কিসের যেন শব্দ হয়, একেকবার চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ো,—কেডা, কেডা ওহানে ? কোন উত্তর ফিরে আসে না কিছুতেই।

তার সেই খুক খুক কাশি ও গোঙানি ছাপিয়ে আচমকা আরেকটা তীব্র তীক্ষ্ণ

শব্দ—কেডা, কেডা, চীৎকারে বাতাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে চাদ্দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকলে কান খাড়া করে রাখে জগৎ দাস। তার গোঙানি চাপা পড়ে গিয়ে আরেকটা শ্বাসরুদ্ধকর গোঙানি যেন স্পষ্টতর হতে-থাকে। কে, বিশাখা না?

—বিশাখা, অ বিশাখা······

উত্তরে কোন কথা নয়, শুধু ঝট্‌ফট্‌ ঝট্‌ফট্‌ শব্দ। ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দ। বিকৃত গলায় আর্তনাদের শব্দ ক্রমান্বয়ে শুনতে পায় বুড়ো।—সুবিধের মনে হতিচে না তো······

এবার দু'হাত শূন্যে তুলে খাড়া হতে যায় বুড়ো। পারে না। তার বাড়ীর চাদ্দিকে ফটাফট শব্দ। বুক কাঁপানো আওয়াজ ওঠে। ভয়ে বসে পড়ে জগৎ দাস। কিসের একটা উগ্র গন্ধ, অনেকটা পোড়া গন্ধকের মতো নাকে এসে লাগে। সেই উগ্র গন্ধ নিয়ে স্থির অনড় বসে থাকে সে। তার সামনে এখন সৃষ্টি বা ধ্বংসের উল্লাস। বহুগলা মেশানো চীৎকার।—হারামির বাচ্চা, হারামির বাচ্চাডা, আমাদের সব নিতি চায়। সব কাইড়ে নিতি চায়। ছাড়ি দিবি না শালাকে।

এ গলা কার? রতনের না অন্য কারো? ঠিক ঠিক বোঝা যায় না।

অথচ দেখবেন বাবুরা, এদেশের ঝানু ব্যবসায়ীরা এমন এক ঘটনাকে লুফে নিয়ে কেমন রমরমা খবর বানাবে। সমাজবিরোধীর হাতে নিপাট ভদ্রলোক আক্রান্ত, বা মারকুটে পার্টির হাতে সমাজ সেবকের নাজেহাল হবার গপ্‌পো এত সুন্দর শিল্পসম্মতভাবে সৃষ্টি হবে যে, হলপ করে বলতে পারি বাবু, আপনারা ভাববেন দেশটার হলো কি? জগৎ দাসেরাও বিড় বিড় করবে,—সত্যি দ্যাশডার হতিচে কি? অথচ আপনাদের স্ত্রী-কন্যারা ঠিক এইভাবে আক্রান্ত হলে তাদের ফেলে থানায় ছুটবেন কিনা, তা আপনারাও হলপ করে বলতে পারবেন না বাবু।

বাসমোতিয়া

বিমল মিত্র

জীবনে এমন-এমন জায়গায় গিয়েছি আর এমন-এমন সব লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এখন এই বয়েসে পৌঁছে তা ভাবতে বেশ ভালো লাগে। মানুষের স্বভাবই বুঝি এই রকম। অতীতকে রোমন্থন করার একটা বয়েস আছে। আমি আজ সেই বয়েসে এসে ঠেকে গিয়েছি। সামনের ভবিষ্যৎটা মাপে ছোট হয়ে আসছে। আর অতীতের দৈর্ঘ্যটা ক্রমেই মাপে বাড়ছে।

রোমন্থন করবার মতন মনের অবস্থাটা ঠিক এই বয়েসেই ঘটে।

আগে কত জায়গায় ঘুরেছি। বুকে তখন সাহস ছিল, মনে ছিল তেজ। সেই তেজের তাগিদে ধরাকে তখন সরা জ্ঞান করেছি। ভেবেছি চিরকালটাই এমনি চলবে। দু-পায়ের অফুরন্ত গতি দিয়ে আমি বিশ্ব-ভুবন চষে বেড়াবো।

লোকে আমাকে নিরাশ করেছে, নিরুৎসাহ দিয়েছে। সত্যিই, ভেবে দেখছি আমাকে নিরুদ্যম করবার লোকের কখনও অভাব হয়নি।

আমাদের বন্ধুস্থানীয় যারা তারা বলেছে—এত ঘুরে বেড়াও কেন?

আমি বলেছি—আমি কি আর ঘুরি? কেউ যেন আমাকে ঘোরায়—নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—

তারা মন্তব্য করেছে—তোমার বোধহয় লগ্নে রাহু। লগ্নে রাহু থাকলে মানুষ এমনি ঘুরতে ঘুরতেই একদিন ফুরিয়ে যায়—

আজ সত্যিই আমিও তাই ফুরিয়ে গিয়েছি। তা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছি বটে, কিন্তু মনে? মনে মনে তো এখনও ঘুরি। এখনও দেখতে পাই আসামের শিলং থেকে একটা ছেলে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে চেরাপুঞ্জির দিকে। সঙ্গে কিছু নেই, কেউ নেই। মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে সে একান্ত নিজের গরজে। চেরাপুঞ্জি গিয়ে হাতি-ঘোড়া কী যে সে পাবে তার ঠিক নেই। শুধু পথ চলতেই তার আনন্দ।

এই পথ চলার আনন্দই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। এই সম্বলটুকু নিয়েই আমি এই দীর্ঘ জীবনটা পরিক্রমা করে এত দূরে চলে এলাম।

এমনি করে কখনও ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে দণ্ডকারণ্য, কখনও বোম্বাই থেকে

লোনাভালা, আবার কখনও চাইবাসা থেকে রাঁচি পর্যন্ত হেটে হেটে পথ পরিক্রমা করে আনন্দের সম্বল সঞ্চয় করেছি। তাতে কখনও আনন্দ পেয়েছি, কখনও বেদনা, আবার কখনও বা বিস্ময়। এই কাহিনী নানা বইতে, লিখে মনটাকে তার মধ্যে উজাড় করে দিয়েছি।

কিন্তু এই বাস্‌মোতিয়ার কথা কোথাও লিখতে পারিনি। লিখতে না-পারার কারণ আমার অক্ষমতা।

প্রেমের গল্প তো অনেকেই লেখে। আমিও লিখেছি। অলৌকিক কাহিনীরও অভাব নেই বাংলা সাহিত্যে, তাছাড়া বিরহ-বেদনার গল্প হাসির গল্প রোমাঞ্চকর গল্প, তারও কিছু অভাব আছে আমাদের সহিত্যের মধ্যে?

কিন্তু বিশ্বাসের গল্প?

বিশ্বাস মনে অবিচল নির্ভরতা। সেই রকম বিশ্বাসের কাহিনী কখনও পড়েছি বলে কই তো আমার মনে পড়ে না।

বাস্‌মোতিয়া বলেছিল—আমি হুজুরের সেবার জন্যে সব করবো, কাপড় ধোলাই করবো, খানা পাকিয়ে দেব, তেল মালিশ করে দেব, বর্তন মেজে দেব, আউর হুজুর যা যা করতে হুকুম করবেন সব করে দেব—

বাস্‌মোতিয়া নাম শুনলে যেমন চেহারা কল্পনায় উদয় হয় সে-রকম নয় গায়ের রং ফর্সা নয়, কুড়ি বছর বয়েস নয়, কুমারী নয় এমন কি সধবা যুবতীও নয়। আসলে বাস্‌মোতিয়া একজন বুড়ি ছত্রিশগড়ী বিধবা। বয়সে বোধহয় পঞ্চাশ কি ষাট। মাথায় চুলগুলো সব পাটের নুড়ির মত ধোঁয়াটে। মুখের চামড়া কুঁচকে কুঁকড়ে লক্ষ লক্ষ দাগের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দাঁতগুলো সমস্ত মজবুত।

অমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—তুমি কত টাকা নেবে?

বাস্‌মোতিয়া বলেছিল—দশ রুপাইয়া—

আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—তুমি সব রান্না-টান্না করতে পারবে তো?

হ্যাঁ হুজুর, আমি রান্না ভি করবো, আবার দুকান থেকে সওদা ভি করে আনবো—

আমি তার কথায় খুশীই হয়েছিলাম। মাত্র দশ টাকায় সে কী করে চালাবে তাই ভেবেই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বাস্‌মোতিয়া তখন দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি বলেছিলাম—কী হলো? দাঁড়িয়ে আছো কেন? আর কিছু বলবে?

বাস্‌মোতিয়া বলেছিল—হুজুর, আউর একঠো বাত—

—কী কথা বলবে, বলো?

বাস্‌মোতিয়া বললে—আমাকে বিকেলবেলা আধা-ঘণ্টার ছুটি দিতে হবে—

—ছুটি ? ছুটি নিয়ে তুমি কী করবে ?

বাস্‌মোতিয়া বললে—ছুটি নিয়ে আমি বাড়ি যাবো একবার। আমার ছেলের জন্যে আমি ভাত নিয়ে যাবো।

—তোমার ছেলে ?

বাস্‌মোতিয়া বললে—হ্যাঁ হুজুর, আমার লেড়কা—

আমি অবাক হয়ে গেলাম বাস্‌মোতিয়ার কথা শুনে। দশ টাকা মাইনে। তার ওপর নিজে খাবে, আবার ছেলের জন্যে বিকেলবেলা ভাত-তরকারি নিয়ে যাবে। সুতরাং খরচ পড়বে কম নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ছেলে-মেয়ে কটা ?

বাস্‌মোতিয়া বললে—আমার মেয়ে নেই, ওই একই ছেলে আমার—

—বয়েস কত ছেলের ?

—ছাব্বিশ।

ছাব্বিশ বছর ছেলের বয়েস শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ছাব্বিশ বছর বয়সের ছেলের জন্যে ভাত নিয়ে যাবে। বাস্‌মোতিয়ার ছেলে কি তবে বেকার ? কিছু কাজ-কর্ম করে না ? মায়ের ঘাড়ে বসে বসে খায় ?

—বিয়ে দাও নি তোমার ছেলের ?

বাস্‌মোতিয়া বললে—না হুজুর, ছেলের আমার সাদি হয়নি—

ভাবলাম ঠিক আছে। আমার কাজকর্ম যখন সমস্তই করে দেবে বাস্‌মোতিয়া তখন না-হয় ছেলের এক বেলার ভাত নিয়ে গেলই। তাতে আমার কী আর এমন বেশি খরচ পড়বে। মাইনে তো তেমনি নিচ্ছে মাত্র দশ টাকা।

বললাম—তা বেশ, তাই-ই ঠিক রইল—

আমার কাছে সম্মতি নিয়ে বাস্‌মোতিয়া তখন থেকেই আমার কাজে লেগে গেল।

জায়গাটা হলো চিত্রকূট। চিত্রকূট পাহাড়।

সে এমন জায়গা যেখানে কালেভদ্রে কখনও ট্যুরিস্ট যায়। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর স্টেশনে নেমে বাসে করে যেতে হবে জগদলপুর পর্যন্ত। জগদলপুর আগে একটা নেটিভ স্টেট ছিল। রায়পুর থেকে জগদলপুরের দূরত্ব হলো একশো আশি মাইল।

এই একশো মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে গেলে আপনাকে যেতে হবে বাসের সাহায্যে।

তা বাসগুলো ভালো, স্প্রিং-এর গদি আঁটা বসবার জায়গা। যেতে কোনও কষ্ট

হবে না আপনারা জগদলপুরে পৌঁছে কিন্তু ভালো হোটেল টোটেল কিছু পাবেন না। যে-হোটেল আছে তাতে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই নেই। অন্তত আমি যখন জগদলপুরে গিয়েছিলাম তখন আমাকে ডাক-বাংলোয় আশ্রয় নিতে হয়েছিল জগদলপুরের রাণী দেববতীর অতিথি হয়ে। তাই কোনও কষ্ট অনুভব করবার দুর্ভোগ সইতে হয়নি।

কিন্তু দুদিন জগদলপুরে থাকবার পরই আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। অতিষ্ঠ হবার কারণ অবশ্য শহরের ধুলো-মলিন আবহাওয়া আর তার সঙ্গে চারদিকের মুখরতা। জনতার কোলাহল আর তার সাথে বাসের হর্ণের গর্জন আমাকে এক যোগে আক্রমণ করে আমার মানসিক স্থিরতার ব্যাঘাত ঘটাল।

অবশ্য শব্দ আমার তত খারাপ লাগে না। সব শব্দই শব্দ নয়। নিজের ছেলের কান্নার শব্দে আমরা বিব্রত বা বিরক্ত হই না, বিরক্ত হই তখনই যখন অন্যের ছেলের কান্নার শব্দে কানে আসে। টমাস কার্লাইল বড় শব্দ-কাতর লোক ছিলেন। তাঁর লেখবার সময় বাড়ির ভেতরে বা বাড়ির বাইরে কোনও শব্দ হলে চলবে না। তাই তিনি এমন এক বাড়ি ভাড়া করেছিলেন যে বাড়ির বাইরের দিকে দুটো করে দেয়াল।

সেই জগদলপুরেই এক ভদ্রলোক আমার দুরবস্থা দেখে পরামর্শ দিলেন আমাকে চিত্রকূটে যেতে। তিনি বললেন যে সেখানে একটা রেস্ট-হাউস আছে। সেটার ভাড়াও অল্প আর টাকা দিলে রান্না করার লোকও পাওয়া যায়। সেই রেস্ট-হাউসের সামনেই ইন্দ্রাবতী নদীর একটা জল-প্রপাত আছে। প্রায় দশতলা বাড়ির মত উঁচু থেকে জলটা নিচের ইন্দ্রাবতী নদীতে পড়ছে। সে-দৃশ্য নাকি খুবই মনোরম। বহু ট্যুরিস্ট নাকি সেখানে জল-প্রপাত দেখতে যায়। তারা সকাল বেলা যায় আর বিকেল বেলাই আবার জগদলপুরে ফিরে আসে। সেখানে গিয়ে ছেলেরা পিক্‌নিক বা চড়ুইভাতি করে। আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার জন্যে কেউ-কেউ বা রেস্ট-হাউসে গিয়ে বিশ্রাম করে নেয়।

এই হলো আমার চিত্রকূটে যাওয়ার কারণ-সূত্র।

তা আমি তো বাসমোতিয়াকে আমার কাজ-কর্মের জন্য নিয়োগ করেছিলাম। আমি তাকে সকাল বেলাই বাজারের টাকা দিয়ে দিতাম। আর তারপর সে কখন রান্না করতো কী রান্না করতো তার খবর রাখবার আর প্রয়োজন বোধ করতাম না। প্রতিদিন সে কাজ-কর্ম সেরে বিকেল চারটের সময় আমার কাছে আসতো। আর বলতো—আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি হুঁজুর—

আমি বলতাম—কখন ফিরবে?

সে বলতো—আধ ঘণ্টা পরেই ফিরে আসবো হুঁজুর। ছেলের ভাতটা পৌঁছে দিয়ে তাকে খাইয়েই ফিরে আসবো—

আমি বলতাম—যাও, তবে ফিরতে বেশি দেরি কোর না—

বাসমোতিয়া বলতো—না হুজুর, আমি যাবো আর আসবো—

আমি দেখতাম সে একটা শালপাতায় মোড়া পুঁটলিতে করে ভাত-তরকারি নিয়ে যাচ্ছে। সে যা রান্না করে তা আমি পেট ভরেই খাই। বাসমোতিয়ার রান্নাটাও খারাপ নয়। তরকারিতে ঝাল দিতে বারণ করেছিলাম বলে সে ঝাল দিত না। কিন্তু নিজের আর ছেলের তরকারি রান্না করতো ঝাল দিয়ে আলাদা করে। তা করুক তাতে আমার কোনও আপত্তি করবার কারণ ছিল না, হাজার হোক, নিজের ছেলে তো।

বাসমোতিয়া বলতো—আমার ছেলে হুঁজুর, ঝাল না দিলে খেতে পারে না—

আমি বলতাম—তা খাক না—যার যা স্বভাব, সে তাই খাবে—

বাসমেতিয়া যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলতো ততক্ষণ কেবল তার ছেলের কথাই বলতো। ছেলের কী রকম স্বভাব-চরিত্র, ছেলে তার মাকে কী রকম ভালবাসে, ছেলে কী কথা বলে, এই সব কথা ছাড়া বাসমোতিয়ার মুখে আর কোনও কথা ছিল না।

আমি সকাল বেলা ইন্দ্রাবতী নদীর ধার দিয়ে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে আসতাম। এসে দেখতাম আমার চা-জলখাবার তৈরি। আমাকে চা দিয়ে সে নিজেও চা খেয়ে নিত।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—তোমার ছেলের নাম কী রেখেছ বাসমোতিয়া?

বাসমোতিয়ার মুখে হাসি বেরোত ছেলের প্রসঙ্গ শুনে।

সে বলতো—ছেদিলাল। ছেদিলাল রাউত—

তাকে খুশী করবার জন্যে বললাম—বাঃ খুব ভালো নাম রেখেছ তো তোমার ছেলের।

বাসমেতিয়া বলতো—আপনার খুব ভালো লেগছে নামটা হুঁজুর—

আমি বলতাম—হ্যাঁ, ছেদিলাল নামট আমার খুব ভালে লেগেছে—

বাসমোতিয়া ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বলতো—ছেদিলালের বাপ এই নামটা রেখেছিল হুঁজুর আমি রাখিনি—

ছেদিলালের বাপ হুঁজুর বেঁচে নেই, মরে গেছে। ছেদিলালের জন্ম হবার পরেই ওর বাপ মদ খেয়ে পেট ফুলে মারা গেছে—

আমি জিজ্ঞেস করতাম—খুব মদ খেত নাকি তোমার মরদ?

হ্যাঁ হুজুর, খুব মদ খেতো। আমি যত টাকা দাই-গিরি করে উপায় করতাম আমার মরদ সেই সব টাকা কেবল মদে আর মেয়েমানুষে উড়িয়ে দিত। মদ বড় খতরনাক জিনিস হুঁজুর।

এই সব গল্পই করতো বাসমেতিয়া সারাদিন। যতক্ষণ আমার কাছে থাকতো ততক্ষণ তার মুখে কেবল নিজের কথা নিজের মরদের কথা আর নিজের ছেলে ছেদিলালের কথা। অন্য কোনও কথা তার মুখে ছিল না।

আর ঠিক বিকেল চারটের সময় আমার কাছে এসে বলতো—চারটে বাজলো হুঁজুর, এবার আসি—

হাতে তখন তার সেই শালপাতায় মোড়া ছেদিলালের ভাত-তরকারি একটা ময়লা গামছায় বাঁধা পুঁটলি। আর ঠিক সাড়ে চারটের পর ছেদিলালকে ভাত তরকারি দিয়ে আবার ফিরে আসতো। আর রাত্রের খাবার রান্না করতে বসতো।

আমি অবশ্য তখন বিশ্রাম করতেই গিয়েছিলাম সেখানে। কাজ-কর্মের মধ্যে শুধু বই পড়া আর সকালে সন্ধ্যেয় ইন্দ্রাবতী নদীর ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো।

রেস্ট হাউসটার কেয়ার-টেকার বলতে যা বোঝায় সে-ভদ্রলোকের নাম ছিল ধন্যকুমার। ধন্যকুমারজীই বলতে গেলে বাসমোতিয়াকে জোগাড় করে দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না স্যাব, এই বাসমেতিয়াকে দিচ্ছি এ আপনাব খানা-টানা সব পাকিয়ে দেবে ঘব ঝাঁট দিযে দেবে, গেঞ্জি রুমাল টুমাল সব সাবান কেচে সাফ করে দেবে। তাছাড়া আর একটা গুণ আছে এর, এ খুব বিশ্বাসী, চোর-ছ্যাচোড় নয়—

মোটামুটি দিনগুলো খুব আরামেই কাটছিল আমাব। রেস্ট হাউসটার সামনেই বিরাট চওড়া নদীটা পূর্ব দিক থেকে এসে উত্তর দিকে চলে গেছে। তারপরে বেঁকতে বেঁকতে কোথায় কোন দিকে চলে গেছে তা জানি না। আর ঠিক উত্তর দিক থেকে আর একটা চওড়া জলের স্রোত জল-প্রপাত হয়ে নিচের নদীগর্ভে বিপুল শব্দে ঝরে পড়ছে। সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারব এমন ক্ষমতা আমার কলমে নেই। যেখানে জলটা পড়ছে সেখানে জলের কণিকাগুলো একটা স্থায়ী কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি করে স্থায়ীভাবে ঝাপসা করে রেখেছে। মোটকথা কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে শুধু জল আর জল, আর কিছু নেই। যেখানে একটু কম জল ট্যুরিস্টরা সেখানে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সমস্ত আবহাওয়ার ভয়াবহ সৌন্দর্যটা উপভোগ করে আর তারপর গাড়ি চালিয়ে আবার সোজা জগদলপুরের দিকে চলে যায়। আর ট্যুরিস্টরা চলে গেলেই চা-পান সিগারেটের দোকানদাররা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে কোথায় চলে যায়। তখন সমস্ত জায়গাটা জলের কলশব্দে আরো মুখর হয়ে ওঠে।

যত রাত বাড়ে তত মনে হয় যেন জানালার পাশেই জলপ্রপাতটা এগিয়ে এসে সমস্ত রেস্ট-হাউসটা তার তোড়ে ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে অতলে চলে যাবে।

বাসমোতিয়া এসে বলে—হুঁজুর খানা দেব ?

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি কখন রাত নটা বেজে গেছে টের পাইনি। বই পড়তে পড়তে সময়ের কোনও হিসেব ছিল না আমার।

বললাম—দাও খানা দাও—

বাসমোতিয়া খাবার দিয়ে জিজ্ঞেস করে—সকাল বেলায় দহি-বড়াটা কেমন লেগেছিল হুঁজুর—?

আমি বলি—ভালোই তো—

বাসমোতিয়া বলে—ছেদিলাল খুব দহি-বড়া খেতে ভালোবাসে হুঁজুর। আজ তার খুব ভালো লেগেছে খেতে—

তারপর একটু থেমে বলে—ছেদিলালকে আপনার কাছে একদিন নিয়ে আসবো। হুঁজুব—আপনি আশীর্বাদ করবেন—

আমি বলি—তা নিয়ে এসো না। দেখবো কেমন ছেলে তোমার—

বাসমোতিয়া বলে—বড় লাজুক বেটা আমার ছেদিলাল হুজুর। আমি অনেক বলেছি তাকে আপনার কাছে আসতে, কিন্তু লজ্জায় আসতে পারে না সে—

—কেন ? লজ্জা কীসের জন্যে ?

—ওই বলে কে হুজুর। মরদ-মানুষের অত লজ্জা কি ভালো আপনিই বলুন ? আমি তো তাই তাকে বলি তুই মরদ আছিস অত লজ্জা কেন তোর ?

আমি বলি—সত্যিই তো পুরুষ মানুষের অত লজ্জা ভলো নয়। তা কত বয়েস হলো তোমার ছেদিলালের ?

বাসমোতিয়া—এই মাসে ছাব্বিশ সাল হলো হুঁজুর—

আমি বলতাম—ছেলের বিয়ে দিয়েছ তুমি ?

বাসমোতিয়া বললো—না হুঁজুর ছেলে আমার বিয়ে করতে নারাজ—

—কেন ?

—হুঁজুর মন-পসন্দ লেড়কী যে পাচ্ছি না।

আমি বলতাম—না না আর বেশি দেরি কোর না ছাব্বিশ বছর বয়েস হলো, এখন তার বিয়ে দেওয়া উচিত—

বাসমোতিয়া বলতো—আমার হাতে এখন তত টাকা নেই হুঁজুর। বাজিতে পরের বেটি বউ করে আনতে গেলে আমদের জাতের অনেক টাকা লাগে—

আমি বলতাম—তুমি তো বিকেল বেলা ছেলের জন্যে ভাত নিয়ে যাও তা সকাল বেলা সে কী খায় ?

বাসমোতিয়া বলতো—সকাল বেলা মালিকের বাড়িতে খায়—

—মালিক কে ?

মালিক হুঁজুর আমাদের ঠাকুর সাহেব। ছেদিলাল সেই ভোর রাত্তিরে ঠাকুর সাহেবের বাড়ি কাজ করতে যায়, সকাল বেলা সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে। তারপর বিকেল চারটের সময় বাড়ি ফিরে আসে। তখন আমি তাকে রাত্তিরের খানা দিয়ে আসি—

বাসমোতিয়া আমাকে খেতে দিয়ে এইসব গল্প করে। আর আমি খেতে খেতে তার ছেদিলালের কথা শুনি। কথা শেষ করবার আগে সে বলতো—আমি তাকে একদিন আপনাব কাছে নিয়ে আসবো হুঁজুর আপনি তাকে মেহেরবানি করে আশীর্বাদ করবেন—

মায়েব প্রাণ। ছেলের জন্যে মায়ের যে দরদ তা সর্বজনীন। সে-দরদে জাতি-ভেদ দেশ-ভেদ কিছু নেই। সাদা চামড়া নেই কালো চামড়া নেই। সে শাশ্বত সনাতন। তাই ছেলের জন্যে বাসমোতিয়া কতখানি ভাত-তরকারি নিয়ে যাচ্ছে বেশি নিচ্ছে কিনা তা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি। কারণ আমি জানতাম ভাতের দামের কাছে পুত্র-স্নেহ আরো বেশি মূল্যবান।

এমনি করেই আমার চিত্রকূটের বিশ্রামের দিনগুলো খুবই আরামে কাটছিল।

কিন্তু শেষের দিন যে এমন কাণ্ড হবে তা আমি কল্পনা করতেই পারিনি।

তখন আমি ফিরে আসবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। জায়গাটার ওপর আমার তখন বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন সেই গম্ভীর সুন্দরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার অন্তরের আর বাইরের অনির্বচনীয়তাকে প্রত্যক্ষ দেখার অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করতে পারতাম এ তো কম সৌভাগ্যের বিষয় নয় আমার কাছে ? সেই স্পর্শানুভূতি আমাব জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল সেইটেই তো বড কথা।

যা হোক যাবার সময় ক্রমেই ঘনিয়ে এল। শেষবারের মত ইন্দ্রাবতীকে দেখবার জন্যে আর একবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তারপর আস্তে আস্তে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেলাম। ইন্দ্রাবতী যেখানে পূর্ব দিকে বেঁকে উত্তরের দিকে প্রবহমান হয়েছে সেইদিকে পা দুটোকে প্রসারিত করে দিয়ে যেন ইন্দ্রাবতীর ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করলাম। মনে মনে বলতে লাগলাম—ইন্দ্রাবতী, তুমি আমাকে নবজন্ম দিলে তোমাকে আমি প্রণাম করি। নিজের অহঙ্কারকে নিজের খ্যাতিকে নিজের

আর্থিক সম্পত্তিকে একান্ত সম্পদ বলে মনে করে যে-বোঝা সারা জীবন মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছি তুমি তার ভার আজ লাঘব করলে তুমি আমাকে তা থেকে পরিত্রাণ দিলে এর জন্যে তুমি আমার প্রণম্য, তুমি আমার পবিত্রাতা তোমার সামনে আমি আজ আপনাকে নিবেদন করলাম। তুমি আমার ভক্তিনত চিত্তের শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রীতি গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দাও—আমি তোমার অনন্ত সৌন্দর্যের নির্মলতা পবিত্রতার সমুদ্রে অবগাহন করে পরিশুদ্ধ হলাম।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়লো।

নদীর উঁচু পাথরের পাড়ের ওপর দেখলাম কে যেন একজন মানুষ একলা বসে আছে। মনে হলো মানুষটা এই নিরিবিলি ধূ-ধূ প্রকৃতির নিঃসঙ্গতায় একলা বসে বসে কী করছে! পায়ে পায়ে আর একটু কাছে যেতেই দেখি মানুষটা আর কেউ নয় বাসমোতিয়া!

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। ওতো একটু আগেই আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ওর ছেলে ছেদিলালের জন্যে শালপাতায় মুড়ে গামছায় বেঁধে ভাত-তরকারি নিয়ে গেছে। তা যদি হয় তাহলে ছেলের কাছে না গিয়ে একলা একলা ইন্দ্রাবতীর ধারে বসে কী করছে? পুঁটলিটা তখনও তার হাতে তেমনি ধরা আছে।

আমি একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আত্মগোপন করে নিঃশব্দে সমস্ত দেখতে লাগলাম। ভাবলাম দেখি বাসমোতিয়া কী করে? বাসমোতিয়ার তখন অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে সেই অতল-গহ্বর ইন্দ্রাবতীর দিকে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই একেবারে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। কেন কাঁদছে, কার জন্যে কাঁদছে বাসমোতিয়া কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে কান্না যেন আর শেষই হতে চায় না। তারপর এক সময়ে তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছতে লাগলো। তার কান্না থামলো। আর তারপর গামছার গেরো খুলে শালপাতার ঠোঙাটা সেই তিনশো ফুট নিচের ইন্দ্রাবতীর জলে ফেলে দিলো। জলের স্রোতের ওপর তার অত যত্নের ছেদিলালের জন্যে রান্না করা ভাত-তরকারি পড়তেই নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল তা আর দেখতে পেলাম না।

যখন তার ভাত-তরকারি ফেলা হয়ে গেল তখন কী যেন বিড় বিড় করে কাকে বলতে লাগলো।

আমার কৌতূহলের চেয়ে রাগটাই বেশি হলো। আমার পয়সায় কেনা ভাত-তরকারিগুলো তা হলে কি এমনি করে নদীতে এসে রোজ ফেলে দিয়ে যায়? তাহলে তার কথাগুলো কি সমস্তই মিথ্যে? আমাকে কি তাহলে এতদিন প্রতারিতই করে এসেছে?

ভাবলাম তখনই গিয়ে বাসমোতিয়াকে হাতে-নাতে ধরে ফেলি। ধরে তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাই। বলি, কেন সে এমন করে তার ছেলের নাম করে আমাকে ঠকিয়ে এসেছে।

কিন্তু অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সংযত করে নিলাম। তারপর যখন দেখলাম যে, বাসমোতিয়া বাড়ী ফিরে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন আমিও তাড়াতাড়ি আড়াল থেকে বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে আমার রেস্ট-হাউসের দিকে পা বাড়ালাম। দেখলাম রেস্ট-হাউসের সামনের লাউঞ্জের ভেতরে কেয়ার-টেকার ধন্যকুমারজী তখন একদল ট্যুরিস্টকে আপ্যায়ণ করতে ব্যস্ত।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম—ধন্যকুমারজী, একবার এদিকে আসুন তো আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে—

ধন্যকুমারজীও অবাক হয়ে আমার সঙ্গে বাইরের বারান্দায় এলেন।

উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার? এমন হাঁপাচ্ছেন কেন? কী হয়েছে?

আমি বললাম—আপনি বলেছিলেন বাসমোতিয়া খুব বিশ্বাসী মানুষ, কিন্তু ও তো একজন চোর—মিথ্যেবাদী, আমাকে বরাবর ঠকিয়ে এসেছে—

ধন্যকুমারজী আরো অবাক হয়ে গেলেন আমার কথা শুনে।

বললেন—আপনাকে ঠকিয়েছে? মিথ্যে কথা বলেছে আপনাকে? কী বলছেন আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

তখন আমি যা দেখে এসেছি ইন্দ্রাবতীর ধারে, সমস্ত সবিস্তারে বললাম। কেমন করে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে ছেলের নাম করে আধ ঘণ্টা করে রোজ ছুটি নিয়েছে, আর কেমন করে ছেলের নাম করে ভাত-তরকারি নিয়ে ইন্দ্রাবতীর জলে ফেলে দিয়েছে—সমস্ত সমস্ত।

সবটা শুনে ধন্যকুমারজী হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন—ও, তাই বলুন, আমি ভাবলাম আপনার টাকা-কড়ি কিছু চুরি করেছে বুঝি। আসলে কী হয়েছে জানেন, ছেদিলাল বলে যার নাম ও করে সে ছেলে তো নেই সে তো মারা গেছে—

আমি আকাশ থেকে পড়লাম ধন্যকুমারজীর কথা শুনে।

বললাম—মারা গেছে মানে?

ধন্যকুমারজী বললেন হ্যাঁ মারা গেছে মানে মারা গেছে। কুড়ি বছর আগে ওই ইন্দ্রাবতীর জলে ডুবে মারা গেছে ওর একমাত্র ছেলে ছেদিলাল—

বললাম—তাহলে যে বাসমোতিয়া বলেছিল ওর ছেলে ছেদিলাল কোন ঠাকুর

সাহেবের বাড়ীতে দিনের বেলা চাকরি করে, তার ছাব্বিশ বছর বয়েস, বড় লাজুক স্বভাব। কতদিন যে বাসমোতিয়া বলেছিল আমার কাছে ছেদিলালকে একদিন নিয়ে আসবে। আর আমি যেন তাকে আশীর্বাদ করি যেন সে সুখী হয়।

ধন্যকুমারজী বললেন — ঠিকই তো বলেছে। যখন ওর ছেলে ডুবে মারা যায় তখন তার ছেলের বয়েস ছিল ছ বছর, এখন বেঁচে থাকলে তো তার ছাব্বিশ বছর বয়েসই হতো —

—কিন্তু সে যে মারা গেছে সে কথা তো বাসমোতিয়া একবারও আমাকে বলেনি।

ধন্যকুমারজী বললেন — ওর ছেদিলাল যে মারা গেছে বাসমোতিয়া তো সে কথা বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা সে এখনও বেঁচে অছে। তাই তো আজ কুড়ি বছর ধরে ও তাকে ভাত-তরকারি খেতে দিয়ে আসে। আর শীত হোক বর্ষা হোক গ্রীষ্মই হোক এই কুড়ি বছর ধরে যে-সময়ে ওর ছেদিলাল মারা গিয়েছিল সেই-কাঁটায় বিকেল সাড়ে চারটের সময় ইন্দ্রাবতীর ধারে সেই জায়গাটায় গিয়ে দশ মিনিটের জন্যে ও কাঁদতে যায়। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশ মিনিটের জন্যে বাসমোতিয়া সেখানে বসে বসে কাঁদবে, তারপর আবার এই রেস্টহাউসে ফিরে এসে কাজ কর্ম করবে। এ ওর কুড়ি বছরের নিয়ম। এ নিয়মের কোনও দিন ব্যতিক্রম হবে না। এ আমি কুড়ি বছর ধরে দেখে আসছি —

হঠাৎ নজরে পড়লো দূরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসমোতিয়া রেস্ট-হাউসের দিকে আসছে। বুড়ো মানুষ বাসমোতিয়া। বয়েসের ভারে ভালভাবে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। কিন্তু তবু যে এই বয়েসেও এত শক্ত সামর্থ্য হয়ে সমস্ত দিন রান্না-বান্না বাজার করা ঘর-ঝাঁট দেওয়া করে চলেছে, এ বোধ করি তার বিশ্বাসের জোরে। সত্যি, বিশ্বাস এমনই এক জিনিস যা মানুষকে শক্তি দেয়, সামর্থ্য দেয়। যা থাকলে মানুষ আর নিজেকে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় নিঃস্ব মনে করে না।

বাসমোতিয়াকে তারপর এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিনি। বা বলবার সাহস হয়নি। সেই দিন সন্ধেবেলাই আমি চিত্রকুট ছেড়ে জগদলপুর চলে এসেছিলাম।

সংক্ষোভ

কৃষ্ণকান্ত মজুমদার

অবনীশের কোলে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে শ্বেতা। উদ্‌গত কান্নার বেগ চাপতে গিয়ে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠে শুধু। বাগ মানে না, শেষ পর্যন্ত বাঁধ ভেঙ্গে যায়। অবনীশ ভেবে পায়না এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত। কি বলে সান্ত্বনা দেবে।

ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে শ্বেতা। অবনীশ কিছু বলতে পারে না, মাথায় হাত বুলোয় শুধু।

কাঁদুক, কেঁদে মনটাকে একটু হাল্কা করুক। শেষ থেকে যেখানে শুরু জীবনের সব কিছুই সেখানে নিবর্থক দুর্বিসহ বোঝা।

জামাইবাবু ?

অ্যাঁ ? একটু কথা বলবার সুযোগ পায় অবনীশ দরদভরা চোখে শ্বেতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, আমায় কিছু বলবে ?

আমার এখন কি হবে জামাইবাবু ? অবনীশের মুখের দিকে করুনভাবে তাকায় শ্বেতা।

বিব্রত বোধ করে অবনীশ। চট্ করে এর কি জবাব দেবে সে। অথচ কিছু বলা দরকার। জবাব হাতড়াতে থাকে অবনীশ। সংসারের অবহেলা আর সমাজের উদ্যত শাসন হাত ধরাধরি করে জোর কদমে ছুটে আসছে। হয়তো একটা কিছু অনর্থ ঘটিয়ে বসবে এক্ষুণি।

নিজের কোন শ্যালক শ্যালিকা নেই বলে রীতার মাসতুতো বোন শ্বেতাকেই আপন শ্যালিকার মর্যাদা দিয়ে এসেছে এতদিন, কিন্তু এ কি হল !

চা আর বিস্কিট নিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন অমিতাদেবী। মেয়ের অসহায়তা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ভুলে গেলেন চা দিতে। নাঃ এখন আর এ চা দেবার কোন মানে হয় না, জুড়িয়ে একদম জল হয়ে গেছে। ফের গরম করে আনতে হবে।

ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই দেখতে পেয়ে অবনীশ বলে উঠে আমি চা

খাব না মাসীমা। বরং ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়াবে না ছাই যাবে ডক্টর সেনের নার্সিংহোমে। এক্ষুণি একটা কিছু করা দরকার। মনোজবাবুটা একটা স্কাউণ্ড্রেল, তুই না····· ছিঃ ছিঃ এখন ভয়ে পালিয়েছে।

শ্বেতাকেও বলিহারি যাই বাবা। আর যাই হোক তুমি কচি খুকিটি নও।

যাকগে যা হবার হয়ে গেছে যা বলবার নয় তাই-ই হয়েছে। এখন জান না বাঁচলেও মান বাঁচানো দরকার।

নার্সিং হোমের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় অবনীশ, সে ভুল করেছে ; এ ভাবে আসাটা ঠিক হয়নি। তাকে পুলিশে হ্যাণ্ড ওভার করতে পারে। দু চার ঘা খাবার পর শ্রীঘর। পরে হয়তো বেল। সময় লাগবে। লোক জানাজানি হবে; অফিসের কলিগরা মুখ টিপে হাসবে! পাড়াপড়শীরা টিট্‌কিরি দেবে। রীতা সন্দেহ করবে। ওর সরল মন, গরল হলে আর রক্ষে নেই। তার চাইতে—

ঘুরে দাঁড়ায় অবনীশ, বিস্মিত হয়ে শ্বেতা বলে, কি হল জামাইবাবু ?

না—মানে আজ থাক শ্বেতা, কাল বরং আসব। অফিসের একটা কাজে মিঃ দত্তর সঙ্গে এক্ষুণি একবার দেখা করা দরকার। একদম খেয়ালই ছিল না আমার।

মিথ্যে কথা বলে অবনীশ। মুষড়ে পড়ে শ্বেতা। তবে কি—তবে কি ইনি ও ঝুটঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এড়িয়ে যেতে চাইছেন !

এতক্ষণ যাকে দেবতা বলে মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে তাকে মনে হচ্ছে একটা ভীরু কাপুরুষ। মনোজের চাইতেও জঘন্য। ও তবু সাহস করে দুর্বুদ্ধি করেছিল, ভয়ে পৌঁছোয়নি। কিন্তু মারের চোটে পালাতে বাধ্য হল। প্রেম প্রেমই। তা স্থান কাল পাত্র ভেদ কিংবা রাশি নক্ষত্র বিচার করে হয় না, হতে পারে না। যারা ভাবে তারা ভুল করে যেমন ভুল করেছে—

থাক সে কথা। এখন ওসব চিন্তা করবার সময় নেই। অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতেই ফলেছে।

অবনীশ বলে, কাল আবার আসব কাল একটা ব্যবস্থা করবই। ভেবো না। তবে বেরুবার আগে তোমাকে—

চোখের জল মুছে শ্বেতা বলে, থাক, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। রেল লাইন এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আপনি যান।

শিউরে ওঠেন অমিতাদেবী, হয়তো ডুকরে কেঁদেই উঠতেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে—মানে একমাত্র সন্তান শ্বেতা। ওকে চারবছরের রেখে ওর বাবা মারা যান, আর সেই থেকে কত কষ্ট করে ওকে বড় করে তুলেছেন অমিতাদেবী। হায়ার

সেকেণ্ডারী পাশও করিয়েছেন। অবিশ্যি শ্বেতার পাশ করবার মূলে যার অবদান সব চাইতে বেশী তার নামোচ্চারণ করতেও আজ ঘৃণা বোধ হয়।

অবনীশ বলে, তুমি ভুল বুঝো না শ্বেতা, শোন। কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে। শ্বেতা বোধহয় একটু আশ্বস্ত হয়, অপসৃত হয় মনের কালিমা। অমিতদেবী অবিশ্যি কিছু শুনতে পাননি, বুঝতেও পারেন নি কিছু। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

কদিন যাবৎ শ্বেতাকে নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করায় শরীরটা একটু খারাপই লাগে অবনীশের। বাড়ীতে ফিরে একটু সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে হয়।

রীতা বলে কদিন ধরে একটা কথা বলব বলব করে আর বলবার সুযোগ পাই নি।

অবনীশ হেসে বলে, বলো না কি বলবে?

শ্বেতাকে নিয়ে এত মাতমাতি করবার কোন মানে হয় না। যতসব আদিখ্যেতা।

ক্ষুণ্ণ হয় অবনীশ! বলে, তুমি বুঝতে পারছ না রীতা—

থাক্, বাধা দেয় রীতা, বুঝি কি আর না? সব বুঝি—আমি পুরোনো হয়ে গেছি।

যেন কঁকিয়ে ওঠে অবনীশ, ছিঃ রীতা, ছিঃ! মনটাকে অত ছোট কর্‌মো না।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে রীতা, বলে, মন আমার ছোট নয় মোটেই—এ কথা শুধু তুমিই বললে, আর কেউ বলেনি কোনদিন।

শ্বেতা তোমার ছোট বোন, শান্তভাবে বলে অবনীশ।

ছোট বোন বলেই তো শত্রুতা করছে। নিজের মুখ পুড়িয়েছে, এবার আমার ঘর ভাঙবে।

আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর রীতা?

ভরসা পাচ্ছি কৈ। দিনকে দিন তুমি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ।

ওটা তোমার মনের বাতিক।

কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোয় না। রীতা গম্ভীর হয়ে যায়। অবনীশ ও। অফিস কাছারি করে বেড়াতে যায় আর কম সময় ঘরে থাকে। সন্দেহ বেড়ে যায় রীতার।

দেহের কোন অংশে একবার বিষ ঢুকলে তা ধীরে ধীরে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, মিশে যায় প্রতি রক্ত কণিকায়। রীতার মনে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে, অবনীশের সব কাজে এখন খুঁত ধরে, দোষ দেখে। বায়ু কোনে মেঘ দেখা দেয়।

মনের ঝড় প্রাকৃতিক ঝড় থেকে ও ভয়ঙ্কর। সব কিছু তছনছ করে দিতে পারে

এক মুহূর্তে। রীতার মনে সে ঝড় উঠেছে তার গতিবেগের সামনে অবনীশ দাঁড়াতে পারে না, সামান্য খড় কুটোর মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় দূরে—অনেক দূরে।

আবার সেদিন ছুতোনাতা নিয়ে খিটিমিটি শেষ পর্যন্ত চরমে পৌঁছোয়। অবনীশ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, তুমি নীচ জঘন্য। কোন ভদ্রঘরের মেয়ে যে এত হীন হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

রাগে ফেটে পড়ে রীতা—কী, কী বললে তুমি? আমি ছোটলোকের মেয়ে? বাপ তুললে তুমি?

—ভুল করছো তুমি, আমি বাপ তুলিনি।

—ঐ হল। যার নাম চাল ভাজা তার নামই মুড়ি। আমি নুন দিয়ে ভাত খাই।

আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করে দেবার উদ্দেশ্যে অবনীশ বলে, চড়কডাঙ্গা গিয়ে ক'দিন থেকে এলে পার, বহুদিন তো যাও না।

দরদ যে উথলে পড়ছে, বলে রীতা। আমি বাপের বাড়ী গেলে ওকে সরাসরি এনে ওঠাতে পার, নয়? অভিসারের সুবিধা হয়। আমি যাব না।

বেশ, না যাও থাকো। বিরক্ত হয় অবনীশ। আমাকে জ্বালিও না।

এরপর থেকে দুজনেরকথাবার্তা একরকম বন্ধই বলা যায়, যেটুকু হয় তা ভাববাচো এবং বাচ্চাটিকে মাধ্যম করে।

পরদিন যথারীতি অফিসে যায় অবনীশ। চান সেরে কাপড় পরতে পরতেই শুনতে পায় রীতা ছেলেকে বলছে, তোর বাবাকে বল ভাত দেওয়া হয়েছে। এক বছরের ছেলে যে বলতে পারবে না তা রীতা বেশ ভাল করেই জানে। তাই একটু জোরে জোরে বলে যাতে অবনীশ শুনতে পায়।

মনে মনে হাসে অবনীশ, কি বিচিত্র এই নারীমন এদের মনে হিংসেটা বোধহয় একটু বেশীই থাকে। তা না হলে নেহাৎ সন্দেহবশে ঝুটমুট একটা অশান্তি সৃষ্টি করবার কোন মানে হয়?

অফিস থেকে ফিরতে সেদিন বেশ একটু দেরীই হয়েছিল অবনীশের। ফিরবার পথে একবার শ্বেতাদের বাড়ী হয়ে এসেছে। ওর মার হাঁপানির টানটা বড্ড বেড়েছে। খবর পেয়েও না যাওয়াটা অন্যায় হত। ফিরে এসে দেখে ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। ব্যাপার কি। রীতা কি চড়কডাঙা চলে গেল নাকি? কিন্তু একাতো যায় না কখনো। আজকালকার মেয়ে হয়ে ও চলা ফেরায় অতটা পটু নয়। মন মেজাজ ভাল না। হয়তো পাশের বাড়ী একটু বেড়াতে গেছে। এত রাতে বেড়ান তো ভালো কথা নয়। কিন্তু না, রীতা পাশের বাড়ী বেড়াতে যায়নি, পাশের বাড়ী চাবি রেখে বাপের বাড়ী গেছে।

অবনীশ ঘর খুলে দেখে রাতের খাবার—রুটি তরকারী ঢাকা দেওয়া আছে, পাশে একগ্লাস জল।

হাতমুখ ধুয়ে এককাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল অবনীশের, কিন্তু উপায় নেই। রীতা যে কোথায় কি রাখে তা জানে না অবনীশ। হীটারটা জ্বালিয়ে অনায়াসে এককাপ চা করা যেত।

ঘরের দরজায় তালা দিয়ে কলোনীর মোড়ে মাম্বুর দোকানে গিয়ে এককাপ চা খায় অবনীশ, আর দুটো বিস্কুট। তারপর আড্ডা মেরে মেরে ঘরে ফেরে রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। এসেই শুয়ে পড়ে, খায় না কিছু। খেতে মন চায় না। ভাবে দেখা যাক রাগ কদিন থাকে। থাক না যতদিন খুশি, কিন্তু মন খারাপ লাগে ছেলেটার জন্যে।

একদিন, দুদিন, তিনদিন—রীতা আর ফেরে না—অবনীশ রান্না করতে জানে না, দু বেলাই হোটেলে খায়। চারদিনের দিন অফিস ফেরত অবনীশ গিয়ে হাজির হয় শ্বশুর বাড়ী, অবিশ্যি একটু আগেই বেরোয় সেদিন। সেধে রীতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। এরকম করলে লোকে কি বলবে? তাছাড়া ছেলেকে ছেড়ে থাকতেও পারে না সে।

চডকডাঙা গিয়ে দেখে জগদীশবাবু অর্থাৎ অবনীশের শ্বশুরমশাই বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, আর কি যেন আণ্ডারলাইন করছেন। অবনীশকে দেখে বললেন, ওরা কেউ বাড়ী নেই। হাবড়া গেছে। কখন ফিরবে কিছু ঠিক নেই।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে অবনীশ। ফিরবে তো আজ তা যত রাতই হোক। থেকেই যাবে না হয় সে। ভোরে উঠে ওদের নিয়ে চলে যাবে, নয়তো অফিস কামাই করবে কাল। অনেক ছুটি পাওনা আছে। প্রতি বছরই নষ্ট হয়ে যায়।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বোকার মত চুপচাপ বসে থাকবার পর ওরা এলো। টের পেয়ে অবনীশ ঘরে ঢুকতে যাবে এমনি সময়ে চোখাচোখি হতেই ভ্রূ কুঁচকে যায় রীতার, বলে কাপড় ছাড়ব। অবনীশ বলতে যাচ্ছিল—ছেলেটাকে দাও। রীতা দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী এককাপ চা আর দুটো বিস্কিট দিয়ে যান, ভাল মন্দ কোন কথাই বলেন না। মনে হল যেন কোন এক অপরিচিত ভদ্রলোক জগদীশ-বাবুর কাছে এসেছেন। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে চা দিতে হয় তাই দেওয়া অবনীশ কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না, নতুন ব্যবস্থায় একটু দমে যায়।

শ্বশুরবাড়ির বৈঠকখানায় বসে চা খাওয়া অবনীশের এই প্রথম। এখানে

বসে কোন সময় চা খেতে চাইলেও উনি দিতেন না। জামাই বলে কথা। তাও একটামাত্র জামাই! বাইরের ঘরে বসে চা খাবে কেন? আজ কিন্তু ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা।

চায়ের পেয়ালায় মুখ ঠেকাতে পারে না অবনীশ। এলোমেলো চিন্তা এসে মাথায় ভিড করতে থাকে। খবরের কাগজ থেকে মুখ না উঠিয়েই জগদীশবাবু বলেন, তোমার ট্রেন কটায়।

কানে ভুল শুনছে না তো অবনীশ। এখানে এলে যিনি সবচাইতে বেশী খুশী হতেন, মনের মতো জমানো কথা উজাড করে দিতে চাইতেন, চটে যেতেন থাকতে না চাইলে—বলতেন এখান থেকে দু-চারদিন অফিস করো না। লোকে তো সেই বর্ধমান কিংবা কৃষ্ণনগর থেকেও ডেইলি প্যাসেঞ্জারী করে। এ তো মাত্তর সাত স্টেশনের মামলা। কখনো কখনো কথায় এত মশগুল হয়ে যেতেন যে শাশুড়ী অনেক সময় রেগে যেতেন। ছেলেটাকে একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না নাকি? এলেই যত রাজ্যের কথা শুরু হয়ে যায়।

পায়ের তলার মাটি যেন এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নীচু মনে হয় অবনীশের। চোখ দেখাতে গিয়ে ডার্করুম থেকে বেরোলে যে অবস্থা হয় ঠিক সেই রকম—সামনের রাস্তা অসমান আর অসমতল ঠেকে।

অবনীশ ঢোঁক গিলে বলে না—মানে, ওদের নিয়ে যেতে এসেছি।

ওরা এখন যাবে না, এখানেই থাকবে। তুমি যাবে তো চলো। আমিও স্টেশনের দিকে যাচ্ছি।

অবনীশের ইচ্ছে হচ্ছিল চলে যায়। কিন্তু ছেলেটাকে না দেখে ওকে একটু আদর না করে যেতে মন চায় না। পকেটে চকোলেট। আবার গিয়ে দেখে বাইরে থেকে ঘরের শেকল টানা, ঘরে কেউ নেই। রান্না ঘরে উঁকি মেরে দেখে শাশুড়ী রাতের খাবারের জোগাড় করছেন। অবনীশকে দেখেও যেন দেখলেন না। ঘুমেব মানুষকে সজাগ করা যায়, কিন্তু যারা জেগে ঘুমোয় তাদের সজাগ করা যায় কখনো?

রাগে অপমানে মুখ কাল হয়ে ওঠে অবনীশের। কিছু একটা কড়া কথা শোনাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু না, কিছু বলে না; দাঁতে দাঁত চেপে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় বাইরে, পকেটের চকোলেটগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়।

বাসায় ফিরে আসতেই একটা লোক এসে খবর দেয় শ্বেতার মা হার্টফেল করেছেন এক্ষুনি যেতে হবে অবনীশকে। কি আর করা যায় অগত্যা—

কাজকর্ম সব চুকে-বুকে গেলেও একটা সমস্যা এসে উঁকি দেয়। শ্বেতা এখন

যাবে কোথায়? জগদীশবাবুর বাড়ীতে যে স্থান হবে না তার আভাস আগেই পাওয়া গেছে, অন্য কোথাও যেতে চায় না শ্বেতা; তা ছাড়া সময়ও যায়নি। জগদীশবাবু গিয়েছিলেন। যেতে হয় বলেই গিয়েছিলেন হয়তো। দু-একটা দরকারী কথা ছাড়া আর কোন কথা বলেন নি, বলতে বোধহয় চানও নি। এহেন অবস্থায় শ্বেতাকে নিয়ে যাওয়া সমীচীন কিনা সেটা ভাবতে হবে বৈকি। তবু শ্বেতাকে নিয়ে যেতে হল নিজের বাসায়। পাড়াপড়শীরা সবাই ধরলে, কিন্তু ভেতরের খবর তো আর কেউ জানে না। ওপরে থুতু নিক্ষেপ করলে তা নিজের গায়েই এসে লাগবে। অবনীশ নিয়ে যায় শ্বেতাকে। যাকৃগে, হোটেলে মরার হাত থেকে বাঁচা গেল। রীতা কবে ফিরবে কে জানে।

শ্বেতা সোমত্ত মেয়ে, বোন বাড়ীতে নেই—ভগ্নিপতি বয়সের ছেলে। পাড়ায় কানাঘুষো হতে আর দেরী হয় না। অবনীশ ও শ্বেতাকে নিয়ে এক মুখরোচক কাহিনী গড়ে ওঠে। শ্বেতার সম্বন্ধের খোঁজ করতে থাকে অবনীশ। পাওয়াও যায় কয়েকটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নো পাত্তা; চিঠি দেব বলে আর দেয় না। বোন বাড়ীতে নেই—ভগ্নীপতির কাছে থাকে। ব্যাপারটা যেন কি রকম গোলমেলে। এইজন্যে অনেকের আপত্তি।

শ্বেতা বিব্রত বোধ করে, বলে আমাকে নিয়ে তো আপনি বিপদে পড়লেন যাহোক।

বিপদ আর কি! ম্লান হাসে অবনীশ, বলে, ওদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবার ওষুধও জানা আছে আমার। মনস্থির করে ফেলে অবনীশ, রীতাকে চিঠি দেয়। যদি ফিরে আসে তাহলে অবনীশ গিয়ে নিয়ে আসতে রাজী আছে, না এলে ও যেন জানায়। কিন্তু চিঠির কোন জবাব আসে না। শেষে রেজিস্ট্রি করে উকিলের চিঠি দেয়। তাও "রিফিউজড্ কার্কড্" হয়ে ফিরে আসে। উপায়ন্তর না দেখে একটা দিন দেখে শাস্ত্রমতে বিয়ে করে শ্বেতাকে।

দিন যায় রাত আসে, রাত কাটে দিন হয়। ঘুরে যায় প্রায় একটি বছর। অবনীশের মনের উৎসাহ দিন দিন কমে আসে, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। শরীরও খারাপ হয়। উঃ কতদিন ছেলেটাকে দেখে না! বিয়ের পরেও গিয়েছিল কয়েকবার। শেষবার তো যাচ্ছেতাই অপমানিত হতে হয়।

অবনীশের ভাবগতিক লক্ষ্য করে শ্বেতা বলে, দেখতে যখন দেবেই না তখন আর অপমানিত হতে যাওয়া কেন?

অবনীশ বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি বুঝবে না শ্বেতা ও আমার কত স্নেহের মানিক।

না, বুঝব কেন শ্বেতা অভিমানের সুরে বলে, তোমার মন যদি ওখানেই পড়ে

থাকবে তাহলে আর আমাকে লোক দেখানো বিয়ে না করলেই হত। আমার ছেলেপুলে হলে বোধহয় ভালবাসতেও পারবে না।

আহত হয় অবনীশ, বলে সে সম্ভাবনা আর নেই।

মানে? গর্জে ওঠে শ্বেতা। কি বলতে চাও তুমি? আমার কি ছেলেপুলে হবে না কোনদিন?

আমার হাতে না পড়লে হয়তো হতো।

তার মানে?

মানে অতি সোজা, আমি না হওয়ার ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছি।

শ্বেতা কি বোবা হয়ে গেল নাকি? কিছুক্ষণ কোন-বাকাস্ফূরণই হয় না ওর। দেহের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে জমাট বেধে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমাকে জব্দ করাই কি তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ছিল?

নির্লিপ্তভাবে বলে অবনীশ, না, বাঁচানো।

একে কি বাঁচানো বলে?

তোমার বিবেককেই জিজ্ঞাসা কর।

মরীয়া হয়ে ওঠে শ্বেতা, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। সাধে কি দিদি চলে গেছে! তীক্ষ্ণস্বরে বলে, হেঁয়ালী রাখ স্পষ্ট করে বলো।

ডাক্তার সেনের নার্সিং হোমের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সে তো আমার জন্যে।

প্রথমদিন ফিরে এসেছিলাম তা মনে আছে?

আছে, তুমি ভয় পেয়েছিলে।

ম্লান হাসে অবনীশ, বলে হ্যাঁ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বৈকি। তাইতো পরের দিন তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে নিতে হলো। সব দিক বজায় রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকেই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে মিথ্যে কথা বলে।

রাগে ফুঁসতে থাকে শ্বেতা। সে রাতে আর কিছু খায় না, অবনীশের সঙ্গে কথাও বলে না। মেঝেতে একটা মাদুর পেতে রাত কাটিয়ে দেয়। পুরুষ মানুষকে চেনা ভার। ওখানে টাকা পয়সাও দেয় বোধ হয়। তা না হলে প্রায়ই টান পড়ে কেন?

ইদানীং শ্বেতা অবনীশকে এড়িয়ে চলতে চায়, বেড়াতে বেরোয় যখন তখন। কখনো শ্যাম বাজার আবার কখনো বা দূরে অনেক দূরে। প্রায়ই রাত করে ফেরে। হঠাৎ একদিন মনোজের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। প্রমোশন হয়েছে তার। ফুল ফ্লেজেড্ অফিসার। মনের আগল খুলে যায় দু'জনের। তখন বোকামী না করলে ঘটনার গতি অন্যরকম হত এবং তা এখনো হতে পারে।

অবনীশ বাড়ীতে না থাকলে প্রায়ই আসে মনোজ বত কি শলা-পরামর্শ হয়। বাড়ী থাকলে বেরোয় শ্বেতা। অবনীশ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, সব সময় কৈফিয়ত ভাল লাগে না। অবনীশ চুপ করে যায়, কিন্তু লক্ষন ভাল ঠেকে না মোটেই।

সিনেমার নাম করে বেরিয়ে সেদিন আর বাড়ী ফেরেনি শ্বেতা পরের দিন ও না এবং তার পরের দিনও নয়। একটা অব্যক্ত ব্যথায় বুকটা টন্‌টন্‌ করতে থাকে অবনীশের একই দৃশ্যের পুনরাভিনয়? যাক্‌গে আপদ গেছে।

আবার হোটেলে খাওয়া, আবার একলা থাকা একটা বাড়ী আগলে, মেসেও যেতে পারে না, রীতা যদি—থাকগে ওসব অবাস্তব ভাবনা।

বিছানা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ বালিশের তলায় একটা চিরকুট পায় অবনীশ। তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে সেটা— কয়েকটা মাত্র শব্দ আমার খোঁজ করো না।

বিতৃষ্ণা আসে জীবনে। হায়রে দুনিয়া যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর? ধুত্তোর।

নিজের অজান্তেই নিজের উপর অবিচার ও অত্যাচার চালিয়ে যায় অবনীশ। প্রথমে তা টের পায় নি। কিন্তু টের যখন পেল তখন আর সময় নেই। হোটেলে খেয়ে আব অনিয়ম করে গ্যাসট্রিক থেকে গ্যাসট্রিক আলসার এবং শেষ পরিনতি ক্যানসার। অবনীশ বুঝতে পারে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় যদি ও ব' চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটালে একটা সীট্‌ পেল তা আর কাজে লাগল না। বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে ছুটে আসে রীতা, বাচ্চাটিকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। কতদিন ওকে দেখতে গিয়েও অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে অবনীশ।

রীতার মা-বাবাও এসেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। বুকের উপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে রীতা। চীৎকার করে করে কাঁদে ওগো, অভিমান করে চলে যেও না। তোমাকে জব্দ করতে গিয়ে আমিও কম শাস্তি পাইনি। এই দেখ তোমার বাবুয়া। ও এখন বাবা ডাকতে শিখেছে আরো কত কথা বলে।

বাবুয়া কি বুঝল সেই জানে। ডাকে বা-বা। চোখের জলে ছেলেকে তাড়াতাড়ি বুকে চেপে ধরে রীতা।

বাবা হওয়া

বুদ্ধদেব গুহ

॥ ১ ॥

ডাকবাংলোটা থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছিল। সামনে একটা খোয়ার পথ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। পথের দু'পাশে সারি করে লাগানো আকাশমণি গাছ। মার্চের প্রথমে অগ্নিশিখার মত ফুটছে ফুলগুলো, আকাশপানে মুখ তুলে আছে। বাংলোর হাতায় পন্‌সাটিয়ার ঝাড। ললিপাতিয়া বলে মালি। পাতাগুলোর লালে এক পশলা বৃষ্টির পর জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ খোয়ার রাস্তাটা মেরামত করছে সামনেই।

আমার ছেলে রাকেশ আর মেয়ে রাই নদীর কাছের সবুজ মাঠটুকুতে দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। রাকেশ যথেষ্ট বড় হয়েছে। ক্লাস এইটে পড়ে সে। তাছাড়া বয়স অনুপাতে সে অনেক বেশী জানে, বোঝে। কত বিষয়ে সে যে পড়াশোনা করে, তা বলার নয়। পডাশুনাতে খুব ভাল সে ত বটেই, কিন্তু শুধু স্কুলের পড়াশুনাতেই নয়।

নিজের ছেলে বলে নয়, তার ভালত্বে আমি মাঝে মাঝেই গর্ব বোধ করে থাকি। এই গর্বের কোন সঙ্গত কারণ আমার থাকার কথা নয়। কারণ ছেলে ও মেয়ের যা কিছু ভালো তা আমার স্ত্রী শ্রীমতীরই জন্যে। বাবার কর্তব্য হিসেবে একমাত্র টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুই প্রায় করার সময় পাইনি আমি। আমি আমার দোষ স্বীকার করি। আমি অত্যন্ত উদার মানুষ বলেই আমার বিশ্বাস। তবুও খারাপটুকুর দায় শ্রীমতীর উপর অবহেলায় চাপিয়ে আমরা ছেলেমেয়ের ভালোত্বের আনন্দটুকু আমি এই মুহূর্তে এই বাংলোর চওড়া বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি।

শ্রীমতী ঘরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। ড্রাইভে আমার কালোরঙা ডব্লু-এম-ডি নম্বরের ঝক্‌ঝকে গাড়িটা শাদা সীটকভার পরে-কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি একজন সেল্‌ফ-মেড মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ করিনি, মানে ইন্টার মিডেয়েট অবধি পড়েছিলাম। ইংরিজীতে বেশ কাঁচা ছিলাম। পড়াশুনা ছেড়ে

দিতে হয় আর্থিক কারণেই। কিন্তু নানা রকম চাকরী এবং ফিরিওয়ালা থেকে জীবন শুরু করে আমি এখন একটা কারখানার মালিক। স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রী হিসেবে রেজিস্টার্ড। লোহার ঢালাই করা জিনিস নানা দেশে এক্সপোর্টও করি। আমার ব্যবসা যে ভালো সে সম্পর্কেও ছেলে-সম্পর্কিত গর্বের মতোই গর্ব আছে আমার।

হাওড়াতে আমার কারখানা সল্ট-লেকে হাল-ফিল ডিজাইনের বাড়ি। সুন্দরী স্ত্রী। আরও-স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। বেশ কিছু লোক আমাকে স্যার স্যার করে। ভালো লাগে। কলকাতার একটি ক্লাবে আমি বছরখানেক হল মেম্বার হয়েছি। ইদানীং ক্লাবের এবং ব্যবসার জগতে আমি আকছার ইংরিজী বলে থাকি। আমি এখন জানি যে, এ-সংসারে টাকা থাকলে ইংরেজী বাংলা কিছুই না জানলেও চলে যায়। টাকার মত ভাল ও এফেক্টিভ ভাষা আর কিছুই নেই। তাছাড়া টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিদ্যাই আপনা-আপনি বাড়ে। লক্ষ্মীর মত সরস্বতী আর দুটি নেই।

ক্লাবে আমাকে লোক ম্যাক্ চ্যাটার্জী বলে জানে। আমার আসল নাম মকরক্রান্তি। ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেদের কাছে, আমার বাবার কাছে, চাকরি-জীবনের বিভিন্ন মালিকদের কাছে আমার আদরের নাম ছিল মক্‌রা। সে ডাকটা এখন ভুলেই গেছি।

এই মুহূর্তে আমি একজন সুখী লোক। সংসারে সুখী হতে হলে যা-যা থাকতে হয় থাকা উচিত আমার তার প্রায় সবই আছে। আমি একজন কপি-বুকে সুখী লোক। কিন্তু নদীর সামনে দূরে খেলে-বেড়ানো আমার ছেলে রাকেশ এবং মেয়ে রাইর কারণে আমি ঠিক যতটা সুখী তেমন সুখী অন্য কিছুর জন্যেই নই। ছেলে-মেয়ে ভাল হওয়ার সুখ, কৃতী হওয়ার সুখ বাবাকে যে কৃতিত্ব এনে দেয়, তা তার ব্যক্তিগত অর্থ, মান সম্মান কিছুই এনে দিতে পারে না। অবশ্য ছেলেমেয়েকে তাদের জীবনে অনেক কিছুই দিয়েছি আমি, আমাকে যা আমার মা-বাবা দিতে পারেন নি।

আমি একজন কৃতী কেষ্ট-কেটা, যোগ্য বাবা। ভাবছিলাম আমি। বড়লোক হওয়া সোজা, পণ্ডিত হওয়া সোজা, সব কিছু হওয়াই সোজা, কিন্তু ভাল বাবা হওয়া বড় কঠিন। এই শান্ত দুপুরে আলসের কবুতরের ডাকের একটানা ঘুমপাড়ানী শব্দে, ছায়ার স্নিগ্ধ হাওয়াতে, আদিবাসী কুলি-কামীনদের রাস্তা সারানো ছন্দবদ্ধ খটখট আওয়াজে বসে আমি ভাবছিলাম ; আমি একজন সার্থক বাবা।

॥ ২ ॥

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। চোখের পাতা বুজে গেছিল। এমন সময়

একটা গাড়ির শব্দে আচমকা তন্দ্রা ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি, আমার কারখানার ওভারড্রাফট অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কে, সেই ব্যাঙ্কের এজেন্ট এসে হাজির। মিঃ রায়। হঠাৎ? এখানে।

ওঁকে দেখেই আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, আরে। আপনি কোত্থেকে স্যার?

সব স্যারেরই স্যার বলার লোক থাকে। বাবারও বাবা থাকে। লিমিট বাড়ানো নিয়ে গত তিনমাস ধরে বড় রমদা-রমদি চলেছে। কানাঘুষোয় শুনেছি সোজা রাস্তায় হবে না। কিন্তু তেমন জানাশোনা হয় এমন সুযোগই হয় নি। এ একেবারে গড্-সেন্ট ব্যাপার।

রায়সাহেব তাঁর বিরাট এয়ার-কণ্ডিশানড অফিসে বসে এমন একটা 'এয়ার' নিয়ে থাকেন যে মন খুলে কথাই বলা যায় না।

আমি রায়সাহেবকে ইমপ্রেস করবার জন্যে ইংরিজীতেই কথাবার্তা চালু করলাম। আমি যে হাওড়ার একজন সামান্য ঢালাইওয়ালা নই, ডাবু ধবাই যে আমার শেষ গন্তব্য নয়, টাকা যে নোংরা আর পাঁকের মধ্যেই জন্মায় পদ্মফুলের মতো, এ-কথাটা এ হেন আপন- গন্ধে কস্তুরীমৃগসম পাগল ব্যাঙ্কারকে বোঝানো দরকার।

এমন সময় রাকেশ ও রাই ফিরে এলো।

আমি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে রায়সাহেবের আলাপ করিয়ে দিয়ে রায়-সাহেবদের সবাইকে মহাসমারোহে বসালাম। রাইকে বললাম, শ্রীমতীকে দিবানিদ্রা থেকে তুলতে। টিফিন-ক্যারিয়ারে কিছু খাবার আছে কী নেই কে জানে? চৌকিদারকে ডেকে চা করতে বললাম।

রায়সাহেব বললেন, রাঁচি যাচ্ছি, বাংলোটা দেখে ভাবলাম একটু রেস্ট করে যাই। আমার স্ত্রী ও শালী সঙ্গে আছেন। ওঁরা একটু······যাবেন।

নিশ্চয়। নিশ্চয়! বলে আমি রাইকে বললাম, রাই, মাসীমাদের বাথরুমে নিয়ে যাও।

রায়সাহেব ইম্পোর্টেড সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। আমাকেও একটা দিলেন। আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু ওভারড্রাফট-এর লিমিটটা বাড়লে আরো বেশী কৃতার্থ হতাম।

তারপর বাংলোর সামনে কাজ-করা কুলি-কামীনদের দিকে আঙুল তুলে বললেন' দিজ্ পিপল আর ভেরী অনেষ্ট অ্যাণ্ড নাইস ইণ্ডীড। আই মীন দীজ অ্যাদিবাসীস······

আরপরেই বললেন, বাট দে আর ব্রিয়্যালি নেভ্।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ইয়েস। রাইট ঊ্য আর। দে আর রিয়্যালি নেভ্।

রাকেশ সিঁড়িতে বসেছিল হঠাৎ উঠে এসে বলল, কাদের কথা বলছ বাবা ?

আমি একটু হোস বিদগ্ধ কৃতী বাবার মত মুখ করে ঐ কুলি-কামীনদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরিজীতেই বললাম যে, উই আর টকিং অ্যাবাউট দেম। দে আর নেভ্।

রাকেশ তার ক্লাসের সেরা ছাত্র। তার স্কুলও শহরের সেরা স্কুল। সে অবাক গলায় বলল, নেভ্ ?

রায় সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কৌতুকর স্বরে বললেন, হোয়াই, সান্ ?

রাকেশ বলল, ওরা অনেষ্ট কিন্তু নেভ্ দুটোই একসঙ্গে কী করে হবে ? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে বলল আই ডোন্নো হোয়াই ঊ্য কল দেম নেভ।

রায়সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নেভ বানান জানো ?

রাকেশ অপমানিত হল

আমি মানে রাকেশের বাবা, নেভ বানান এবং মানে দুটোর একটাও জানতাম না। রায়সাহেব বলেছিলেন বলে ওঁর কথায় সায় দিয়েই বলেছিলাম। তাই রাকেশের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে বাবার সম্মান রাখতে পারে কী না দেখার জন্য।

রাকেশ কেটে কেটে বলল, K n a ve আপনি আর বাবা এই knave এর কথাই বলছিলেন ত ?

একজক্ট্‌লি। বললেন মিঃ রায়

রাকেশ বলল, আমি ত তাই-ই ভাবছি। তাহলে আমি ঠিকই বলেছি,। Knave-এর মানে ত অন্য।

মিঃ রায় আমার দিকে চেয়ে বলেন, তাহলে আমিই ভুল বলেছি, কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জী ?

আমি বললাম, কী যে বলেন স্যার ? আপনি কখনও ভুল বলতে পারেন ? আজকালকার ছেলেদের কথা ছেড়ে দিন। সব ইম্পার্টিনেন্ট ; অসভ্য।

রাকেশ হঠাৎ আমার দিকে একবার তাকাল। এমন চোখে ? আমার ছেলে ? যে নবজাত ছেলেকে আমি নার্সিং হোমে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। দুপা একসঙ্গে করে ধরে গামলায় চান করিয়ে নার্স তাকে তুলে ধরে বলেছিলেন, এই যে মকরবাবু, দ্যাখেন আপনার ছাওয়াল। বাবা হইলেন গিয়া আপনে।

সেই ছেলে এমন ঘৃণা ও হতাশা-মেশা অবাক হওয়া চোখে কখনও আমার দিকে তাকায়নি। কখনও তাকাবে বলে ভাবিওনি।

একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাকেশ। তারপর মিঃ রায়ের দিকে মাথা নিচু করে বলল, আই অ্যাম স্যরি।

আমি বললাম, স্যরি নয় শুধু রাকেশ, ইনি কে জানো? কত বড় পণ্ডিত তা তুমি জানো?

বলেই, ভাবলাম, ও কী করে জানবে? স্টুপিড্, ইনোসেন্ট, ইডিয়ট। স্কুলের পরীক্ষাই ত পাশ করেছে, জীবনের পরীক্ষায় ত বসতে হয়নি। ও জানবে কী করে। ব্যাঙ্কের লিমিট না বাড়লে যে ব্যবসা বাড়ে না, গাড়ি চড়া যায় না, আরো ভাল থাকা যায় না, ভাল স্কুলে পড়ানো যায় না ছেলেমেয়েকে, তা ও কী করে জানবে। গাধা!

আমি বললাম, স্বীকার করো ওঁর কাছে যে তুমি অন্যায় করেছ। বলো যে, তুমি ভুল বলেছ। ক্ষমা চাও, তর্ক করেছ বলে।

আমি.........

বলেই রাকেশ আমার দিকে চেয়ে রইল।

ইতিমধ্যে রায়সাহেবের স্ত্রী ও শালী বারান্দায় চলে এলেন।

আমি আবহাওয়া লঘু করে বললাম, বসুন বসুন, এক্ষুনি চা আসছে।

ওঁরা বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রায়সাহেব রুক্ষ গলাতেই বললেন, চায়ের ঝামেলায়দরকার নেই, রাস্তায় অনেক পাঞ্জাবী ধাবা আছে। সেখানেই খেয়ে নেবো।

বলেই অত্যন্ত অভদ্রভাবে বললেন, চলি, মিঃ চ্যাটার্জী।

শ্রীমতীও ঘর থেকে বাইরে এসেছিল। ওঁর সঙ্গে মহিলারা ভালই ব্যবহার করেছিলেন, তাই মিঃ রায়ের এই রকম হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ ও বুঝতে পারল না।

আমি তাকিয়ে দেখলাম রাকেশ নেই। কখন সরে গেছে বারান্দা থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি গিয়ে মিঃ রায়ের গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। মিঃ রায় সামনের সীটে উঠতে উঠতে বললেন, আপনার ছেলেটি ভাল, কিন্তু ওকে ভাল করে ম্যানারস্ শেখান। এখনই যদি সব কিছু জেনে ফেলে তবে পরে কী জানবে আর?

আমি হাত জোড় করে বললাম' ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। অপরাধ নেবেন না।

মিঃ রায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, অপরাধের কী আছে?

তারপর একটু থেমে, আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, অপরাধ ক্ষমা করাই তো আমাদের কাজ।

গাড়িটা চলে-গেল।

আমি ডাকলাম, রাকেশ। রাকেশ।

আমার ম্যাক চ্যাটার্জীর মধ্যে থেকে মুগিতলা বাই লেনেব মক্‌বা বেবিয়ে এলো বহু দিন পব। আমি হুংকার দিলাম, কোথায তুই, ছোকবা তোর পিঠেব চামড়া তুলব আজ।

বাকেশ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। একটুও উত্তেজনা নেই। শান্ত ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার চোখে চোখ বাখল।

আমার মনে হল, এ আমার ছেলে নয়। এ আমার শত্রু। আমার ধ্বংসকারী। বিষবৃক্ষ।

আমি বললাম, তুমি ভেবেছ কি ?

রেগে গেলে ছেলেমেয়েদের আমি তুমি করে বলি।

রাকেশ শান্ত গলায় বলল, কি বাবা ?

আবার কি বাবা ? বলে আমি চটাস্ করে এক চড় মারলাম ওকে।

বললাম, বাবার মুখে কথা বলা, তুমি বাবার চেয়েও বেশী জানো ? তুমি জানো মি রায় কত বড় অফিসার ? আমাদেব ব্যবসার ভাগ্যবিধাতা উনি, আর তুমি তাঁর চেয়েও বেশী জানো ? বড়দের মুখের উপর কথা ; মুখে-মুখে কথা।

শ্রীমতী দৌড়ে এল।

আমি বললাম, তুমি সরে যাও। আমি ওকে আজ মেরেই ফেলবো—আমার আজ মাথার ঠিক নেই।

শ্রীমতী রাকেশকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু রাকেশ নড়ল না। দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুখের ভাব শান্ত ; নিরুত্তাপ।

আমি কী করে ওর মনের দৃঢ়তা ভাঙব বুঝতে না- পেরে ওর নরম গালে আরেক চড় মারলাম।

ওর গাল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল।

ওর চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ এই প্রথমবার আমার মনে হল এ ছেলে সাংঘাতিক ছেলে। বড় হলে এ বোধ হয় নক্‌শাল হবে। অথবা ঐ রকমই কিছু। নিজের বাবাকেই খুন করবে। এক সময়ে রাকেশের মত পড়াশোনায় ভাল ছেলেরাই ত ঐসব করেছিল।

আমি ভাবলাম, ওকে চণ্ডীমাতা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করালেই ভাল

করতাম। ঢালাইওয়ালা মক্রার ছেলেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট করার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে এই বিপত্তি।

শ্রীমতী নিরুত্তাপ, উদাসীন গলায় বলল, অনেক বেড়ানো হয়েছে, পিক্নিক হয়েছে ; এবার ফিরে চলো—রাতটা মামাবাড়িতে খড়গপুরে কাটিয়ে কালই কোল কাতা যাব।

॥ ৩ ॥

বাইরে থেকে ফিরে এসেছি দিন দশেক হল। এসে অবধি ভারী খাটুনি যাচ্ছে লোড-শেডিং-এর জন্যে রাতে ঢালাই বন্ধ। একটা জেনারেটর কেনা নিয়ে দৌড়া দৌড়ি করতে করতে হয়রান হয়ে গেলাম।

সল্টলেকে বেশ মশা। মশারি ছাড়া ঘুম হয় না। শুয়েছি মশারির মধ্যেই তব এখনও কিন্তু ঘুম আসছে না। কেন জানি না বারে বারে রাকেশের কথাই মনে হচ্ছে

রাকেশ যখন ছোট ছিল, যখন আমার অবস্থা এত ভালো ছিলো না, তখন আমাদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে শ্রীমতীর সঙ্গে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ও পড়ত। আমি অফিস থেকে ফিরলেই, বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসে আমার কোলে উঠত। ঐ বয়সটাই ভালো ছিলো।

নিচেরতলায় রাকেশের পড়ার ঘর। আমরা কী ছোটোবেলায় এত সুযোগ সুবিধা পেয়েছি ? কত কষ্ট করে পড়েছি, বাজে স্কুলে, বইপত্র ছাড়া। এরা এত কিছু পেয়েই কী এত উদ্ধত হয়ে গেল ? অমানুষ হয়ে উঠল কি ?

ঘুম আসছিলো না।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পর আমি আলাদা ঘরে শুই। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে অন্য ঘরে। রাকেশ আলাদা ঘরে। সারা বাড়ির আলো নিবোনো। নিচের পর্চে শুধু একটা আলো জ্বলছে, গ্যারেজের সামনে।

আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। পায়চারি করতে চলে গেছি, আলো জ্বালিয়েছি, মনে নেই।

ঘরের এ-পাশ ও-পাশ সব ঘুরে বেড়ালাম। ড্রয়ারে চাবি দেওয়া। ড্রয়ারে কি আছে কে জানে ? ড্রায়ার খুলে আবার কী নতুন আতঙ্ক হবে তা তো জানা নেই। ড্রয়ার বন্ধ থাকাই ভালো।

রাকেশ লেখার টেবিলে একটা খাতা। বুক-র‍্যাকে অনেক বই। মাস্টার-মশাইয়ের বসার জন্যে টেবলের উল্টো দিকে একটা চেয়ার। দেওয়ালে ক্রস-লীর বড় পোস্টার।

যা খুঁজছিলাম দেখলাম আছে। দু'টি ডিকশনারী আছে।

প্রথমটা কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারী। পাতা উল্টে উল্টে Knave কথাটা বের করলাম। লেখা আছে: অনপ্রিন্সিপল্ড ম্যান, রোগ, কার্ড, সারভেন্ট।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ওই আদিবাসীদের যদি মিঃ রায় ভেরী নাইস বলে থাকেন এবং ভাল চাকর-বাকর বলে থাকেন তাহলে ভুল কি বলেছেন?

অন্য ডিকশনারিটা টেনে নিলাম। জুনিয়ার স্কুল ডিকশনারীর ফার্স্ট এডিশন, ১৯৬৯—তাতে শুধুই লেখা: এ পার্সন হু লিভস বাই চিটিং এ ডিসঅনেস্ট ক্যারাকটার।

এছাড়া আর কিছুই লেখা নেই।

আমি রাকেশের চেয়ারে বসলাম। দু'হাতের পাতায় মুখ রেখে ভাবতে লাগলাম।

ভেরী নাইস-এর সঙ্গে এই মানেটা খাপ খায় না। কিন্তু মিঃ রায় এত বড় একজন অফিসার ও লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কখনও ভুল করতে পারেন না।

বড্ড মশা কামড়াতে লাগল। গিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলাম অন্ করে।

হঠাৎ রাকেশের টেবিলে রাখা খাতাটার উপর চোখ পড়ল আমার। মলাটে রাকেশের নাম, ক্লাস, রোল নাম্বার সব লেখা। এটা পুরোনো ক্লাসের খাতা। আজেবাজে লেখার জন্যে ব্যবহার করে নিশ্চয়ই।

প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই দেখি রাকেশ লিখেছে, নেভার স্টপ লানিং। এই কথাটা বার বার লিখেছে। লিখে নিচে আণ্ডারলাইন করেছে। আর সেই পাতায়ই নিচের দিকে লিখেছে, ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্য কারেজ অফ ইওর কনভিক্‌শান। এর নিচে যে লাইন টেনেছে বার বার তা এত জোরে চাপ দিযে দিয়ে টেনেছে যে কাগজ নিবের চাপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে।

খাতাটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার মাথায় কার হাতের স্পর্শে চমকে উঠলাম ভয় পেয়ে। এত রাতে? কে? রাকেশ?

কে? বলে উঠলাম আমি।

আমি। বলল শ্রীমতী।

আমি শুধালাম, রাকেশ ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ।

আমি বললাম আমাকে তুমি কিছু বলবে?

শ্রীমতী বলল না।

বলেই, ঘরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে চলে গেল।

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমি অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমার ব্যবসা, আমার টাকা-পয়সা, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা. আমার বাড়ি গাড়ি সবই ত রাকেশ আর রাই-এরই জন্যে। যদি ওরাই ·····। যদি আমি······। ওরাই যদি······।

কী লাভ? কেন এত খাটুনি, এত দৌড়াদৌড়ি, হাওড়ার বাঁশবনে শেয়াল রাজা হবার এই তীব্র আকাঙ্খা আমার? কেন? কাদের জন্য। আমার একার জন্যেই কি?

॥ ৪ ॥

সকালবেলাটা যে কী করে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। মোল্ড নিয়ে আজ মহা গোলমাল হল। লয়েডস ইনসপেকশনের একজন লোক কেবলই পাসিং-এর সময় বায়নাক্কা লাগাচ্ছে। এই রেটে রিজেকশান হলে আর ব্যবসা করতে হবে না। ঘোষালের নতুন-হওয়া বাচ্চাটা নার্সিং হোম থেকে আসতে না আসতেই মারা গেছে। কারখানায় আসতেই পারছে না সে। সব ঝক্কি আমার একারই সামলাতে হচ্ছে কদিন থেকে।

দুপুরের দিকে একবার কোলকাতা আসি রোজই। কোনোদিন ক্লাবে খাই, কোনোদিন বা শ্রীমতী বাড়ি থেকে হট-বক্সে কিছু দিয়ে দেয়।

ক্লাবে গেলাম, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না। শরীরটা ভাল লাগছে না। সুগারটা চেক করাতে হবে। বেড়েছে বোধ হয়। একটা ই সি জি-ও করা দরকার। এই বয়সে ইস্‌কিমিয়া হতে পারে। বাঁ-দিকের বুকেও মাঝে মাঝে ব্যথা করে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, কলেজ স্ট্রীট যেতে। রাকেশের খাতায় লেখা কথাগুলো কাল থেকে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কী বলতে চেয়েছে ও? রাকেশের বাবা কী আমি? না আমিও ওর শত্রু?

সেইদিন দুপুর থেকে ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকাবার সময় গত কয়েক বছরে বেশী পাইনি আমি। শিশুর যে মুখে তাকিয়েছি সে মুখ এ মুখ নয়।

একটা বড় বইয়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বললাম ড্রাইভারকে। ঢুকে বললাম, ভালো ডিকশনারী কী আছে?

দোকানদার দুটি বের করে দিলেন। ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্লড ডিকশনারী সেকেণ্ড এডিশান, রিপ্রিন্ট ১৯২৯।

তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ৪১৪ পাতা—Knave মানে (১) আর্কেয়িক. (ক) এ মেন সারভেন্ট, (খ) এ ম্যান অফ হামবল স্ট্যাটাস (২) এ ট্রিকী রাসকাল রোগ, (৩) এ জ্যাক (প্লেইং কার্ড)।

আমার মনে হল রাকেশকে শাসন করে ঠিকই করেছি। মিঃ রায় নিশ্চয়ই ১ (খ) বুঝিয়েছিলেন। ওখানকার সরল ভালো আদিবাসীরা তো man of humble status-এরই। কিন্তু মিঃ রায় মধ্যে একটা but ব্যবহার করেছিলেন। এই but-টাই সমস্ত গুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্য ডিকশনারীটা দেখলাম। শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী ১৯২৯, ১০৮৯ পাতা। (ক) এ মেল চাউল্ড বয়—১৪৬০, (ঘ) এ বয় এমপ্লয়েড অ্যাজ সারভেন্ট; মিনিয়াল, ওয়ান অফ লো কণ্ডিশান, (গ) অ্যান আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, এ বেজ অ্যাণ্ড ক্র্যাফটি রোগ (l) JOC—১৫৬৩ (খ) কার্ডস।

One of low condition-এর অর্থে মিঃ রায় কথাটাকে নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হল আমার।

আমি তবু পাশের দোকানে গেলাম। সেখানে লিটল অক্সফোর্ড ডিকশনারী. ফোর্থ এডিশান, ১৯২৯ : ২৯৪ পাতাতে বলেছে—আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, রোগ, লোয়েস্ট কোর্ট (অরিজিনালি নয়—সারভেন্ট)।

আমার মাথা ভো ভো করতে লাগল। কফি হাউসে উঠে গিয়ে এক কাপ কফি আর এক প্লেট পাকোড়া নিয়ে বসলাম। বহু বছর পর কফি-হাউসে এলাম। কফিতে চুমুক দিয়েছি, দেখি শরৎ এসে হাজির। শরৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু হেমন্তর একেবারে ছোট ভাই শুনেছি পড়াশোনায় খুব ভাল হয়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে।

আমাকে দেখে বলল, কি মকরদা? কেমন আছেন?

আমি অন্যমনস্কর মতো বললাম, ভালো।

তারপর বললাম, Knave মানে জানো?

ও চমকে উঠল। বলল আমাকে বললেন?

আমি বললাম, না। না। কফি খাবে?

ও বলল, কফি খাবো না। কিন্তু আমি ত ফিজিক্সের ছাত্র। ইংরিজিতে তো অত ভালো নই।

আমি বললাম, এখানে তোমার ইংরিজির বন্ধুবান্ধব কেউ আছে। সাম ওয়ান হু ইজ রিয়ালী গুড।

শরৎ বলল, ঊ্যনিভার্সিটির বেস্ট ছেলেকে নিয়ে আসছি। ও নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এবার ইংরিজীতে।

বলেই, শরৎ চলে গেল।

একটু পর লাজুক লাজুক দেখতে ফর্সা রোগা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল শরৎ। বলল, এই যে।

আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, আমাকে Knave কথাটার মানে বলতে পারেন? বানান করে শব্দটা বললাম।

ছেলেটি বসে পড়ে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, কী খাবেন?

ছেলেটি বলল, বিষ ছাড়া যা খাওয়াবেন। ক্ষিদেও পেয়েছে।

ছেলেটি বেশ পাকা। ভালো ছেলেরা আজকাল বুঝি পাকা হয়। রাকেশের মতো?

আমি ওদের দু'জনের জন্যেই খাওয়ার অর্ডার করলাম।

ছেলেটি বলল, একটা কথার তো অনেক মানে হয়।

না, যে মানেটা সবচেয়ে বেশী মানে। আমি বললাম। সেটাই বলুন।

ছেলেটি হেসে ফেলল।

বলল, তার মানে?

আমি বললাম, যদি কথাটার একটাই মানে হত আজকে তবে সেই মানেটা কী হত?

ছেলেটি হাসল এক ফালি। ওর কপালে স্কাইলাইট দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল চিটিংবাজ। এক কথায় বললাম।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বললাম। আপনি শিওর?

ছেলেটি সিগারেটের প্যাকেই বের করে বলল অ্যাবসলুটলি।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বিধা বড় কম। 'শিওর' কথাটি ছেলেটি যেমন করে বলল, তাতে ভালো লাগলো আমার খুব। ওদের চরিত্রে একটা সোজা ব্যাপার আছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, ওদের মধ্যে সংশয়, দ্বিধা ব্যাপারটা কম। আমাদের ছোটবেলায়, ছাত্রাবস্থায় আমরা ঐ রকম ছিলাম না।

তারপর বলল, অন্য অনেক মানে আছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রচলিত ও প্রয়োজ্য মানে এই।

আমি উঠে পড়লাম। শরৎ-এর হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, তুই দামটা দিয়ে দিস শরৎ। আমার বিশেষ তাড়া আছে। কিছু মনে করিস না।

যাওয়ার সময় ছেলেটিকে বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য।

যেতে যেতে শুনলাম ছেলেটি শরৎকে বলছে, কীরে? এ যে মেন্টাল কেস।

আমি তাড়াতাড়ি কারখানাতে ফিরে এলাম। এসেই অ্যাকাউন্টট্যান্ট ডেকে পাঠালাম। বিমলবাবু আমার বহু পুরোনো অ্যাকাউন্টট্যান্ট। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের চেয়ে ভালো।

বিমলবাবু এসে বললেন বলুন স্যার। বিমলবাবুর চোখ দুটো চিরদিনই স্বপ্নময়। এ রকম কবি-কবিভাবের অথচ এফিসিয়েন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুব কমই দেখা যায়।

বললাম বিমলবাবু এক্ষুনি একটা ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরী করুন। আমাদের ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট আমি এক্ষুনি শোধ করতে চাই। কী অবস্থা জানান আমাকে। ইমিডিয়েট্‌লী। সব কাজ ফেলে রেখে।

বিমলবাবু হাতের বল্‌পেনটা নাড়তে নাড়তে বললেন স্যারের মাথার গণ্ডগোল হল। অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কথা ছেড়েই দিন। এক্ষুনি লাখখানেক টাকার বিল ডিস-কাউন্টিং ফেসিলিটি বাড়িয়ে আনতে না পারলেই নয়।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, যা বলছি, তাই করুন বিমলবাবু।

বিমলবাবু বললেন, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে স্যার তাহলে।

হলে হবে। আমি বললাম। আমিই কী বললাম? মকরা বলল? না ম্যাক চ্যাটার্জি? না রাকেশের বাবা?

জানি না, কে বলল।

বিমলবাবু চলে যাওয়ার আগে আমি আবারও বললাম যে, কত স্টক আছে দেখুন। সমস্ত স্টক সেল করবো।

কি হয়েছে স্যার?

বিমলবাবুর চোখে মুখে ভয়ের ছায়া নেমে এলো।

বললেন, ব্যবসা কী সত্যিই বন্ধ করে দেবেন? আমরা এতগুলো লোক কোথায় যাবো এই বয়সে। কি হল, যদি একটু জানতে পেতাম। বড় চিন্তা হচ্ছে আপনার কথা শুনে।

আমি হাসলাম।

আমি বোধ হয় অনেক বছর পরে হাসলাম। এমন নির্মল হাসি।

বললাম, না বন্ধ করব না। শুধু ব্যাঙ্ক বদলাবো। তাতে যা ক্ষতি হয় হবে। অন্য ব্যাঙ্কে চলে যাবো লক-স্টক-এণ্ড-ব্যারেল। এই চেঞ্জওভার পিরিয়ডে যা ক্ষতি হবার হবেই। কিছু করার নেই।

ক্যাপিটালই নস্ট হয়ে যাবে স্যার অনেক। এমন তাড়াহুড়ো করলে।

আমি এবার শক্ত হয়ে বললাম, হলে হবে। বললামই ত।

তারপর বললাম যে, আমি চলে যাচ্ছি এখন। আজই সব কিছু কমপ্লিট করে রাখবেন। রাজেন আর রামকেও ডেকে নিন। কাল আমি সকাল ন'টায় এসে কাগজপত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবো মিঃ রায়ের কাছে। কাগজপত্র সব রেডি করে টাইপ

করে রাখুন। দরকার হলে রাতেও থেকে যান। বাড়িতে খবর পাঠাবেন তাহলে। ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবেন সকলে।

কাগজ রেডি করলেও সব শোধ করবেন কী করে? স্টক ক্যাশ-সেল করলেও হবে না।

বিমলবাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

আমি বললাম, অন্য সম্পত্তি, এক বসতবাড়িটা ছাড়া বিক্রী বা মর্টগেজ করে দেবো। যা হোক করে হোক হয়ে যাবে। আর কথা বলার সময় নেই আমার আজকে।

॥ ৫ ॥

বহু বহুদিন, বহু বছর পর আমি দিনের আলো থাকতে থাকতে কারখানা থেকে বেরোলাম,। এত সময় হাতে নিয়ে আজ কী করব জানি না। নিউ মার্কেটে গিয়ে কেক কিনলাম। রাকেশ খেতে খুব ভালোবাসে। চকোলেট কেক।

তারপর কলেজ স্ট্রীটের দিকে গাড়ি চালাতে বললাম। পথে যে নার্সিং হোমে রাকেশ হয়েছিল সেই নার্সিং হোমটা পড়ল। এখন কত বদলে গেছে সব। রাকেশ আমার সেই ছোট্ট উলঙ্গ, দুগ্ধপোষ্য ছেলেও কত বদলে গেছে। কত বদলে গেছি আমি।

কলেজ স্ট্রীটে নেমে অক্সফোর্ডের সবচেয়ে ভালো যে ডিকশনারী যা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মাইক্রোস্কোপিক অক্ষর দেখতে হয়; তা কিনলাম একটা। তারপর বাড়ির দিকে চললাম।

গাড়িতে বসে বসে ভাবলাম যে কাল মিঃ রায়কে কী বলব। বাবা হয়ে অন্যায়ভাবে যে চড় দুটো মেরেছিলাম রাকেশকে, সেই চড় দুটো ওঁর গালে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। ছোটবেলায় বহু মারামারি করেছি পাড়ায়। মক্‌রা গুণ্ডা বলতো আমাকে। কিন্তু আজকে তা আর হয় না। :আজকে রাকেশের বাবা আমি। আমার নিজের পরিচয়টাই আমার একমাত্র পরিচয় নয়।

কাল কেমন করে ধীরে সুস্থে, মিঃ রায়কে বলব যে মিঃ রায় আপনি ইংরিজীটা আমার ছেলের চেয়ে খারাপ জানেন। তারপর যেই উনি ভুরু কুঁচকে আমার অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে কথা বলতে যাবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করা, সই করা চিঠিটা এগিয়ে দেবো। আর……

বাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন লোড-শেডিং। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে পাশের বাড়িতে গেছিল। পর্চ-এর সামনে ল্যান্ডিংয়ে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তাতেই সিঁড়িটা আলো হয়েছে একটু। দেখলাম, রাকেশের ঘরেও মোমবাতি জ্বলছে।

আমার হাত থেকে নগেন বইয়ের আর কেকের প্যাকেটটা নিতে যাচ্ছিল। আমিই বাধা দিলাম। বললাম থাক।

রাকেশ দরজার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে পড়ছিল। মোমবাতির আলোতে। এপ্রিলে ওর পরীক্ষা। এর আগে কখনও আমি জানি নি বা জিজ্ঞেস করিনি লোডশেডিং-এর মধ্যে আমার ছেলেমেয়েরা কীভাবে পড়াশুনা করে। কারখানায় দেড়লক্ষ টাকা খরচ করে জেনারেটর লাগিয়ে ফেললাম কিন্তু বাড়িতে পেট্রোমাক্সও কিনিনি একটা ওদের জন্যে।

টেবিলের পাশের দেওয়ালে সেই বড় পোস্টার। ব্রুস লীর। মোমবাতির আলোটা নাচছে পোস্টারটার ওপরে। কুং-ফুর রাজা এই হতভাগা দেশের হত ভাগা মানুষদের প্রতিভূ হয়ে যেন এদেশীয় নাক্কারজনক রাজনীতিকদের নির্লজ্জ আরশুলাসুলভ অস্তিত্বকে জুডোর প্যাঁচে গুঁড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। আমি দেখলাম, আমার রক্তজাত, আমার যৌবনের স্বপ্নের, আমার বার্ধক্যের অভিভাবক রাকেশ, হাত কাটা গেঞ্জী গায়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করছে। মোমের সঙ্গে ওর চোখও জ্বলছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বই বগলে করে আমি ভাবছিলাম, কী হবে? এত পড়াশুনা করে, ভালো হয়ে, সৎ হয়ে সত্যবাদী হয়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কী হবে এই দেশে? মনে মনে বলছিলাম, তুই যে ধনে-প্রাণে মরবি রে বাবা।

চমকে উঠে রাকেশ মুখ ফেরালো। দেওয়ালে ওর সুন্দর গ্রীবা আর মাথাভরা চুলের ছায়া পড়ল।

রাকেশ বলল, কে?

আমি। আমি বললাম।

রাকেশ উঠে দাঁড়াল।

বলল, বাবা!

কিন্তু মুখ নিচু করে রইল।

আমি বইয়ের দুটি খণ্ড ওর টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। বললাম, তোর জন্যে এনেছি রে।

কেন বাবা?

রাকেশ অবাক হয়ে শুধোলো। মাথা নিচু করেই।

আমার হঠাৎ মনে পড়ল এ পর্যন্ত হাতে করে আমি নিজে আমার ছেলের জন্যে কিছুই আনিনি। সময় হয়নি। মনে হয়নি।

আমি অস্ফুটে বললাম, তুই……

তারপর গলা পরিষ্কার করে বললাম রাকেশ তুই-ই ঠিক বলেছিলি।

কি বাবা ?

রাকেশ আবারও বলল, অস্ফুটে।

আমি বললাম সেদিন মিস্টার রায় ও আমি দুজনেই তোর প্রতি অন্যায় করেছিলাম।

তারপর হঠাৎ আমিই বললাম কী না কে জানে ? কিন্তু নিশ্চয়ই বললাম যে, তুই আমাকে ক্ষমা করিস। আমার অন্যায় হয়েছিল রে।

রাকেশ আবারও বলল, বাবা।

আমি রাকেশের দু'কাঁধে আমার দুটি হাত রাখলাম।

ভাগ্যিস লোড-শেডিং ছিল। নইলে রাকেশ দেখতে পেত আমার দু'চোখের দু'কোণায় জল চিকচিক করছে।

রাকেশ কিছু বলার আগেই বললাম, উপরে আয়। তোর জন্যে কেক এনেছি। চকোলেট কেক। তোর মা একদিন বলেছিল, তুই ভালোবাসিস। তোর মা ও রাই আসার আগেই চল্ আমরা দুজনেই এটাকে শেষ করে দিই।

রাকেশের মুখে সেদিন ডাকবাংলোর যে হঠাৎ অপরিচিতির রঙ লেগেছিল, তা আস্তে আস্তে, ধুয়ে এল। ওর সুন্দর মুখটা মিষ্টি, সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত হাসিতে ভরে এল।

ও বলল, তোমার না ডায়াবেটিস্।

আমি বললাম, তাতে কী ? একদিন খেলে কিছু হবে না !

তারপর বললাম, চান করে নিচ্ছি আমি। তুই ওপরে আয়।

রাকেশ বলল, আসলে, মা আর রাইও চকোলেট কেক খুব ভালোবাসে। মা আর রাই ফিরুক, তারপর একসঙ্গে খাবো।

আমি উপরে চলে এলাম। জামাকাপড় ছাড়লাম মোমের আলোয়। তারপর নগেনকে বললাম, মোমবাতিটা নিয়ে যেতে। মোমবাতিটা নগেন নিয়ে গেল ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

এদিকটা বেশ ফাঁকা। সল্ট-লেকে এখনও সব জমিতে বাড়ি হয়নি। দুদিন বাদেই দোল। তাই চাঁদ উঠেছে সন্ধে হতে না হতেই। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, চারিদিকে। আমি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে বাইরে চেয়ে রইলাম। গেটের দু'পাশে লাগানো হাসনুহানার ঝোপ থেকে গন্ধ উড়ছে।

হু হু করে ঝড়ের মত হাওয়া আসছিল দক্ষিণ থেকে। মনে হচ্ছিল ধ্রুবতারাটা কাঁপছে বুঝি হাওয়ায়। বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে বাইরের আলোছায়ার রাতের দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হল, যেদিন নার্সিং হোমে রাকেশ জন্মেছিল ; সেদিন আমি শুধু ওর জন্মদাতাই ছিলাম। এতদিন, এত বছর পরে ; আজ এক দেবদুর্লভ ধ্রুব সত্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমি ওর বাবা হলাম।

বাবা।

॥ বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া ॥

তুষার চট্টোপাধ্যায়

শহরের জনবিরল রাস্তাটার বুক বেয়ে লালটুস এবং পলা উদ্দেশ্যবিহীন এগুচ্ছিল। সময়টা শীতের শুরু এবং প্রাক্‌সন্ধ্যা। শীত এখনো পড়েনি, যে কোন দিন থেকে এবং যে কোন সময় শীত হুড় মুড়িয়ে পড়ে যাবে, এমন আশংকা প্রায় সব মানুষেরই বুকে হামাগুড়ি খেয়ে বেড়াচ্ছে। চাদ্দিকটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে, যেন ঝির ঝির করে কুয়াশা গুড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় কুয়াশা-টুয়াশা কিছু নয়, শহরের কলকারখানায় চোঙা বেয়ে উঠে আসা ধোঁয়া-মোয়া জাতীয় কিছু হবে। ওরা দু'জন যে রাস্তাটা ধরে নির্বাক শব্দহীন এগুচ্ছিল, সে রাস্তাটা আপাতত জনবিরল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে রাস্তাটায় এমন নিস্তব্ধতা এবং প্রাণ হীনতা দেখা যায় না অন্যান্য দিন গুলোয়। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওরা দু'জন একটা ফাঁকা মাঠ দু'ভাগ করে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

লালটুস এবং পলা পাশাপাশি হাঁটছিল রাস্তাময় নির্জনতা বেটে কেটে। রাস্তাটা এমন মরার মতো শুয়ে থাকার কারণ আছে। গতকাল রাতে এ রাস্তাটায় একজন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা নিজেরই দলের বিক্ষুব্ধ ক্যাডার দের হাতে প্রান খুইয়েছেন। সকলে এই নেতাটির অকাল মৃত্যুকে একটা দলের অন্তর্কলহের ভয়াবহ পরিনাম বলে বর্ণনা করেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে লালটুস্ গতকালের ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছিল পলাকে। পলার আটারো বছরের ফরসা গোলাপী রঙের তাজা বুনো লতার মতো লক্ লক্ করে বেড়ে ওঠা শরীর, ঢলঢলে কালো চোখ, টানা নাক—সব মিলিয়ে ওর চেহারায় অপূর্ব কমনীয়তা। বাড়ন্ত শরীরের তুলনায় মুখটা যেন একটু বেশী কচি ধরনের। তার সংগে ও আজ মানিয়ে পরেছে সবুজ সবুজ রঙের শাড়ি। পলার দু' কানে বড় বড় দুটো রিঙ। লালটুসের পাশে অনেক ছোট মনে হয় ওকে। ও চোখ বড় করে করে লালটুসের তরতর করে একজন বিচক্ষণ মানুষের মত করে বলা বর্ণনা শুনছিল। যেন সদ্য প্রয়াত রাজনৈতিক নেতাটির অসহায় রক্তাপ্লুত মুখাবয়ব ওদের দু' জনের জলজলে দু' জোড়া চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছে বার বার।···

লালটুসের শরীরটা ছ'ফুটের মতো লম্বা, পেটানো চেহারা। এক মাথা চুলে

ঘাড় ঢেকে রয়েছে। চেহারার তুলনায় চোখ দুটো বড় বড়। গায়ের রঙ ফুট ফুটে ফর্সা, মনে হয় শরীরের কোথাও সজোরে টোকা পড়লেই চামড়া ফেটে রক্ত চোয়াবে। শিলিগুড়ি কলেজে নাম লিখিয়েছে বছর সাতেক আগে। এখনো কলেজের মায়া ছাড়তে পারেনি। কলেজ ইউনিয়নের প্রাক্তন সেক্রেটারী। কলেজের দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরনের দাবীর ভিত্তিতে একবার লালটুস বাহাত্তর ঘন্টার অনশন ধর্মঘট করে শহরে হৈ চৈ তুলেছিল। ছেলে-মেয়েরা লালটুসকে একটু ভিন্ন চোখে দেখে। একবার বিপক্ষ ইউনিয়নের ছেলেদের হাতে জীবন জমা দিতে দিতে বেঁচে গিয়েছিল। খবরের কাগজের শিরোনামায় স্থান পেয়েছিল। মহকুমা শাসক অব্দি সদর হাসপাতালে ফোন করে লালটুসের কুশল জানতে চেয়ে ছলেন। সেই থেকে লালটুসের মধ্যে কেমন দাদা দাদা ভাব। হাঁটায়, চলনে বলনে সম্প্রতিকালের সিনেমার পর্দার হিরোদের জলছবি। ওর আসল নাম লালটু। আবাল বৃদ্ধজন ওর নামের পাশে একটা 'স' যোগ করেই ওর নাম উচ্চারণ করে। কেউ জানে না, কবে এবং কখন থেকে লালটু লালটুস্ হয়ে গেল।

'দলের লোকরাই তাদের এতদিনের প্রিয় নেতাকে খুন করলো কেন?' পলা লালটুসের সামনে প্রশ্নটা এখন সোজাসুজি দাঁড় করিয়ে দিল যেন মনে হচ্ছে পলা একজন অতি বিচক্ষন মহিলা, প্রশ্নটার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার ঢঙে সেই সুর ধ্বনিত হলো।

পলা এ বছরই স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে বাড়ির অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লালটুসদের কলেজে যাতায়াত শুরু করেছে। পলারা থাকে শিলিগুড়িরই মিলন পল্লীতে। পলার বাবা রাজাভাত খাওয়ার জঙ্গলে ফরেষ্ট গার্ড। তিন মেয়ে তিন ছেলে এবং অসুস্থ স্ত্রী মাধুরীকে নিয়ে পলাদের সংসার গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। পলার উপরে দুই বোন শীর্ণ স্বাস্থ্য জনিত কারণে বয়স লুকোতে পারে না। বাবার চতুর্থ শ্রেণীর চাকরী, সংসারের বুকে পিঠে সহস্র জোড়া তালি। মুখ খুলে কেউ কথা বলা বলি না করলেও ব্যাপারটা দিন দিন জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে পলার দিদিদের বিয়ে নামক কোন উৎসব এ বাড়িতে হবে না কোনদিন। পলার পরে ছোট ছোট তিন ভাই, স্কুলে যাতায়াত আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে। বইপত্র কিনে এবং মাস গেলে স্কুলের মাইনে গুনে গুনে ছেলেদের স্কুল পাঠানো সম্ভবপর হতো না পলার বাবার। কিন্তু পলার ভাইয়া নিয়মিত পড়াশুনা করার চাইতে দুর্গা পুজো, কালী পুজো, সরস্বতী পুজোর সেক্রেটারী হতে পারার জন্য বিশেষ মনযোগী। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকে পলার দিন বেশ হু হু করে উড়ে চলছিল

লালটুস পলার জীবনের সকটুকু অবসর এবং ক্লান্তিকর সময় নিজের উচ্ছল-প্রানময় উপস্থিতি দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখে। পলার মনে হয় এই-ই তো জীবন। আজকের দিনের সুখের এবং ভাল লাগার ছোট ছোট রক্ত কনিকাগুলো একদিন হয়তো জীবনে পাহাড় পর্ব্বতে রূপান্তরিত হবে, এমন সব রঙীন স্বপ্ন এবং এইসব স্বপ্নিল চিন্তা ভাবনা বুকে বয়ে নিয়ে পলা লালটুসের পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছিল। এরই নাম জীবন—ধারনাটা একটু একটু করে ওকে এমন এক বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিল যেখান থেকে পালিয়ে আসা আঠার বছরের পলাদের পক্ষে কে ন মতেই সম্ভব নয়। বরং ওখানে পৌছেঁ গিয়ে রক্তাক্ত হওয়াটা অধিকতর সহজ ব্যাপার। সুতরাং লালটুস এবং পলা, ওরা দু' জন এইভাবেই সামনের সময় টাকে পিছনে ফেলে নিজেদের বয়স বাড়িয়ে চলছিল।......ওদের কাছে জীবনের মানে সহজ সরল একটা রেখা।

পলার প্রশ্নের উত্তর হুটহাট দেয়না লালটুস। একটা সিগারেট ধরায়। মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া পাক খাইয়ে খাইয়ে গোটা কতক রিংয়ের মত করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে লালটুস বলল, এসব তুমি বুঝবে না।

পলা কথা খুঁজে পায় না। লালটুস একজন চিন্তাশীল মানুষের মত করে আবার বলে, এসব রাজনীতির গোলমাল। রাজনীতি করতে এসে যে ঠিক ঠিক রাজনীতি করতে পারবে না, তাকে মরতেই হয়, সে মৃত্যু নিজের দলের হাতে না বিপক্ষ দলের হাতে সেটা বড় কথা নয়, মোদ্দাকথা, মৃত্যু।...

গড় গড় করে কথা বলে যাচ্ছিল লালটুস। পলা সব কথা বুঝতে পারছিল না, কিছু কথা পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কিছু কথা মনে হচ্ছিল মাথায় ঢুকতে চায় না। কিছু দিন আগে শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে উত্তাল এক আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল। আসামে বিদেশী খেদাও আন্দোলনের নামে বাঙালী নির্যাতন এবং বাঙালী খেদাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেটা ছিল ভয়াবহ এক আন্দোলন। সেদিনও লালটুস পলাকে বুঝিয়ে দিল, আসামমুখী সমস্ত রুটের অর্থনৈতিক অবরোধ আন্দোলনই একমাত্র নির্যাতিত বাঙালীদের বাঁচার উপায়। আলিপুর দুয়ার জং, যশো ডাঙ্গা, ডাঙ্গি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া বাঙালীদের চোখে না দেখলে,...ইত্যাদি ইত্যাদি। সে দিনের অবরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহন করে লালটুস একটা রাতের জন্য কয়েদখানায় থেকে নিজের রাজনৈতিক জৌলুস বাড়িয়ে নিয়েছিল। সেদিন পলা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিল ওর জীবনে লালটুস কতটা বেশী অপরিহার্য। পরের দিন ছাড়া পেয়েই লালটুস ছুটে এসেছিল পলার সংগে দেখা করতে। সারা রাত কেঁদে কেঁদে পলার চোখ লাল। বলেছিল, তুমি কথা দাও। ওসব ঝামেলায়

আর কখনো নিজেকে জড়াবে না।

লালটুস পলার মাথায় হাত রেখে ওকে বুঝিয়ে ছিল, তা হয় না পলা, এসব নিয়েই তো বেঁচে আছি আজকাল। রাজনীতি জীবন থেকে সরিয়ে দিলে আমাদের এই জীবনে থাকেটা কী? প্রত্যেক মানুষকে একটা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তা না হলে তো সে মানুষটা মরেই গেল, ও ভাবে বেঁচে থাকা যায়?···

লালটুসের জবাবদিহি পলাকে খুশী করে, থামিয়ে দেয়। সত্যিই তো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে কিছু একটা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। ওর দিদিমা বেঁচে আছে মৃত্যুর অপেক্ষা নিয়ে, মা বেঁচে আছে বাবার অত্যাচারের দাহ নিয়ে, ভাইরা বেঁচে আছে বারোয়ারী পূজোর সেক্রেটারী হওয়া নিয়ে, ওর বাবা বেঁচে আছেন (?) রাজাভাত খাওয়ার গভীর জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ারগুলোর সংগে মিলে মিশে। পলার বুক কেঁপে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয়, ওর নিঃশব্দ প্রশ্ন—আমাদের এতোগুলো ভাই বোনের কি দরকার ছিল বাবার সংসারে। পলার মনে পড়ে সেদিনের মার কথাটা: তোদের বাবাকে ফেরাতেই শুধু আমি হেরেছি জীবন ভর, যখন যা বলেছেন, আমাকে যখন যেভাবে চেয়েছেন আমি শুধু নিষ্প্রাণ একটা কাঠের বিবর্ণ পুতুলের মতো করে সেই ভূমিকায় অভিনয় করে গেছি।······পলা ভাবে, ওদের চাপা ঘরটা এই শহরের একটা ডাস্টবিন, ওরা সবাই ডাস্টবিনে ভর্তি আবর্জনা বিশেষ।

পলার বুকে কি এক অব্যক্ত অনুভূতির রিণ্‌রিণ্‌ শব্দ ওঠে। লালটুসকে ছেড়ে পৃথিবীতে ও একা, এখানেই ওর বেঁচে থাকা, এখানেই ওর মরে যাওয়া।

ওরা দু'জন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে পৌঁছাল। সন্ধ্যা তখন শেষ হয়ে রাত ছুঁই ছুঁই। স্টেশনটা ফাঁকা ফাঁকা, জনমানব শূন্য। গাড়ীর সময় আবার প্লাটফর্ম ভরে উঠবে। এখন প্লাটফর্মের মাথায় একটা বেঞ্চে বসে একটু গল্প করা যাক। নির্বাক ওরা দু'জন গিয়ে বসলো একটা ফাঁকা বেঞ্চে। লালটুস আর একটা সিগারেট ধরায়। ফুরফুরে শীতল হাওয়া বইছে। পলার কাছে আরো কিছুটা ঘনিষ্ট হয়ে বসলো লালটুস। সামনেটা দিয়ে একজোড়া ছেলে মেয়ে উচ্ছল হাসিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে চলে গেল। হাতে একটা পকেট ট্রানজিস্টর। সংবাদ শেষ হয়ে নাটক শুরু হয়েছে। নায়কের আবেগময় কণ্ঠ গমগম করে উঠলো: জীবনে আমি বকুল ফুলের গন্ধ পেতে চাই নন্দা,······লালটুস পলার চোখোচোখি হয়ে মুখটিপে হাসলো। 'অসভ্য!' বলে পলা লজ্জা লজ্জা হাসলো। লালটুস একথা সে কথা বলছিল, পলা টুকটাক জবাব দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে লালটুসের বেফাঁস ঠাট্টা তামাসায় পলার মুখটা লাল হয়ে উঠছিল। পলা বলল: তুমি চুপ করবে?

লালটুস চুপ করলো। পলার হাতটা ওর মুঠোয় টেনে নিল। পলা বাধা দেয় না। শুধু কুঁচকে লালটুসের মতিগতি লক্ষ্য করে। একটা স্টীম এঞ্জিনের ট্রেন বাতি ফেলে হু হু করে ষ্টেশনে ঢুকছে। লালটুস বলল, গৌহাটী থেকে এলো।

পলা বলল, নিউ জলপাইগুড়ি যাবে?

লালটুসের সংক্ষিপ্ত জবাব, হুঁ।

গাড়িটা এসে ওদের সামনে থামতেই লোকজনের ওঠা নামার ব্যস্ততা, হকারদের নিজ নিজ পণ্য সামগ্রীর গুণগান মুখস্থ বলতে চীৎকার, কুলিদের হাঁকডাক, নিমেষের মধ্যে ষ্টেশনটাকে কেমন সরগরম করে তোলে। ঝিমমেরে দাঁড়িয়ে থাকা ষ্টেশনটা মুহূর্তেই বেঁচে ওঠে। গাড়ীটা ছেড়ে গেল এইমাত্র। ষ্টেশনটা আবার নিঃসীম শূন্যতায় ভরে ওঠে একটু একটু করে। লালটুস পলাকে লক্ষ্য করে। দেখে পলার কপালে অসংখ্য দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। ওর মুখাবয়বের সর্বক্ষণের দীপ্ত অলৌকিক ভঙ্গিমায় নিভে যাচ্ছে। লালটুস বুঝতে পারে, সেদিনের কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্তু লালটুসের কিইবা করার ছিল ঐ মুহূর্তে। পলা বাধা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওর প্রতিবোধটা যথাযথ হলে লালটুসের পক্ষে কখনোই অমন আগ্নেয়গিরির মুখোমুখি হয়ে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হতো না। পলার মত লালটুসেরও এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা হয়, কিন্তু পলার চিন্তা ভাবনাটা গভীর এবং ভয়ঙ্কর কিছু। ও কেমন অবিশ্বাস্য ভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। পলা ওর ভিতরকার ঝড ঝন্ঝার সূতো টেনে ধরে আবার বলে, কিগো তুমি যে কিছুই বলছো না।

লালটুস ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বরে জবাব দেয়, কি বলবো বুঝতে পারছি না। ফায়ার ব্রিগেডের চাকরীটা হয় হয় করেও হচ্ছে না যে।

'কেন?' পলার চোখে জিজ্ঞাসু চাউনি। ওর কণ্ঠস্বর কেমন ভিক্ষুকের মত শোনায়।

লালটুস মুখ ঘুরিয়ে বলে, পুলিশ ভেরিফিকেশনে এসে ফাইলটা আটকে গেছে। শালাদের খাতায় আমি নাকি খুনী, সমাজবিরোধী।......পলার বুকে ভূমিকম্প। দুরু দুরু করে বুকটা কেঁপেই চলে।

একটা চাওয়ালাকে ডাকে লালটুস। বলে, চা খাও। আজ যেন ঠাণ্ডাটা বেশ সাজগোজ করে আসছে। পলা কিছু বলে না, হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাড়টা টেনে নিয়ে আলগোছে চুমুক দেয়। লালটুস দেখে ঘন কুয়াশায় শিলিগুড়ি শহর ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ষ্টেশনের ওপাশের রাস্তাটা দিয়ে একটা ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ী ঢং ঢং ঘন্টা বাজাতে বাজাতে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল। কোথাও আগুন লেগেছে

হয়তো। পলা চা খাওয়া শেষ করে বলে, একটা কিছু তো ব্যবস্থা করতে হবে, এরপর আমি আর বাড়ীর বাইরে বেরুতে পারবো ? কোন্ মুখে মানুষকে এ মুখ দেখাবো ? আমার তো তখন মৃত্যু।

লালটুস চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয় রেল লাইনের উপর। ভাড়টা ভেঙে গুড়িয়ে গেল। তারপর কেমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। একটু পরে বলে, পলা দেখলে তো, চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ভাড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, আর অমি শূণ্য ভাডটা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গুড়িয়ে গেল। চা শেষ হয়ে গেলে শূণ্য ভাড়টার কিইবা মূল্য, বলো ?……

ঢং ঢং করে রাত ন'টা বাজার শব্দ ভেসে এলো শিলিগুড়ি থানা থেকে। ওরা দু'জন উঠে দাঁড়াল। পাশাপাশি বাড়ী মুখো এগিয়ে চললো প্রাণহীন পুতুলের মত করে। এতদিনের চেনা জানা লালটুসকে অচেনা মনে হয় পলার। কী এক আসন্ন বিপদের ঘন্টা বুকের মধ্যে ক্লান্তিহীন বেজেই চলে ঢং ঢং করে। লালটুস পলার চোখোচোখি হতে পারে না। এই প্রথম লালটুস একটা মানুষকে ভয় পেল, সে পলা। শীতের রাতেও পলার কপালে, নাকের ডগায় সাদা সাদা ঘাম কণিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পলার ভিতরে এক ধরণের বর্ণনাবিহীন ভাঙচুর এবং শব্দহীন তোলপাড় শুরু হয়েছে তাণ্ডব গতিতে, তারই জলছবি পলার সর্বাঙ্গে জ্বল জ্বল করছে। পলা কিছু ভাবতে পারে না। কি করবে বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেই তো ওর মনে হয়েছিল এটাই জীবন, এরই নাম বেঁচে থাকা। কিন্তু এখন তাহলে ওর বুকের মধ্যে এসব কিসের অনুভূতি। মৃত্যুর ? পলা পরিষ্কার বুঝতে পারে, পৃথিবীতে রাজনীতি ছেড়ে কোন মানুষই বাঁচতে পারে না। রাজনীতি করতে এসে যারা ঠিকঠাক রাজনীতি করতে পারবে না তাদের জীবনে অকালমৃত্যু অনিবার্য, অনিবার্য।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারারাত পলা রাতের বয়স বাড়া দেখেছে, ওর বারবারই মনে হচ্ছিল এ রাত ভয়ঙ্কর, এর শেষ নেই। ফুরোয় না। একটা সরল উপলব্ধি পলাকে একটু একটু করে সজাগ করে তুলছিল, পুলিশ ভেরিফিকেশনের রিপোর্টের মতই পলার বারবারমনে হচ্ছিল, লালটুটা শয়তান, খুনী, নিতান্তই সমাজবিরোধী। লালটুসের হাতে অবিশ্বাস্যভাবে খুন হয়ে পলা একজন বীভৎস রক্তাপ্লুত শহীদের মত করে ঘুটঘুটে অন্ধকার ভর্তি ঘরে শুয়ে থাকে। ওর মধ্যে সরল উপলব্ধি, ও তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

দ্রৌপদী

মহাশ্বেতা দেবী

নাম দোপ্‌দি মেঝেন্‌, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্‌ মাঝি (নিহত), নিবাস চেবাখান্‌, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা ...

দুই তকমাধারী য়ুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ।

এক তকমাধারী : সাঁওতালনীর নাম দোপ্‌দি, ক্যান্‌? আমি যে নামের লিষ্টি লইয়া আসছি তাতে ত এমুন নাম নাই? লিষ্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে?

দুই তকমাধারী : দ্রৌপদী মেঝেন। ওর মা যে বছর বাকুলির সূর্য সাহুর (নিহত) বাড়িতে ধানভানারী ছিল, সে বছর ওর জন্ম। সূর্য সাহুর বউ ওর নাম দিয়েছিল।

এক তকমাধারী : অহনকার অপিচাররা জানে ক্যাবল ফশফশাইয়া ইংরাজী লিখতে। হেয়ার নামে এত লিখছে কি?

দুই তকমাধরী : মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআনটেড ইন মেনি...

ড্যাসিয়ের : দুলন্‌ ও দোপ্‌দি দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরা দুজনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তুতঃ এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিসের হাতে সারেণ্ডার না করাতেও। এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপটেন অর্জন সিং প্রভাতে লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমুত্র সত্যই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ব্যাধিও বটে। বহুমুত্র বারোভাতারী। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।

দুলন্‌ ও দোপ্‌দি দীর্ঘদিন নিয়ানডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং

বিশেষ বাহিনী যে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালী সাঁওতাল সাঁওতালনীকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে। ভারতের সংবিধানে জাত-ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষই পবিত্র, তা সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণ ত্রিবিধ: এক—নিখোঁজ দম্পতির আত্মগুপ্তিতে অসামান্য দক্ষতা। দুই—বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারা মনে হওয়া।

বস্তুতঃ, ঝাঁকড়াঝাড় থানার আণ্ডারে (এ ভারতে কেয়োটিও কোনো না কোনো থানার আণ্ডারে) অবস্থিত কুখ্যাত ঝাড়খানী জঙ্গলের চতুষ্পার্শ্বে, এমন কি অগ্নি ও নৈঋত কোণেও, থানা আক্রমণ—বন্দুক অপহরণ (যেহেতু ছেনৃত্তাইপার্টি নির্বিশেষে সুশিক্ষিত নয় সেহেতু বন্দুকের বদলে তারা "চেম্বারটা দিয়ে দিন" বলে)—গোলদার-জোতদার-মহাজন-শান্তিরক্ষক-কাগুজে বাবু ও খোঁচোড হত্যাদিতে অপরাধী বলে যাদের সন্দেহ করা হয় তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত প্রত্যক্ষ দর্শীয় বিবরণীতে জানা যায় বহু পিলে চমকানো কথা। দুই কৃষ্ণাঙ্গ নরনারী ঘটনার আগে সাইরেন চীৎকারে "কুলকুলি" দিয়েছে। কতকগুলি অসত্য, সাঁওতালীদের কাছেও দুর্বোধ্য ভাষায় তারা নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গেয়েছে। যথা :—

"সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে"

এবং

"হেন্‌দে রাম্‌রা কেচে কেচে
পুন্‌ডি রাম্‌রা কেচে কেচে।"

এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় এরাই ক্যাপটেন অর্জন সিংয়ের বহুমূত্রের কারণ। প্রশাসনিক কার্যরীতি সাংখ্যের পুরুষ বা মাকড়া দর্শকের চোখে আন্তোনিওনির আগেকার ফিল্মের মতই দুর্বোধ্য বলে প্রশাসন পুনর্বার অর্জন সিংকেই অপারেশন ফরেস্ট ঝাডখানীতে পাঠায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি দপ্তরের কাছে উক্ত কুলকুলে ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক দাশষয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ "জোম্বি" অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায়, যে নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে "জান্ লে লি" বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়। কি য়ুনিফর্ম, কি গ্রহসাহেব, কেউই তাকে এ অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তারপর প্রিম্যাচিওর ফোর্সড্ রিটায়ারমেন্টের জুজু দেখিয়ে তবে তাকে বাঙালী, প্রৌঢ়, সমর ও বামপন্থী উগ্র রাজনীতি স্পেশালিষ্ট সেনানায়কের টেবিলে

হাজির করা যায়। সেনানায়ক প্রতিপক্ষের কাণ্ডবাণ্ড ও এলেমের দৌড় প্রতিপক্ষের চেয়েও ভাল জানেন। তাই তিনি অর্জন সিংকে প্রথমে শিখ জাতির সমরপ্রতিভা সম্পর্কে স্তুতি জানান পরে বুঝিয়ে দেন, শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলায় বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস ? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল আর্গন থেকে বেরোয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে "পঞ্চ্ ক" অব্দি বিকল ও ব্যর্থ। এ সকল বক্তিমে তিনি অন্যদের কাছেও করেন, ফলে যুধ্যমান বাহিনীর মনে পুনর্বার "আর্মি হ্যানড বুক" কেতাবে আস্থা ফেরে। কেতাবটি সাধারণের জন্য নয়কো। তাতে লেখা আছে, আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন হল সেনামাত্রের পবিত্র কর্তব্য। দোপ্দি ও দুলনা উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে কেন না তারাও টাঙি-হেঁসো-তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়। বস্তুতঃ তাদের আক্কেটি-ক্ষমতা বাবুদের চেয়ে বেশী। সকল বাবু চেম্বার স্ফোটনে বিশারদ হয় না, তারা ভাবে বন্দুক ধরলেই ক্ষমতা আপ্সে বেরোবে। কিন্তু দুলনা ও দোপদি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পরম্পরায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই সেনানায়ককে প্রতিপক্ষ তুচ্ছ মনে করে করে বটে, কিন্তু এ সামান্য মানুষ নয়। ইনি প্র্যাকটিসে যাই করুন, থিওরিতে প্রতিপক্ষের আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন। এইজন্য শ্রদ্ধা করেন, যে "ও কিস্সু নয়, চেংড়ারা বন্দুক লইয়া খেলে" মনোভাব নিয়ে এগোলে ওদের বোঝা যাবে না ও বিনাশ করা যাবে না। ইন্ অর্ডার টু ডেস্ট্রয় এনিমি, বিকাম ওয়ান। তাই তিনি ওদের একজন (থিওরিতে) হয়ে ওদের বোঝেন। এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে লেখালিখির বাসনা রাখেন। তখন (সেই লেখায়) বাবুদের ডিমোলিশ করে দাওয়ালীদের বক্তব্যটিকে হাইলাইট করবেন, এও তিনি ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর মনের এ সকল প্রসেসকে আপাতজটিল মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি খুবই সবল এবং কাউঠার মাংস খেয়ে সেজ ঠাকুরদার মতই তিনিও আনন্দ পান। আসলে তিনি জানেন, প্রাচীন গণনাট্যগীতির মত বরভটে বদল হোগা জমানা। এবং সকল জমানাতেই তাঁর সসম্মানে টেকার মত টিকিটপত্তর চাই। দরকার হলে ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিয়ে দেবেন তিনিই ব্যাপারটি কত ঠিক পার্স্পেকটিভে বুঝেছিলেন। আজ যা যা করছেন তা ভবিষ্যতের মানুষ ভুলে যাবে তাতে তাঁর তিলেক সন্দেহ নেই এবং জমানা হতে জমানায় সবার রঙে রং মেশাতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমানার প্রতিনিধি হতে পারবেন এও তিনি জানেন। আজকে "অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাণ্ড এলিমিনেশন" করে তিনি তরুণদের নিকেশ করছেন বটে কিন্তু মানুষ রক্তের স্মৃতি ও শিক্ষা অচিরে ভুলবে এ তিনি

জানেন। এবং একই সঙ্গে তিনিও শেক্স্পীয়ারের মত তরুণের হাতে পৃথিবীর লিগেসি তুলে দেওয়াতে বিশ্বাসী। তিনিও প্রস্পেরো।

যা হোক, এরপরে জানা যায় বহু যুবক যুবতী ব্যাচ বাই ব্যাচ জীপগাড়ী আরোহণে থানার পর থানা হানা দিয়ে অঞ্চলটিকে যুগপৎ সন্ত্রস্ত ও উল্লাসিত করে ঝাড়খানীর জঙ্গলে বিলীন হয়। যেহেতু বাকুলি থেকে নিখোঁজ হবার পর থেকে দোপ্দি ও দুলনা ও অঞ্চলে প্রায় সকল জোতদার ঘরে কাজ করেছে, সেহেতু তারা হন্তব্যদের বিষয়ে হন্তাদেরকে টপাটপ খবর দেয় এবং সগর্বে ঘোষণা করে তারাও সেনানী, র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল। অবশেষে দুর্ভেদ্য ঝাড়খানী জঙ্গল সেনানী দিয়ে চক্রব্যূহে বেড়ে ফেলা হয়, আর্মি ভেতরে ঢোকে ও রণাভূমি চিরে চিরে পলাতকদের খোঁজে। একই সঙ্গে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা জলপানের অবলম্বন ঝর্ণা ও কুণ্ডীগুলি পাহারা দেয় আড়ালে থেকে, আজও দিচ্ছে, আজও খুঁজছে। তেমনি এক তল্লাসবালে সেনাদের খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়াঁরী দেখতে পায় চ্যাটাল পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে এক সাঁওতাল যুবক মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। সে অবস্থায় তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয় ও ৩০৩র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দুহাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে"মা—— হো" বলে সফেন রক্ত উদ্গীরণ করে নিশ্চল হয় পরে বোঝা যায় সেই কুখ্যাত দুলন্ মাঝি।

এই "মা——হো" শব্দটির মানে কি? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী শ্লোগান? এর মানে কি তা ভেবে শান্তিরক্ষক-দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁর হফম্যান-জেফার গোল্ডেন-পামার প্রমুখ মহদাশয়দের রচিত অভিধান নিয়ে গলদ্ঘর্ম হতে থাকেন। অবশেষে সর্বজ্ঞ সেনানায়ক চমরুকে ডাকেন। ক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু দুই বিশেষজ্ঞকে দেখে ফুচফুচিয়ে হাসে। বিড়ি দিয়ে কান চুলকোয় ও বলে' উটি মালদর সাঁওতালরা সেই গাঁধীরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। তা হেথা কোন্ বেটা "মা—হো" বলল বেটে? মালদ হতে কেউ এল?

সমস্যা ফরসা হয়। তারপর দুলনের শবদেহ উক্ত পাথরে ফেলে রেখে সেনারা সবুজ উর্দির কামোফ্লাজে গাছে গাছে চড়ে দেবতা প্যানের মত গাছের সপত্র ডাল আলিঙ্গনে বেঁধে অসভ্য জায়গায় কাঠপিঁপড়ের সন্ধানী কামড় খেতে খেতে অপেক্ষা করে। দেখে মৃতদেহ নিতে কেউ আসে কি না। এটি শিকার পদ্ধতি যেমন, যুদ্ধের পদ্ধতি তেমন নয়। কিন্তু সেনানায়ক জানেন, কোন চেনা-জানা পদ্ধতিতেই এ খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তাই তিনি মাড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে

টেনে আনতে বলেন। তিনি বলেন, সব ফরসা হয়ে যাবে। যে সব গান গেয়েছে দোপ্‌দি তার মানেও বের করে ফেললাম বলে।

তাঁর কথা শিরোধার্য করে সেনারা তৎপর হয়! কিন্তু দুলনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসে না। উপরন্তু রাতের আঁধারে খচরমচর্ শুনে সেনারা গুলি ছুঁড়ে নেমে এসে দেখে তারা শুকনো পাতার বিছানায় সঙ্গমরত শজারু দম্পতিকে মেরেছে। জঙ্গলে সেনাদের পথ চেনাবার খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী অসংসারীর মত দুলন্-সংশ্লিষ্ট বকশিস না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়। দুলনের লাশ বয়ে আনতে আনতে সেনারা লাশভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত কাঠপিঁপড়েদের কামড়ে আশীবিষের যন্ত্রণা প'য়। লাশ নিতে "কোই ন আয়া" শুনে সেনানায়ক পেপার-ব্যাকের অ্যান্টিফাসিস্ত্ "ডেপুটি" কেতাবটি চাপড়ে "হোআট" বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং তখনি আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মত ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে উঠেন, সার। ওই হেনূদে রামূত্রা কথাগুলোর মানে বের করে ফেলেছি। ওগুলো মুণ্ডারী ল্যাংগোয়েজ।

অতএব দোপ্‌দির খোঁজ চলতে থাকে। ঝাড়খানী জঙ্গল বেল্টে অপারেশন চলেছে—চলছে—চলবে। ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোড়া। সিদ্ধমলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়। প্রথম ফেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পটাপট ধরা পড়ে ও সম্মুখ সংঘর্ষে গাছে বাঁধা হয়ে মরে। সম্মুখ সংঘর্ষের নিয়মে তাদের শরীরে করদাতার খরচের শ্রাদ্ধ করে গুলি বেঁধানো হয়। সম্মুখ সংঘর্ষেব নিয়মে তাদের শরীরের চক্ষুগোলক-পৌষ্টিকনালী-পাকস্থলী-হৃৎপিণ্ড-জনন স্থান প্রভৃতি শেয়াল-শকুন-হায়েনা-বনবিড়াল-পিঁপড়ে ও কৃমির খাদ্য হয় এবং নির্মাংস শুভ্র কঙ্কাল নিয়ে ডোমরা সানন্দে বেচতে যায়।

পরবর্তী ফেজে তারা সম্মুখ সংঘর্ষে ধরা দেয় না। তাতে মনে হচ্ছে তারা কোনো একজন বিশ্বস্ত ক্যুরিয়ারকে পেয়েছে। সেযে দোপ্‌দি, সে সম্ভাবনা টাকায় নব্বই পয়সা। দোপ্‌দি দুলন্‌কে রক্তাধিক ভালবাসত। এখন সেই ওদের বাঁচাচ্ছে নিশ্চয়।

"ওদের" কথাটিও হাইপোথেসিস্।

কেন?

ওরিজিনালি কতজন গিয়েছিল?

উত্তর নীরবতা। সে বিষয়ে বহু গল্প উড্ডীয়মান, বহু কেতাব যন্ত্রস্থ। সব কথা বিশ্বাস না করাই ভাল।

ছয় বছরে কতজন সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত?

উত্তর নীরবতা।

সম্মুখ সংঘর্ষের পর কঙ্কালসমূহের হাত ভাঙা বা কাটা কেন? নুলোরা কি সম্মুখ সংঘর্ষ করতে পারে? কণ্ঠাস্থি লটরপটর, পা ও পাঁজরের অস্থি চূর্ণিত কেন?

উত্তর দুরকম। নীরবতা। চোখে অভিমানী তিরস্কার, ছিঃ। এসব কথা কি কইতে আছে? যা হবার তা তো…

এখনো কতজন জঙ্গলে আছে?

উত্তর নীরবতা।

তারা কি এক লিজিয়ন? তাদের কারণে করদাতাদের খরচে একটি বড় বাহিণী হামেহাল ওই জঙ্গলের বন্য পরিবেশে মোতায়েন রাখা কি জাস্‌টিফায়েড?

উত্তর: অবজেকশন। "বন্য পরিবেশ" কথাটি ঠিক নয়। মোতায়েন বাহিণী সুষম খাদ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থা-যথা ধর্ম মতে অনুষ্ঠানের সুবিধা-বিবিধ ভারতী শোনা ও "ইয়ে হ্যায় জিন্দ্‌গী" ফিল্‌মে সঞ্জীবকুমার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দেখার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। না। পরিবেশ "বন্য" নয়।

· কতজন আছে?

উত্তর নীরবতা।

কতজন আছে? অ্যাট অল কেউ আছে কি?

উত্তর দীর্ঘ।

যথা: ওয়েল, অ্যাকশন হচ্ছে। মহাজন-জোতদার-গোলদার-শুঁড়ি-বেশ্যালয়ের বেনামী মালিক-অতীতের খোঁচোড়, এরা আজও সন্ত্রস্ত। নিরন্ন নেংটেরা আজও উদ্ধত ও অনমনীয়। দাওয়ালরা কোনো কোনো পকেটে বেটার ওয়েজ পাচ্ছে। পলাতকদের প্রতি সহানুভূতিশীল গ্রামগুলি আজও নীরব ও বিদ্বেষী। এইসব ঘটনাবলী থেকে মনে করার কারণ আছে……

এ ছবিতে দোপ্‌দি মেঝেন্‌ কোথায় বসে?

সে নিশ্চয় পলাতকদের সঙ্গে সামিল আছে। ভয়ের কথা অন্যত্র। যারা আছে, তারা দীর্ঘদিন জঙ্গলের আদিম জগতে আছে। সাহচর্য করছে দরিদ্র দাওয়াল ও আদিবাসীদের সঙ্গে। এই সাহচর্যের ফলে তারা নিশ্চয় কেতাবী শিক্ষা ভুলে মেরে দিয়েছে। যে মাটিতে থাকছে, তার সঙ্গে হয়তো কেতাবী শিক্ষা ওরিয়েন্টেশন করে নতুন সংগ্রাম পদ্ধতি ও বাঁচবার নিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবী শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতেকলমে কাজ করছে যারা তারা অত সহজে নিকেশ হবার নয়।

অতএব অপারেশন ঝাড়খানী ফরেস্ট থামতে পারে না। কারণ, আর্মি হ্যানড্‌বুকের সাবধান বাণী।

২

দোপ্‌দি মেঝেনকে ধর। সে ওদের ধরিয়ে দেবে।

দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বেঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চলছিল। মুসাই টুডুর বউ ভাত রেঁধে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেয়। ভাত জুড়োলে দোপ্‌দি পেটকাপড়ে ভাত বাঁধে ও ধীরে ধীরে চলে। চলতে চলতে ও মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ডাঙর বের করে মারছিল। একটু কেরোসিন পেলে মাথায় ঘষে দিলে উকুন নিকেশ হয়। তারপর সোডা দিয়ে মাথা ঘষে ফেলা যায়। কিন্তু হারামীরা ঝর্ণার বাঁকে বাঁকে খেপ মারে। জলে কেরাসিনের বাস পেলে ওরা গন্ধেগন্ধে চলে আসবে।

দোপ্‌দি!

দোপ্‌দি সাড়া দিল না স্বনামে ডাকলে কখনোই সাড়া দেয় না ও। ওর নামে বখশিস ঘোষণার কাগজটা ও আজই পঞ্চায়েত অপিসে দেখে এসেছে। মুসাই টুডুর বউ বলছিল, উ কি দেখিস? কুথাকার কে দোপ্‌দি মেঝান। তারে ধরা করালে টাকা।

কত টাকা?

দু—শো!

হাই গ!

বেরিয়ে এসে মুসাইয়ের বউ বলল। ইবার সাজসাজন্ খুব। স—ব নতুন পুলুস।

হুঁ।

তু আসিস না আর।

কেনে?

মুসাইয়ের বউ চোখ নামিয়ে বলল। টুডু বলে সি সাহেবটো আবার এসেছে। তোরে ধরলে গাঁ-বসত…

আবার জ্বালাই দিবে।

হুঁ। আর দুখীরামের কথাটো ··

সাহেব জেনেছে?

সোমাই আর বুধনা হারামী করল।

তারা কুথা?

টেন চেপে পলাল।

দোপ্দি কি ভেবে নিল। তারপর বলল, ঘর যা। কি হবে জানি না, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না।

তু পলাতে পারিস না?

নাঃ। কতবার পলাব বল্? ধরলে বা কি করবে বল? কাঁউটার করে দিবে, দিক।

মুসাইয়ের বউ বলল, মোদের আর কুথা যাবার নাই।

দোপ্দি আস্তে বলল, কারো নাম বলব না।

দোপ্দি জানে, এতদিনে শুনে শুনে শিখেছে, কেমন করে নির্যাতনের সঙ্গে মুকাবিলা করা যায়। যদি নির্যাতনে নির্যাতনে শরীর ও মন ভেঙে পড়ে তখন দোপ্দি নিজের জিভ দাঁতে কেটে ফেলবে। সেই ছেলেটা কেটে ফেলেছিল নিজের জিভ। তাকে কাঁউটার করে দিল। কাঁউটার করে দিলে তোমার হাত থাকে পেছনে বাঁধা। শরীরের প্রতিটি হাড় থাকে চূর্ণ, যৌনাঙ্গে ভীষণ ক্ষত।—কিল্ড বাই পোলিস ইন অ্যান এনকাউন্টার···আননোন্ মেল্···এজ টুয়েন্টি টু···

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলতে চলতে দোপ্দি শুনল কে তাকে ডাকছে, দোপ্দি!

সাড়া দিল না ও। স্বনামে ডাকলে ও সাড়া দেয় না। এখানে ওর নাম উপী মেঝেন্। কিন্তু কে ডাকে?

ওর মনে নিরন্তর সন্দেহের কাঁটা গুটিয়ে থাকে। "দোপ্দি" শুনে সন্দেহের ধারাল কাঁটা শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ও মনে মনে চেনা মুখের ফিল্ম রোল খুলে চলল। কে? সোমরা নয়, সোমরা পলাতক। সোমাই আর বুধ্না পলাতক, অন্য কারণে। গোলক নয়, সে বাকুলিতে আছে। এ বাকুলির কেউ? বাকুলি ছেড়ে বেরোবার পর থেকে তার ও দুল্নার নাম হয়েছিল উপী মেঝেন, মাতং মঝি। এখানে এক মুসাই আর তার বউ ছাড়া ওর আসল নাম কেউ জানে না। বাবু ছেলেদের মধ্যে আগেকার ব্যাচের সবাই জানত না।

সে সময়টা বড় গোলমেলে। দোপ্দির ভাবতে গেলে গোলমাল লাগে। বাকুলিতে অপারেশন বাকুলি। সূর্য সাউ বিড্ডিবাবুর সঙ্গে ষড় করে দু'বছরে বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটো টিউবওয়েল বসাল, কুয়ো খুঁড়ল তিনটে। কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল, কাকের চোখের মত নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও, জ্বলে গেল সব।

টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কি লাভ ?

জ্বলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েতী বদমাশি আমি মানি না। জল লিয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, যাঃ তোদের তরে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

কি ভাল কাজ করলা তুমি ?

জল দিই নাই গ্রামকে ?

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়েছ।

তোরা জল পাস না ?

নাঃ। ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্যসহ্য সহজে জ্বলে। গ্রামের সতীশ-যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গোরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য সাউ। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। দুলনা বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই।

দোপদি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, 'ওর চোখ আমি উপড়াব।

সূর্য সাউ। তারপর সিউড়ি থেকে টেলিগ্রাফিক মেসেজ স্পেশাল ট্রেন। আর্মি। জীপ বাকুলি অব্দি আসেনি। মার্চ-মার্চ-মার্চ। নালপরা বুটের নিচে কাঁকরের ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ। কর্ডন আপ। মাইকে আদেশ। যুগল মণ্ডল-সতীশ মণ্ডল-রানা অ্যালায়াস-প্রবীর অ্যালায়াস দীপক-দুলনা মাঝি-দোপদি মেঝেন-সারেণ্ডার, সারেণ্ডার, সারেণ্ডার। নো সারেণ্ডার। মো—মো—মো ডাউন দি ভিলেজ। খটাখট—খটখট—বাতাসে কর্ডাইট—খটখট—রাউণ্ড দি ব্লক—খটখট। ফ্লেম থ্রোআর। বাকুলি জ্বলছে। মোর মেন অ্যান্ড উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন…ফায়ার—ফায়ার। ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ। ওভার-ওভার-ওভার বাই নাইটকল। দোপদি আর দুলনা বুকে হেঁটে পালিয়েছিল।

বাকুলির পর পলতাকুড়িতে ওরা পৌঁছতে পারত না। ভূপতি আর তপা নিয়ে যায়। তারপর ঠিক হয় দোপদি ও দুলনা ঝাড়খানী বেলটের আশে পাশে কাজ করবে। দুলনা দোপদিকে বুঝিয়েছিল, এই ভাল রে। এতে আমাদের

ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না। কিন্তু কে বলতে পারে একদিন জোতদার-মহাজন-পুলিস সব নিশ্চিহ্ন হবে না?

কিন্তু আজ ওকে পেছন থেকে কে ডাকল?

দোপ্‌দি হাঁটতে থাকল। গ্রাম-প্রান্তর-ঝোপঝাড় ও খোয়াই-পি. ডব্লু, ডির থাম্‌বা—পেছনে ছুটে আমার শব্দ। একজনই আসছে। ঝাড়খানীর জঙ্গল এখনো ক্রোশ খানেক। এখন ওর মনে হল জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলে বাঁচে। ওদের বলতে হবে পুলিস আবার তার নামে নুটিস দিয়েছে। বলতে হবে সেই হারামী সায়েব আবার এসেছে। হাইড-আউট পালটাতে হবে। তাছাড়া, সান্দারাতে খেতমজুরদের টাকা দেওয়া নিয়ে যে গণ্ডগোল হয়, তারপর সেখানে লক্ষ্মী বেরা, নারাণ বেরাকে সূর্য সাউ করে দেবার প্ল্যানও নাকচ করতে হবে। সোমাই ও বুধ্‌না সবই জানত। দোপ্‌দির বুকের নিচে ভীষণ বিপদের আর্জেন্সি। ওর এখন মনে হল সোমাই ও বুধ্‌না যে হারামী করবে তাতে সাঁওতাল হয়ে ওর লজ্জার কিছু নেই। দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাবুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপ্‌দির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলা মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিণ সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস্‌ রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামী করে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। শব্দ ও দোপ্‌দির মাঝে ব্যবধান এক থাবছে। কোঁচড়ে হাত, কসিতে গোঁজা তামাক পাতা। অরিজিত, মালিনী, শামু, মন্টু কেউ বিড়ি সিগারেট চা খায় না। তামাক পাতা ও চুন। কসিতে কাগজের মোড়কে গোঁজা আলকুশির বীজ থেঁতো। বিছে কামড়ালে অব্যর্থ ওষুধ। কিছুই দেওয়া যাবে না।

দোপ্‌দি বাঁ-দিকে ঘুরল। এদিকে ক্যাম্প। দু মাইল দূরে। বনের পথ নয় এটা। কিন্তু পেছনে খোঁচোড় নিয়ে দোপ্‌দি বনে যাবে না।

জান কসম। জা—হান্‌ কসম্‌ দুলনা। দুলনা, জান ক—সম্‌। কিছুই বলা হবে না।

পায়ের শব্দ বাঁ দিকে ঘুরল। দোপ্‌দি কোমরে হাত দিল। হাতের তেলোয় বাঁকা চাঁদের আশ্বাস। হেঁসোর বাচ্চা। ঝাড়খানীর কামাররা গড়ে ভাল। এমন শা—হান্‌ দিয়ে দিব উপী, যে শত দুখীরামরে—। দোপ্‌দি ভাগ্যে বাবু হতে যায়নি। বরঞ্চ ওরাই বুঝেছে সব চেয়ে ভালো কাস্তে হেঁসো টাঙি ছুরি। নীরবে কাজ সারে। দূরে ক্যাম্পের আলো। দোপ্‌দি সেদিকে যা যাচ্ছে কেন?

দাঁড়া তুই, ফিন বাঁক ঘুরো যাই। আঃ—হা। রাতভোর আমি চক্ষু মুদে ঘুরো বুলতে পারি। জঙ্গলে যাব না, পথ হারাব না। দম ছুটবে না। তু শালো খোঁচোড়, জাহানের মায়ায় মরিস, তু ঘুরবি? দম ছুট্যায়ে তোরে গাড়ায় ফেলে নিকাশ করে দিব।

কিছুই বলা হবে না। নতুন ক্যাম্প দেখে এসেছে দোপ্দি, বাস স্টেশনে বসে গল্প করে বিড়ি টেনে জেনে এসেছে কত কনভয় পুলিস এল, কটা ওয়্যারলেস ভ্যান। ডিংলা চার, পিয়াজ সাত, লঙ্কা পঞ্চাশ সিধা হিসাব। কিছুই জানানো যাবে না। ওরা নিশ্চয় বুঝে নেবে দোপ্দি মেঝেন্ কাঁউটার হয়ে খেল্ছে। তখন পলাবে। অরিজিতের গলা, যদি কেউ ধরা পড়ে, টাইম বুঝে অন্যরা হাইড-আউট চেন্জ করবে। কমরেড দোপ্দি যদি দেরি করে আসে, আমরা এখানে থাকছি না। কোথায় যাচ্ছি, নিশানী থাকছে। কোনো কমরেড নিজের জন্যে অন্যদের ডেস্ট্রয়েড হতে দেবে না।

অরিজিতের গলা। জলের কুলকুল শব্দ। পাথর তুলে নিচে রাখা কাঠের টুকরোর তীর ফলা-মুখ যেদিকে, সেদিকের হাইড আউটে যাওয়া হয়েছে।

এটা দোপ্দির পছন্দ, বোধায়ত্ত। দুলনা মরে গেল, কারুকে মেরে মরেনি বাবা। প্রথম থেকে এসব মাথায় জারায়নি বলে এ-ওর জন্যে হামলাতে গিয়ে কাঁউটার হতিস্। এখন অনেক নির্মম নিয়ম, সহজ ও বোধ্য। দোপ্দি ফিরল, ভালো, ফিরল না, ব্যাড। চেইন্জ হাইড-আউট। নিশানী এমন হবে, অপোজিশন দেখতে পাবে না, দেখলে বুঝবে না।

পেছনে পায়ের শব্দ। দোপ্দি আবার ঘুরল। এই সাড়ে তিন মাইল বিস্তীর্ণ ডাঙা ও খোয়াই জঙ্গলে ঢোকার প্রকৃষ্ট পথ। দোপ্দি সে পথ পেছনে রেখে এসেছে। সামনে খানিকটা সমতল। তারপর আবার খোয়াই এত উঁচু-নিচুতে কখনো আর্মি ক্যাম্প ফেলেনি। এদিকটা নির্জন। ভুলভুলাইয়া। বাঘাগুগ্গুলি ইটা বেটে, সকল ঢিবা সকল ঢিবার মত দেখতে। ঠিক আছে দোপ্দি ফেউটাকে গোঁসানে নিয়ে তুলবে। সারান্দার পতিতপাবনকে তো শ্মশানকালীর নামে বলি দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাপ্রিহেনড!

ঢিবাগুলির একটা উঠে দাঁড়াল। আরেকটা। আরেকটা। প্রৌঢ় সেনানায়ক যুগপৎ আনন্দিত ও নিরাস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেস্ট্রয় এনিমি' বিকাম ওয়ান। তিনি তা হয়েছিলেন। ছ বছর আগেও উনি ওদের প্রতিটি মুভ অ্যান্টিসিপেট

করতে পারতেন, এখনও পারছেন, আনন্দ। সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখার ফলে "ফার্সট ব্লাড" পড়েও তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের সমর্থন, দেখেছেন।

দোপ্দি তাঁতে ধাপ্পা দিতে পারল না, দুঃখ নিরাশা। কারণ দ্বিবিধ। ছ বছর আগে মস্তিষ্ক-কোষে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেখা তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তিনি প্রমাণ রেখেছেন, তিনি এ সংগ্রামের সমর্থক, দাওয়ালীদের পরিপ্রেক্ষিতে। দোপ্দি দাওয়ালী। ভেটেরান ফাইটার। সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় দোপ্দি যেখেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হতে চলেছে। ডেস্ট্রয়েড হবে। দুঃখ।

হল্ট।

দোপ্দির থমকে দাঁড়াল। পেছনের পদশব্দ ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল। দোপ্দির বুকের নিচে ক্যানালের বাঁধ ভাঙল। সর্বনাশ। সূর্য সাহুর ভাই রোতোনী সাহু। সামনের ঢিবা দুটি এগোল। সোমাই ও বুধ্না। ওরা ট্রেনে পালায়নি।

অরিজিতের গলা, যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে, এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।

দোপ্দি এখন দু'হাত ছড়িয়ে আকাশপানে মুখ তুলে জঙ্গলের দিকে ঘুরে গিয়ে সর্ব সত্তার শক্তি দিয়ে কুলকুলি দিল। একবার, দু বার তিনবার। তৃতীয় কুলকুলিতে ঝাড়খানী জঙ্গলের আঁচলের গাছে পাখিগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল। কুলকুলির প্রতিধ্বনি বহুদূর যায়।

৩

সন্ধ্যা ছটা সাতাশতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হয়। ওকে নিয়ে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে একঘণ্টা। ঠিক একঘণ্টা জেরা চলে। কেউই তার গায়ে হাত দেয় না এবং তাকে ক্যাম্বিসের টুলে বসতে দেওয়া হয়। আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং "ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল" বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কি বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু'হাত দু-খুঁটোয় এবং দু'পা দু'খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কি যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা।

পাছে "জল" বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নিচের ঠোঁট চাপে বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?

ওকে লজ্জা দিয়ে চোখের কোল থেকে জল গড়ায়। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন? চার-পাঁচ ছয়-সাত—তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না।

পাশে চোখ ফিরিয়ে ও সাদা কি যেন দেখে। ওরই কাপড়। আর কিছু দেখে না। সহসা দৈবকৃপা আশা করে ও। সম্ভবত ওকে ফেলে গেছে ওরা। শেয়াল ছিঁড়ে খাবে বলে। কিন্তু ওর কানে আসে পায়ের ঘষটানি। ঘাড় ঘোরায় ও বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো শান্ত্রী ওকে দেখে ও হাসে। চোখ বোজে দ্রৌপদী। অপেক্ষা করতে হয় না বেশিক্ষণ। আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তাপ ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।

তারপর সকাল হয়।

তারপর দ্রৌপদী মেঝেনকে তাঁবুতে আনা হয় ও খড়ের ওপর ফেলা হয়। গায়ের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া হয়।

তারপর ব্রেকফাস্ট, কাগজ পাঠ, রেডিও মেসেজে "দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেনডেড" খবর পাঠানো ইত্যাদি হয়ে গেলে দ্রৌপদী মেঝেনকে নিয়ে আসার হুকুম যায়।

কিন্তু এখন হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু হয়।

"চল্" বলতেই উঠে বসে দ্রৌপদী ও জিজ্ঞাসা করে, কুথাক যেতে বলছিস?

বড় সাহেবের তাঁবুতে।

তাঁবু কুথাক?

হুই।

দ্রৌপদী লাল চোখ ঘোঁচ করে অদূরে তাঁবু দেখে। বলে, চল্, যেছি আমি।

শান্ত্রী জলের ঘটি এগিয়ে দেয়।

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়। জলের ঘটি মাটিতে ঢালে উপুড় করে। কাপড়টি দাঁতে ধরে টেনে টেনে ছেঁড়ে। শান্ত্রী এবম্বিধ আচরণ দেখে, বাউরা হো গিয়া—বলে ছুটে হুকুম আনতে যায়। সে নিয়ে যেতে পারে কয়েদীকে, কিন্তু কয়েদী দুর্বোধ্য

আচরণ করলে কি করবে তা সে জানে না। তাই ওপরওলাকে শুধোতে যায়।

জেলে পাগলাঘন্টি পড়লে যেমন হয়, তেমনি ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা মাথায় হেঁটে তার দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত শান্ত্রীরা তার কিছু তফাতে।

এ কি? বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান।

দ্রৌপদী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষত।

এ কি? তিনি ধমকাতে যান।

দ্রৌপদী আরো কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাঁধানের মানুষ, দোপ্‌দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যোছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?

কাপড় কই ওর কাপড?—

পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।

দ্রৌপদীর কালো শরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনা-নায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর্‌ লেঃ, কাঁউটার কর্‌—?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।

সুখ দুঃখের খেলা

প্রদীপ দে

ব্রজনাথ বৈরাগীকে কে না চেনে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করাই তার কাজ। যে দেয় দিল, না দিলে হাসি মুখে বিদেয় হয়। রাগ, দুঃখ অনুতাপ কিংবা অনুশোচনা ও সবের বালাই নেই। আর সেজন্যেই গ্রামের লোকের প্রিয় সে। কেউ যদি প্রশ্ন করে গোঁসাই, তোমার আপন বলতে কেউ নেই? অমনি একতারা বাজিয়ে জবাব দেয়—"এসেছি একা ভবে, সঙ্গী আমার কে হবে গো। তোমরা আমার আপন জনা, আর কেউ নেই ভবে।"

সত্যি ব্রজনাথের আপন বলতে, মানে যাকে বলে প্রিয়জন সে রকম কেউ ত্রিসংসারে নেই, সবাই জানে, ছিলও না কোনদিন। কিন্তু সত্যি কি কেউ ছিল না? তাই যদি হবে তবে কেন ব্রজনাথ গানের মধ্যে মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে—"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাধিনু, বিধিনিল হরি তায়। অভাগা বাউল পথে পথে ঘোরে সুজন পাবার আশায় ·····"

চণ্ডীতলার বোষ্টমী ক্ষেমা সুন্দরী সময় পেলেই ওকে ডেকে অনেক সুখ দুঃখের কথা বলে। ক্ষেমা সুন্দরী রূপে সুন্দর না হলেও আচারে ব্যবহারে গানের গলায় সত্যিই সুন্দরী। ছোট বেলায় মালা চন্দন হয়েছিল চণ্ডীতলার রামচরণ বৈরাগীর সঙ্গে, তখন চণ্ডীতলার বেশ নাম ডাক ছিল। প্রতিদিন যেন মেলা লেগেই থাকতো। ক্ষেমা সেই সব দিনগুলোকে যখন ভাবতে যায় তখন দু'চোখ বেয়ে যমুনার ধারা নেমে আসে। ভাবতেই পারিনি সেই সব সুখের দিনগুলো একদিন তার কাছে স্বপ্ন হয়ে থাকবে। সুখ বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, তাই না ব্রজনাথদা···· ··· ?

এবার ব্রজনাথ গান গেয়ে জবাব দেয়—"রাতের আঁধার সঙ্গী যার সই—দিনের নাগাল পায় সে কৈ। দুঃখে আমার জনম যে হায় সুখের নাগাল পায়না তাই"···

আর কেউ না জানলেও ক্ষেমা জানে ব্রজনাথের দুঃখ কোথায়। এক গ্রামেই ওদের বাস ছিল। বলতে গেলে পাশাপাশি বাড়ি। ব্রজনাথ যখন সংসার পেতে ছিল তখন ক্ষেমা অনেক ছোট। মনে মনে খুবই শ্রদ্ধা করতো ব্রজনাথকে। ব্রজনাথ ছোট বেলা থেকেই গান গাইত ভাল। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম তার পছন্দ ছিল

না। তাই বাড়ির সবাই যখন রাধা গোবিন্দের আখড়ায় সংকীর্ত্তনে বিভোর থাকতো ব্রজনাথ তখন চলে যেতো নদীর ধারে। প্রকৃতিকে দেখে দেখে বিভোর হয়ে আপন মনে গান জুড়ে দিত। কখন যে বেলা গড়িয়ে রাত নেমে আসতো সে টের পেতোনা। টের পেতো একজন, তবে খুব গোপনে। সন্ধ্যায় জল আনতে গিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষেমা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতো। যখন হঠাৎ খেয়াল হতো যে তার জন্য সন্ধা পূজার দেরী হয়ে যাচ্ছে তখন পড়ি কি মরি করে বাড়ীতে আসতো, সেজন্য অনেক দিন গালমন্দও কম খেতে হয়নি। তবু যেই তিমিরে সেই তিমিরে। কিন্তু যার গান শুনতে ক্ষেমা এত পাগল সে কিন্তু কোন দিন ফিরেও তাকাতো না। যদি কখনো ওদের বাড়িতে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতো তখন ব্যঙ্গ করে হয়তো বলতো—তোর নাম হইল বোষ্টমী। ক্ষেমা লজ্জা পেতো। এক এক সময় ইচ্ছে হতো আঁচল দিয়ে কপালের চন্দন মুছে ফেলে। কিন্তু পারতো না। সতীর যেমন স্বামী বেঁচে থাকলে সিঁন্দুর মুছতে নেই ওদের বেলাও ঠিক তাই; কিন্তু ব্রজনাথ কোনদিন রসকলি কপালে আঁকতো না। ক্ষেমা পুরোনো কথা মনে করে যখন বলতো— সে সব দিন তোমার কোথায় গেল ব্রজদা। শেষে কি না এই পথটাই বেছে নিলে! জল ভরা দুচোখ নিয়ে গায় ব্রজনাথ—আকাশ আমার বন্ধু সখা, বাতাস আমার প্রেম। হৃদয় আমার তরী (খোঁজে) গোকুলেরই শ্যাম, তাইতো আমি ভবঘুরে পান্থ সখা হে, যদি বাকী জীবন চাই দরশন তোমার চরণের। চণ্ডীতলায় ব্রজনাথ এলে আশ পাশ থেকে অনেক মেয়ে বৌয়ের ভীড় জমে, কেন ওরা আসে ব্রজনাথ বুঝতে পাবে না। ক্ষেমা হয়তো জানে আর জানে দরশন প্রার্থীরা।

এক সময় ক্ষেমা ব্রজনাথকে বলে—ওরা তোমার দরশন পেতে চায় ব্রজদা—অবাক হয়ে ব্রজনাথ বলে—আমার মতো অধমের কাছে তোমরা কেন এসেছ মায়েরা।

কেউ বলে -পেরনাম হই বাবা। আপনার কথাই ঠিক। ছেলে আমার ঘুর‍্যা এসেছে।

কথা শুনে উপরের দিকে উদাস হয়ে কাকে যেন দেখে ব্রজনাথ। আর একজন হয়তো বলল—বাবা আমার মেয়েডা আইবুড়া হয়ে ঘরে পইড়ে আছে। তার কি বে-থ্যা হবে না ?

এবার মাথা নামিয়ে তার দিকে চেয়ে ব্রজনাথ বলে—ঐ যে রাধাগোবিন্দ! ওর কাছে মানত কর গো মা। ওযে ভবের কাণ্ডারী, সবাইকে পার করে দেবে। "এমনি করে অনেক কথার জবাব দিয়ে দিয়ে এক সময় বিদায় নেয় ব্রজনাথ।

ক্ষেমা অবাক হয়ে শোনে ব্রজনাথের একতারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভেসে আসা গান—"দয়াল-রে তুমি এ কোন খেলা খেলো দয়াল, আমি কিছুই বুঝি না, সারা জীবন ঘুরেই মইলাম সুখের নাগাল পেলাম না।" বড করে নিশ্বাস ফেলে আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে ক্ষেমা। তারপর রাধাগোবিন্দের দিকে চেয়ে বলে—মিনসেটাকে সুখ দিলে না কেন ঠাকুর, ওযে সুখের কাঙ্গাল। আঁচল গলায় জডিয়ে প্রণাম করতে করতে ক্ষেমা শুনতে পায়—"অত ভাবছিস্ কেনরে মেয়ে, তুইতো চেষ্টা করলে ওকে সুখ দিতে পারিস্। লাফিয়ে ওঠে ক্ষেমা। এদিক ওদিক চায়। কে বলল কথাটা। কৈ আখড়ায় তো কেউ নেই। বাইরে ছুটে আসে। কাউকে তো চোখে পড়ছে না। তবে কে বলল? হাতে লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকাকে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়ায়। না কেউ নেই। আবার ছুটে যায়। রাধাগোবিন্দের কাছে। স্থির হয়ে চেয়ে থাকে রাধাগোবিন্দের দিকে। চোখে চোখ রাখে। চিরন্তন হাসি রাধাগোবিন্দের ঠোঁটে। পরস্পরের আলিঙ্গন যেন একান্ত আপন চিরন্তন কঠিন। এ বাঁধন যেন ছাডবার নয়। একি তোমার আদেশ ঠাকুর। বল বল রাধাগাবিন্দ। যদি তোমার আদেশই হয় তবে আমি লোক নিন্দা ভয় করি না। বলো ঠাকুর, আর একবার বলো! আবার প্রণাম করে এক মনে পদাবলী কীর্ত্তন গাইতে শুরু করে "প্রিয় হে—তোমার লাগিয়া কুলমান খোয়াইনু।" একসময় যখন বিভোর হয়ে গাইছিল ক্ষেমা, তখন হঠাৎ করে কে যেন হাক ডাক করতে করতে বাড়ী এলো। ক্ষেমা গান থামিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, কে—? আমি গো পাশের গাঁয়ের বিনোদ, দেখো কাকে সঙ্গে এনেছি। ঠাকুর প্রণাম করে লণ্ঠন হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে ক্ষেমা। বাইরে এসেই চমকে ওঠে ক্ষেমা। বিনোদের ঘাডে নেতিয়ে পডে আছে ব্রজনাথ, জ্বরে গা পুডে যাচ্ছে। ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। ক্ষেমা বেহুলা হয়ে চারদিন যমের সঙ্গে লডাই করে ব্রজনাথের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো। ব্রজনাথের চলার বল ফিরে পেতে আরো সময় নিল। অনেক দিন পর যখন চলতে ফিরতে পারল তখন ক্ষেমার বাঁধন বড় শক্ত করে বাঁধলো ওকে। বাঁধন ছিডে পালাতে পারে না ব্রজনাথ। তাই একদিন হাসতে হাসতে ক্ষেমাকে বলে "তোমার কাছে আমি হেরে গেছি ক্ষেমা।" ক্ষেমা জবাবে বলে—লয় গো লয়, তোমায় বাঁধতে পারি এমন ভাগ্য আমার লয়। —"ঠিক কইছ ক্ষেমা, এক ঠায়ে থাকবার ভাগ্‌গী আমার লয়, তাইতো আকাশ আমার বন্ধু সখা বাতাস আমার প্রেম, হৃদয় আমার তরী হয়ে খোঁজে গোকুলের-ই শ্যাম।

একদিন সত্যি সত্যি ব্রজনাথ একতারা হাতে নিয়ে আবার অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াল। এক বুক আশা নিয়ে পথিকের পথ চলা দেখছে, ক্ষেমার দুচোখ ভরে উঠছে জলে। কানে ভেসে আসছে বাউলের গান—"বাঁধন ছেড়া বাউল আমি পথই আমার ঘর, তুমি বন্ধু সুখে থাকো আমি হইলাম পর"......

॥ শেষ সিঁড়ি ॥

প্রণবেশ চক্রবর্তী

সনাতন হাজরার চোখ দু'টো যেন এক ঝলক জ্বলে উঠলো, অন্ধকারে যেমন বাঘের চোখ জ্বলে।

রোজকার মতই উপেনের দোকানে তখন অনেক লোকের ভীড়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপেক্ষা করছে একটা আধুলি হাতে নিয়ে, এই পঞ্চাশ পয়সার মধ্যেই তেল, হলুদ, লঙ্কা, বিড়ি, দেশলাই, কেরোসিন তেল—মানে একদিনের সাংসারিক প্রয়োজন মেটাবার যাবতীয় জিনিস নেবে। উপেন হাতে হাতে মাল দিচ্ছে, মুখে মুখে হিসেব করছে, আর পুরিয়ার পর পুরিয়া পাকাচ্ছে। সেখানেই আবছা অন্ধকারে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছিল সনাতন। বিড়ি নেবে এক বাণ্ডিল। এ সময়ে উপেনের মুদি দোকানে গ্রামের মেয়েরাই ভীড় করে বেশী, তারাই হিসেব করে ঘরের পুরুষটির জন্য বিড়ি পর্যন্ত কিনে নিয়ে যায়। সকালের চাইতে সন্ধ্যার সময়ই উপেনের দোকানে রোজই ভীড় জমে বেশী।

সনাতন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে উপেন নজর দেয়নি। মানে, সনাতনকে মান্য করেনি। এক সময় সনাতন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, চোখের তারা-দু'টো যেন জ্বলে ওঠে। হুঙ্কার ছাড়ার মতো চীৎকার করে বলে: কি রে উপেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে দেখতে পাসনি? দোকানে জমা ভীড় যেন চঞ্চল হয়, সবাই একসঙ্গে তাকায় সনাতনের দিকে। উপেনও থতমত খেয়ে বলে: দেখতে পাইনি সনাতনদা, বল কি চাই?

এমন কথা শুনে সনাতনের রাগ যেন ক্রোধে পরিণত হয়, বলে: তিন গাঁয়ের লোক এই সনাতনকে মান্য করে, আর তোর এত দেমাক! এক বাণ্ডিল বিড়ির জন্য তোর কাছে হা-পিত্যেস করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? জানিস, একটা ছাপ মারবো, আর একটা সই ঠুকে দেব, সঙ্গে সঙ্গে তোর দোকান উঠে যাবে।

হ্যারিকেনের আলোটা যেন দপ্‌ দপ্‌ করে ওঠে, বোধহয় তেলে জল ছিলো। দপ্‌ দপ্‌ করে ওঠে উপেনের বুকটা। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে নেমে এসে সনাতনের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ায়, অনুনয়ের সুরে বলে: রাগ করোনা সনাতনদা, তুমি হচ্ছ গাঁয়ের অধ্যক্ষ, তোমাকে মান্য না করে কি এ গাঁয়ে টিকতে

পারব ? এবার যেন সনাতনের রাগ কিছুটা কমল। চোখের আগুনও স্তিমিত হল, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল : ঠিক আছে, যা এক বাণ্ডিল বিড়ি দে। আমাকে আবার থানায় যেতে হবে।

উপেন ছাড়া পাওয়া আসামীর মত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দোকানের মাচায় উঠে যায়, হাত বাড়িয়ে বিড়ির বাণ্ডিলটা এগিয়ে দেয় সনাতনের প্রসারিত হাতে। একবার সকলের মুখের ওপর দিয়ে নিজের দৃষ্টিটাকে বুলিয়ে নিয়ে সনাতন বিড়ির বাণ্ডিলটা ডান পকেটে ঢুকিয়ে দেয়, বিড়ি রাখতে গিয়ে হাতটা ঠেকে যায় রবারের ছাপটার গায়। যাক্ ছাপটা সঙ্গেই আছে—নিশ্চিন্ত হয় সে।

আসলে এই রবার স্ট্যাম্পটাই হচ্ছে সনাতনের ব্রহ্মাস্ত্র। গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ সে। কত ব্যাপারে, কত সরকারী কাজে তাকে সই করতে হয়। কিন্তু সই যতই মারুক, ছাপটা না মারলে সেই সইটা যেন বেমানান হয়। কেউ মানতেই চায়না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ছাপটা রাখে সনাতন। কখন কি দরকার হয়।

দোকান থেকে নামতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়। তখনও সকলেই সনাতনকে দেখছে। মনে মনে একটু খুশীই হয়, সে দেখিয়ে দিল অধ্যক্ষ একটা যা তা লোক নয়, লোকের মত লোক। ফিরে আসে দোকানের বারান্দায়। এবারে উপেন পুরিয়া পাকানো ছেড়ে দিয়ে সনাতনের দিকে তাকায়, বেশ সম্ভ্রমের সুরে বলে : কিছু বলবে সনাতনদা ?

—হ্যাঁ, মানে একটা দেশলাই লাগবে, তাই ফিরে এলাম। সনাতন যেন দয়া করেই ফিরে এল।

—বেশতো, নিয়ে যাও—কথাটা বলেই উপেন দেশলাইটা এগিয়ে দেয়।

সনাতন সেটাও পকেটে পুরতে গিয়ে আবার রবারের গায়ে হাত বোলায়। প্রসন্ন মুখে বলে : চলি-রে থানায় যেতে হবে, বড়বাবু ডেকেছেন। একটু থামল। তারপর আবার আবছা আলোয় দেখে নিলো সবাইকে। বলল : জানিস তো, আমার সব বড় ব্যাপার। থানার বড়বাবু ব্লকের বড়বাবু, রেজেষ্টারী অফিসের বড়বাবু—নিজের কথায় নিজেই হেসে ফেলে।

একটা বিড়ি ধরায়, দম কষে একটা টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে, একটু কাশি যেন এসে গিয়েছিল, কোনরকমে দমন করে কাশির দমকটাকে। দম নিয়ে বলে : তুই কিস্যু ভাবিস না উপেন, তোর সব পাওনা আমি মিটিয়ে দেব। খাতায় লিখে রাখ সব। আর একবার সকলকে দেখে নিয়ে গাঁয়ের অধ্যক্ষ সনাতন হাজরা প্রস্থান করে।

দোকানের চৌহদ্দি পেরিয়েই তখন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। পীচের রাস্তাটা

অন্ধকারে যেন মিশে গেছে, পাঁচহাত দূর থেকেই ঠাহর হয় না। সেই অন্ধকার ধীরে ধীরে চলতে চলতে মিশে গেল সনাতনের আধময়লা সাদা জামা আর ধুতি পরা কালো দেহটা। থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে সনাতন এগিয়ে যায় ডোমজুড়ের দিকে।

সনাতনের যাত্রাপথের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে উপেন, মনে মনে গালাগালি দেয় তাকে। খাতায় লিখে রাখবি। লিখে রেখে কি হবে? গত দশ বছর ধরে অনেক লিখেছে, কিন্তু একটা টাকাও পায়নি। একবার টাকা চাইতে গিয়েছিল উপেন। সেকি রাগ সনাতনের, এই মারে তো সেই মারে। নিজের পকেট থেকে রবার স্ট্যাম্পটা বার করে আর বুক-পকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে উপেনকে বলেছিল: আমাকে তাগাদা দিচ্ছিস। দেব একটা সই ঠুকে, আর একটা ছাপ মেরে। দেখবি তোর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি হচ্ছি গিয়ে অধ্যক্ষ— বুঝলি!

উপেন বুঝেছিল, হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। টাকা চাইতে গেলেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই টাকা আর সে কোনদিনই চাইনি। লিখেও রাখেনি খাতায়। কি হবে লিখে, শুধু শুধু কালি আর কাগজের ব্যয় বাড়বে।

সনাতনকে সবাই ভয় পায়। আসলে ভয় পাওয়াতে জানে সে। সব ব্যাপারেই যখন তার সই চাই—তখন তাকে না মানলে চলবে কেন? কত লোক কত দরখাস্ত নিয়ে আসে, সনাতন সব পকেটে রেখে দেয়। বেশ গম্ভীর সুরে বলে: বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সব পড়ব, বিচার করে দেখব, তারপর ছাপ মেরে, সই ঠুকে দেব।

কেউ যদি কখনো বলে: একটু জরুরী ছিল, এখনই সইটা করে দেও না। সে অনুরোধ কখনো সনাতন রাখেনি। তার সেই এক কথা: আরে বাবা, আমার এই ছাপটা কি হাতের মোয়া, চাইলেই পাওয়া যাবে? আর আমার সই, এই সই সরকারের ঘরে আছে সরকারের ঘরে যাবে, এর দাম কি কিছু কম? ছাপ মারলেই হল, সই দিলেই হল? ভেবে চিন্তে দিতে হবে না?

সেবার সাঁতরাপাড়ার সুধন দরখাস্তের সঙ্গে কড়কড়ে একটা পাঁচ টাকার নোট প্রণামী দিয়ে বলেছিল: সনাতনদা এখনই সইটা করে দেও, নইলে বি. ডি. ও. আফিসে গিয়ে আর কাজ হবে না। পাঁচ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে সনাতনদা একলহমায় কেমন যেন উদার হয়ে গেল। হাসিমাখা মুখে বলল: দেখ সুধন, রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে কি এসব কথা হয়? বাড়ী যাই, ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভাল করে পড়ি, তারপর ছাপ মেরে সই দিয়ে দেব। জানিস তো, আমার সই সরকারের ঘরে যায়।

তবুও সুধন নাছোড় বান্দা। শেষটায় সনাতন একটু চড়া-মেজাজেই প্রশ্ন করে : এটা কিসের দরখাস্ত ? সুধন বোঝে হিসেবে কোথাও গোলমাল হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আরও একটা ঝক্‌ঝকে পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দেয় সনাতনের হাতে, মুখটা কাচুমাচু করে বলে : কেরোসিনের দোকান খোলার জন্য একটা দরখাস্ত দিচ্ছি।

শুনেই সনাতন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পারলে যেন সুধনের দেহে কেরোসিন ঢেলে চোখের আগুনে গোটা মানুষটাকেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। গলা দিয়ে তার স্বর বেরোয় না, রাগ হলে অনেক সময় সনাতনের এরকম হয়।

সুধন এবারে বেপরোয়া হয়ে সনাতনের পা জড়িয়ে ধরে, মিনতির স্বর তার গলায় : দাদা তুমি গিয়ে আমাদের অধ্যক্ষ, মানে বাপের সমান। তোমাকে না জানিয়ে এটা করব—এমন সাহস কি আমাদের হবে। ভেবেছিলাম, দরখাস্তটা দিয়েই সব কথা বলব, যদি ভুল হয়ে থাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। তবুও সনাতনের রাগ কমে না। সুধন শেষটায় আর একটা দশটাকার নোট এগিয়ে দেয় সনাতনের দিকে, দয়া ভিক্ষা করার মতো সুরে বলে : তোমার সই আর ছাপ ছাড়া কি কেউ কিছু করতে পারে ? বি. ডি. ও. সাহেবেরও তেমন হিম্মৎ নেই।

সনাতনের রাগটা যেন বরফের মতো গলে জল, জল থেকে বাষ্প হয়ে গেল। মিশকালো মুখের মেঘ ফুঁড়ে চাঁদের হাসি দেখা গেল—সাদা দাঁতগুলোও ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। দশটাকার নোটটা পকেটে পুরে সে বলে : এক ঘণ্টা বাদে আয়, সই করে দেবো।

এহেন সনাতন হাজরা যখন থানা থেকে রাত্রে বাড়ী ফিরলো, তখন তার বড় ছেলেটা ঘরের দাওয়ায় বসে। ছেলেকে দেখেই সনাতন হাসিমুখে প্রশ্ন করে : কিরে বাপ, নেকাপড়া করছিস ? খুব মন দিয়ে পড়বি। অধ্যক্ষের ব্যাটা যেন অঞ্চল প্রধান হয়।

ছেলে নিতাই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র। সনাতন স্বপ্ন দেখে : ছেলে একদিন হাওড়ার কলেজে পড়বে। মানুষ হবে। নিজে যা পারেনি, ছেলেকে তাই করতে চায়।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে আবার কি ভেবে থমকে দাঁড়ায় : শোন নিতাই কাল থানার বড়বাবু আসবে হারানের বাড়ীর চুরিটা ধরতে। আমাকে থাকতে বলেছে। দরকার হলে সাক্ষী হতে হবে, হয়তো ছাপ দিয়ে সই করতে হবে। তুই যেন দূরে যাসনি।

পরদিন সকালেই সদলবলে দারোগা এলো। ভীমগর্জনে গ্রাম কাঁপিয়ে দিলো। আজ সনাতন একটু সাজগোজ করেছে। বুট জুতোর কাদা ঝেড়ে ফেলেছে। ফর্সা ধুতিটা হাঁটুর নিচেই ঝুলিয়ে দিয়েছে, বুক পকেটে পেন গুঁজতে

ভুল করেনি, ডান পকেটে তেমনি রবারের স্ট্যাম্পটাও নিতে ভুল করেনি।

এক সময় সনাতনের চেহারাটা ছিলো ডাকাতের মত, এখনো সুঠাম গঠনটাতে বয়সের পোকা ঘুণ ধরতে পারেনি। সারাক্ষণ দারোগার সঙ্গে আছে সে। একের পর এক এজাহার দিচ্ছে, দারোগা লিখে নিচ্ছে। শেষটায় চোরাই মাল ধরা পড়লো পাঁচুর ঘরে। ব্যাস, আর যায় কোথায়? সারা গ্রামে বেধেগেল কুরুক্ষেত্র। দারোগা একবার ভুঁড়ি দুলিয়ে ঘোষণা করলো, আমি থাকতে চোরাই মাল যাবে কোথায়? চোর পালাবে কি করে?

সনাতন হাতজোড় করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো: সে কথা আর বলতে।

সামনে দারোগা, পিছনে ভীড। পাঁচুকে পাওয়া গেল না, কিন্তু পাঁচুর বাড়ীটা লোকে লোকে ভরে গেল। কে যে খবরটা দিলো—তা নিয়েই তখন দারুণ উত্তেজনা। পাঁচুর হাঁড়ির খবর কে রাখে—তা নিয়ে শুরু হয়ে গেল বিতর্ক। একটা প্রচণ্ড ধমকে দারোগা ভীড়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিল।

হারান তখন বলির পাঁঠার মতো দারোগার পাশে দাঁড়িয়ে। যার বাড়ীতে চুরি হয়, পুলিশের কাছে সেই প্রথম চুরির দায়ে ধরা পড়ে। হারানও পড়েছে, হাতে এক জোড়া ডাব নিয়ে দাঁড়িয়ে সে, কখন দারোগা সাহেবের জলতেষ্টা পায়, তাতো কেউ জানে না। চুরির মাল একে একে মিলে যায়। সনাতন হারানকে আশ্বাস দিয়ে বলে: এ গাঁয়ে আমি থাকতে চুরি করে কেউ পার পাবে না, বুঝলি। হারান এখন সব বোঝে, না বুঝে তার উপায়ও নেই। চোরাই মাল বলতে দুটো এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি, একটা ট্রানজিস্টার, দুটো ধুতি, আর গোটা তিনেক শাড়ি।

পাঁচুর বৌটা দরজার আডালে দাঁড়িয়ে, হারান সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: ঐ তো আমার বৌ-এর কাপড পাঁচুর বৌ পরেছে। দারোগা একটা ধমকেই হারানকে চুপ করিয়ে দেয়। পাঁচুর বৌ যে সবার সামনে দাঁড়াতে পেরেছে সেটা ওর চোরাই শাড়ির দৌলতেই। নইলে দিনে ঘর থেকে সে কোনদিনই বেরুত না—একটা ন্যাকড়া পরে কি রাত্রি ছাড়া বাইরে আসা যায়?

চোরাই মালের লিষ্ট-ফিষ্ট তৈরী হয়ে যায়। সাক্ষী গ্রামের অধ্যক্ষ সনাতন হাজরা। নামটাও লেখা হয়ে গেল। এবার দারোগা বাবু কাগজটা এগিয়ে দিলো সনাতনের দিকে, বললো: নিন, এখানে একটা ছাপ দিয়ে সই করে দিন।

ভীড়ের মুখ একবার সনাতন দেখে নিলো। তার ছাপ, তার সই কত দামী গ্রামের লোক দেখুক, সনাতন বাঁ পকেট থেকে স্ট্যাম্পটা বার করে ছাপটা লাগিয়ে দেয়। এবার সইটা করতে হবে। বুক পকেট থেকে কলমটা বার করে, বাগিয়ে

ধরে, সকলের দিকে তাকায়, তাকায় দারোগার মুখের দিকে। দারোগা তারই দিকে তাকিয়ে—সতর্ক দৃষ্টি।

মৃদু স্বরে বলে সনাতন : আমি একটু বাড়ীতে নিয়ে যাই কাগজটা, সই করে এখুনি নিয়ে আসছি।

দারোগা ধমক দেয় : না না, বাড়ীতে কেন? এখানেই সই করুন। সনাতন যেন ভীড়ের মুখে মুখে কার মুখ খুঁজে বেড়ায়। অস্পষ্ট করে একবার যেন বলে—নিতাই।

তারপর আবার দারোগার ধমক—কি হলো দেরী করছেন কেন?

সনাতনকে আজ সবাই ঘিরে রেখেছে। সবাই—যারা তার একটা সই আর ছাপ পেলে ধন্য হয়ে যায়।

শরীরটা যেন ঘামতে থাকে তার। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপতে থাকে। হাতটা যেন অবশ হয়ে যায়। পেনটা জোর করে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা-করে সে, তবুও যেন সেটা হাতের ফাঁক গলে হারিয়ে যাচ্ছে। ভীড়ের মুখগুলো এই প্রখর রোদের আলোতেও তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকে। চোখের সামনে নেমে আসছে অন্ধকার। পালাতে চায়—এখান থেকে দূরে, বহু দূরে।

উঠতে উঠতে সনাতন এসে দাঁড়ায় শেষ সিঁড়িতে। তার চোখের সামনে তখন জমাট বাঁধা অন্ধকার। এরপর সে কোথায় পা বাড়াবে?

কি বলবে সে? সে যে সই করতে জানে না। সে কথা আজ কেমন করে বলবে? ছেলেটাই যে বাঁকা হাতে বাপের নাম লিখে দেয়—সে কথা সে কেমন করে জানাবে?

পাপপুণ্য

পুকুর ধারে কী লসলসে গিমে শারে জঙ্গল ফনফনিয়ে উঠেছে।

ভুলবে কি মনু? সে ভালবাসে চালের গুঁড়ো দিয়ে গিমের ভাজা বড়া। কিন্তু মা ঠিক বলবে—তেল কি সস্তা? ভাজা বড়া এখন সব বন্ধ।

অথচ গিমের কী বাড়বাড়ন্ত! কোনো মানে হয় না।

বর্ষায় টুপটুপে পুকুরের জল উপচে ভাসছিল শত্তেক উঠোন। এখন শরতে থিতিয়ে কাকচক্ষু টলটলে জল এক ধাপ সিঁড়ির নিচে কোল পেতে আছে।

এখন রোদ নরম, শিউরোনা শীত পড়েছে একটু, আকাশ নীল বেলুনের মতো উড়ছে। কাশফুলি মেঘ একটু আধটু ভেসে যায় আনমনে। এইসব মনুর নিজের বলে মনে হয়। ঐ আকাশের মালিক কে? কার এই পুকুরের জল, ঐ মেঘ? এই শীত, রোদ এসব কার? আর কারো? মনুর মনে হয় তার।

পুকুরের জল ছাড়া ডাল সেদ্ধ হয় না। এ ভারী ঝঞ্ঝাট। মনুদের বাড়ীতে তিন চারটে টিউবওয়েল আছে, কুয়ো আছে। তার জলে সব সেদ্ধ হয়, কেবল ডাল লোহা হয়ে থাকে। এমন কি সে জলে যদি ডাল ধুয়ে পুকুরের জলে বসাও, তাহলেও।

থাকে এরকম মেয়ে পুরুষেও। একের সঙ্গে আরেকের বনেনা কিছুতেই। আবার আরেকের সঙ্গে একের পটে যায়। ডালের সঙ্গে তাই বাড়ীর জলের আড়া আড়ি, পুকুরের জলের ভাব। মনুর পোড়া কপালে ডালে জলে মিশ খায়নি।

এ পুকুরটাও অবশ্য তাদেরই। তবে বাড়ীর শেষ মাথায় বলে অনেকটা দূর। ঝাঁঝরি গামলায় এক কাঁড়ি ডাল। পুকুরের ধারে সুপুরি গাছের পাটায় উবু হয়ে বসে ঝাঁঝরি গামলাটা জলে ভাসায় মনু। অজস্র ছোটো ছ্যাদা দিয়ে জল ঢুকছে পিচকিরির মতো। ঠাণ্ডা, মোলায়েম জল। ডালের সঙ্গে ভাবের জলের শুভদৃষ্টি।

ভোরের রোদে শিউলি-বোঁটার রঙ ফিকে হয়ে এল। এখন পুকুরের জলে চাঁদা মাছের মতো খেলা করে সাদা রোদ। কচু বন কাঁপিয়ে বাতাস দেয় হিমের। নিরিক-খিরিক নেচে বেড়ায় শালিক চড়ুই।

মুসুরির দানাগুলো ভিজে ভোঁট হল। মনু ধুচ্ছে তো ধুচ্ছেই। আসলে ডাল

বুকে বসে তার ভারী আশ্চর্য লাগছিল নিজের পৃথিবীটার দিকে চেয়ে। কে যেন কবে থেকে তাকে শিখিয়ে রেখেছে—এই যে জল, গঙ্গা, আলো, আকাশ, গাছ আর বুনো পাখি এ সবই তার। সব তার নিজের।

উত্তরের ঘাটে দুর্গাকান্তর বউ লতা ছেলেকে ধোয়াতে এনেছে। ন্যাংটো কচি ছেলেটা পৈঠার ওপর দাঁড়িয়ে ঠিক ঘোড়ার মতো চি-হিঁ-হিঁ শব্দে চেঁচাচ্ছে। আর লতা তার শুচি উদ্ধার করতে করতে দু' হাতের আঁচলায় জল তুলে পেছন দিকে ঝাপটা মারছে এত জোরে যে চড় চাপড় মারার মতো শব্দ হচ্ছে।

ভারী কুঁদি মেয়েছেলে লতা। দুর্গাকান্ত থেকে শুরু করে পাড়াপড়শী পর্যন্ত সবাই ভয় খায়।

মনু জল থেকে গামলা তুলে শূন্যে ধরল। হাজারটা ছিদ্রের ঝাঁঝরি দিয়ে ঝিরঝির জলের বৃষ্টি পড়ল জলে। ভারী মিঠে শব্দ। মনু গলা তুলে বলল—ও বউদি, আর ভিজিওনা ছেলেকে। ঠাণ্ডা লাগবে।

—মরুক। লতার স্বর জল ছুঁয়ে এল।

সকালবেলাটায় এইসব শব্দ ভাল নয়। আজকাল ভারী শব্দ চিনেছে মনু। তার কান হয়েছে শৌখিন। সব সময়ে সব শব্দ ভাল লাগে না। এক একটা সময়ে তার ফুলকে কুসুম বলতে ইচ্ছে করে, পাখীকে বিহঙ্গ। তার খুব ইচ্ছে করে সারা-দিন কাছাকাছি একটা ঝর্ণার শব্দ শোনা যাক। মরা শব্দটা সে কখনো সইতে পারে না।

ঝাঁঝরি গামলায় ডালের জল ভাল করে ঝরেনি। কাঁখে গামলা আর ছোটো বালতিতে বাবু ভালের জন্য পুকুরের বিবি জল নিয়ে যখন সে আমবনের পথ ধরল তখন ঝাঁঝরির জল তার শাড়ি ভেজাল, শায়াও। পায়ের পাতা বেয়ে নামল। শুক্‌ মাটিতে ক্ষণস্থায়ী লক্ষ্মী-পায়ে ছাপ আঁকা হতে লাগল।

এ বাড়ীর কূল কিনারা নেই। কোথায় এর শুরু, আর কোথায় বা শেষ তা আজও বুঝে ওঠেনি মনু। তার বাবা জগবন্ধু সমাজদার ভারী বিষয়ী লোক। ভোজবাজীর মতো একখানা টাকাকে দুটো টাকা করে ফেলে, এক বিঘা জমিকে দু' বিঘা। ছেলেবেলায় সে এ বাড়ীর চৌহদ্দিকে ছোট্টো দেখেছে। যত সে বড় হয়েছে তত ছড়িয়েছে চৌহদ্দি। তার বাপের বড় বিষয়ের নেশা। এখন বুড়ো বয়সে চেহারা হয়েছে শকুনের মতো। বার বাড়ীর বারান্দায় খাপ পেতে বসে থাকে জুল-জুলে চোখে চেয়ে। দু' চোখ ভরে বিষয় দেখে। কিন্তু বিষয়ের শেষ নেই। চোখের দৃষ্টিতে এখন জমির শেষ দেখা যায় না। আধখানা গাঁ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের ভদ্রাসন। কত লোকের জমি কিনে তাদের বাস উঠিয়ে দিয়েছে বুড়ো শকুন। জমি

চেনে, টাকা চেনে, কিন্তু মানুষকে মানুষ বলে চেনে না কখনো। চিনলে মনুকে লক্ষ করতো এতদিনে। দেখত ভরা-যুবতী মেয়েটা এয়োস্ত্রীর সব চিহ্ন শরীরে নিয়ে কেমন অনাস্থার জীবন কাটাচ্ছে।

ডালে জলে মিশ খাওয়ায় তারা রোজ। শুধু মিশ খাওয়াতে পারে না মনুর সঙ্গে বিদ্যাধরের।

ছেলেটাকে একা উঠোনে ছেড়ে রেখে এসেছে। বিন্তি ঝিকে বলে এসেছে দেখতে। বিন্তি যদি না গিয়ে থাকে এতক্ষণে তো ছেলে কাঁদছে। মনু তাই তাড়াতাড়ি পা চালায়। ছেলেটা বড় রোগা, দেড় বছরেও হাঁটে না, দাঁড়ায় না।

॥ দুই ॥

প্যাংলা চিরকালের হাভাতে। সবাই চেনে তাকে। যখন সে ছোটো ছিল তখন বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষে করত। ছোটো ছেলে দেখে লোকে দিতও এক মুঠো চাল, এক কোঁচড় মুড়ি, পাতের এঁটো, গাছের পোকা-লাগা কি আধ পচা আমটা, কলাটা। এখন বড় হয়েছে, গোঁফ উঠেছে, লোকেও চিনে গেছে তাকে। এখন আর ভিক্ষে দেয় না, বলে—খেটে খা গে যা।

আজকাল প্যাংলা খাটে। মাথাও খাটায়। ক'দিন আগেও পেটের খোলটা ছোটো ছিল, দু' মুঠো ভাত পেলে ভরে যেত। আজকাল খোল বড় হয়েছে। কেউ দিতেও চায় না কিছু। প্যাংলা কোনোদিন পাপ পুণ্য ভগবান বলে কিছু শোনেনি। কেউ শেখায়নি তাকে। কিন্তু নিজে থেকেই শিখেছে যে খিদে পেলে খেতে হয়, গায়ের একটু ঢাকনা টাকনা চাই, শীত পড়লে ঠাণ্ডা লাগে, বৃষ্টিতে গা ভিজে যায়। সে পুলিসের কথা জানে, মারধরের কথা জানে। আর শিখেছে, জিনিস বেচলে পয়সা পাওয়া যায়। পয়সাও চিনতে হয়েছে তাকে।

সমাজদার বাড়ীর আলু ক্ষেতের মাটি ঝুরঝুরে করতে লেগেছে প্যাংলা আজ চারদিন। বুড়ো সমাজদার তাকে পয়সা দেয় না, আর সব ক্ষেত মজুরদের দেয়। সে পায় দু-বেলা ভাত, আর শীতে তুলোর কম্বল পাবে বলেছে।

সেদ্ধ ডালের একটা মন-কাড়া গন্ধ আসছে। খুব চনমনে গন্ধ! নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে প্যাংলার। সবে সকাল। বাড়ীর পঞ্চাশখানা পাত পড়ে যাবে সেই দুপুর গড়িয়ে গেলে, তারপর যখন প্যাংলা ভাতের ঢিবির ওপর ডালের তলানী পাবে তখন আর তাতে তেমন গন্ধ থাকবে না। কালও একটা ডালের শুকনো লঙ্কা চেয়ে পায়নি। সে লঙ্কার ভারী দাম বাজারে। তার ছাল আর গন্ধই আলাদা।

নোটন তার বিড়িটা খেয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল ঘাসবনে। প্যাংলা চোখ রেখেছিল।

গিয়ে কুড়িয়ে কয়েকটা টান মারল চোখ বুজে। মশলা নেই, শুধু বিড়ির খোলটা একটুখানি হয়ে জ্বলছে। তাই টানল সে। আজকাল এই আর একটা জ্ঞান হয়েছে তার। বিড়িটা চিনেছে।

সমাজদারদের চাকর হরিপদ তাড়া মারে—অ্যাই! হাত চালা, হাত চালা!

হরিপদর হাতে একটা লম্বা রবারের নলের ডগাটা ধরা। ডগায় একটা ঝাঁঝরি লাগনো। একটা চাবি ঘোরালেই ঝাঁঝরি দিয়ে ঝিরঝির করে জল ছিটকে বেরোয়। তাই দিয়ে ক্ষেতে জল দেয় হরিপদ। কলটা যত দেখে তত মুগ্ধ হয় প্যাংলা।

কাজ বড কম নয়। আলু গাছের গোড়ার আল উসকে দিয়ে দু হাতে ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরে করা। এ ক্ষেত থেকে কম করেও নাকি চল্লিশ পঞ্চাশ মণ আলু ওঠে ফি-বছর। নোটন বলেছে। আলু ক্ষেতেই শেষ নয়। কপি ক্ষেতের আগাছা তোলো, নতুন ক্ষেত কোপাও, জঙ্গল হাসিল করো। বসে থাকতে দেয় না।

প্যাংলার গায়ে একটা হাফ শার্ট। কিন্তু সেটা হাফ শার্ট বলে চিনবে কার সাধ্য। বেঁটে আর রোগা প্যাংলার গায়ে সেই শার্টের ঝুল গোড়ালি অবধি নেমেছে, হাতা নেমেছে কনুইয়েরও বিঘাখানেক নিচে। বুকপকেট কোমরের কাছ বরাবর, আর ঝুল পকেট এত নিচে যে নাগাল পেতে হলে তাকে বসতে হয়। এর আগে মিদ্দার বাড়ীতে নারকেল পেড়ে দিয়েছিল, তাবাই দেয় জামাটা। এত ঢলঢলে বলে খানিক সুবিধেও আছে। টপ করে জিনিস লুকোনো যায়। কিছুক্ষণ আগে ক্ষেত থেকে চারটে মূলোর ঝুঁটি ধবে উপড়ে নিয়েছিল। ঝুল-পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে দুটো, আর দুটো নেংটির কষিতে গোঁজা। খাওয়ার ফুরসৎ পায়নি। বেহানে চাট্টি মুড়ি দিয়েছিল এ বাড়ীর মেয়ে। মূলো দিয়ে মুড়ি অমৃত। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে খেতে সাহস হয়নি। অথচ কখন থেকে মূলোয় দাঁত বসাতে নোলা সকসক করছে। ফাঁক পাচ্ছে না প্যাংলা।

হরিপদ মটর শাকে জল দিতে গেলে তিনটে ব্যাং-লাফ দিয়ে পালায়। প্যাংলা বাঁশঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নেংটির কষি থেকে একটা মূলো বের করে কচকচ করে চিবোয়। সে রসগোল্লার কথা শুনেছে, খায়নি। জিলিপি অবশ্য খেয়েছে এক আধবার। তবু মনে সন্দেহ জাগে, সে কি এই মূলোর চেয়ে ভাল?

যখন বা খায় প্যাংলা তখন সেটাকেই তার সবচেয়ে ভাল খাবার বলে মনে হয়। এই যে মূলো—ঝাল-মিষ্টি অদ্ভুত এক স্বাদ, এর কাছে কে লাগে? মুখ ভরে যায় স্বাদে, নাক ভরে যায় গন্ধে, বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় রসে, আর পেটটা যেন কেত্তন গায়। মূলোটা শেষ করে শাকের ডাঁটিগুলোও চিবিয়ে ফেলে সে। খারাপ লাগে না।

সমাজদার বাড়ীতে বারো চৌদ্দটা উঠোন। সবচেয়ে কাছে যে উঠোনটা তাতে কয়েকটা রঙিন শাড়ি দড়িতে শুকোচ্ছে। হাওয়ায় উড়ে উড়ে শাড়িগুলো প্যাংলাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

দুনিয়াতে কত কিছু ডাকে প্যাংলাকে। আর প্যাংলাও তেমনি। যে ডাকে তার কাছেই চলে যায়। কাজকর্মের কথা খেয়ালই থাকে না।

গুটি গুটি সে উঠোনবাগে এগোতে থাকে। বুদ্ধি করে ঢলঢলে জামাটা গলা তুলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে নিল। কেউ যেন বুঝতে না পারে। শাড়ি বেচলে অনেক পয়সা পাওয়া যায়। দু' টাকা তিন টাকা।

ধারে কাছে লোকজন নেই। দু'টো ঘরের দরজায় শেকল তোলা মস্ত বাড়ীতে হাজারো কাজ। কে কোথায় কোন কাজে ফেঁসে গেছে।

জামার ভিতরে লুকিয়ে প্যাংলা একটা শিউলি ঝোপের আড়াল থেকে সব দেখে নিয়ে ব্যাংবাজি লাফ মেরে শাড়িগুলোর কাছে পিঠে চলে আসে।

উঠোনের রোদে শাড়ির আড়ালে একটা কাঁচ কোলের খোকা একা বসে খেলছে। তার গলায় একটা কবচ, কোমরে কার, চোখে ল্যাপটানো কাজল। প্যাংলাকে দেখে হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দু হাতে তালি দিয়ে বলল—বাঘা হাঁম।

অমনি শাড়ি চুরির কথা ভুলে গেল প্যাংলা। খোকাটার সঙ্গী নেই। তাকেই বুঝি ডাকছে। প্যাংলা জামার মধ্যে লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খোকাটার দিকে এগোতে এগোতে নাক টেনে টেনে ঘড়ড় ঘড়ড় আওয়াজ ছাড়তে থাকে।

॥ তিন ॥

রাখালবাঁশির মতো সুখী লোক সে নিজেও দেখেনি। প্রথম কথা হল তাকে কোনো কাজ করতে হয় না। এক সময়ে সে শহরে রিকশা চালায়, পরে কিছুদিন বাসের কণ্ডাকটারী করে। এখন সেসব ছেড়ে ঘরে খাদিমা হয়ে বসেছে। মা চোখের জল ফেলে এক গরীবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তিনটে বাচ্চা। ঘর সংসারের জন্য এক সময়ে ভারী ভাবনা-চিন্তা ছিল তার, উদ্বেগ ছিল। মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াত। সেই সময়ে তার বন্ধু পেনু সত্যিকারের একটা উপকার করে। তাকে মদ ধরায়।

সেই থেকে রাখালবাঁশির দুঃখ দুশ্চিন্তা ঘুচে গেছে। আজকাল কেমন করে দিন হয়, রাত হয় তা আর সে টেরও পায় না। বাড়ী ঘরে বড় একটা আসাও হয় না আজকাল। ঘটি বাটি চুরি করে বিক্রি করত বলে বউ মুখ নাড়ত। তাই বউটাকে বেদম পেটাত রাখালবাঁশি। কিন্তু বাবারও বাবা আছে। বউয়ের তিন

চারটে ডাকাতে ভাই এসে একদিন সাঁঝের ঝোঁকে তাকে পিটিয়ে গলা দিয়ে রক্ত তুলে ছাড়ল। সেই থেকে বউয়ের কাছে সে আর ঘেঁষে না। মারের ভয়ের চেয়েও বড় ভয়, মার খেলে নেশা ছুটে যায়। পয়সার নেশা তো।

দু' ভাইয়ের নামে জমি জিরেত দিয়ে গেছে বাবা। বড় ভাই কৃষ্ণবাঁশি সেসব দেখে। রাখালবাঁশি তার ভাগেরটা পায় বটে, কিন্তু তার বেশীর ভাগটাই বউ রাখে। তবে যা পায় তাতে চলে যায় রাখালবাঁশির। একবার টাকার দরকারে বুড়ো সমাজদারের কাছে বিঘেটাক জমি বেচে দিয়েছিল। তারপর তার বউ ফের তার ভাইদের খবর দিয়ে আনায়। শালা সম্বন্ধীরা এমন ভয় দেখাল যে রাখালবাঁশি পথ না পেয়ে বাদবাকি জমি বউয়ের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে জান বাঁচাল। এখন আর জমি তার নয়। তবে ভাগের কিছু পায়। হাটখোলায় তান্ত্রিকের আস্তানায় থাকে। বেশ আছে।

তবে মদ খেলে রাখালবাঁশির ন্যায়-অন্যায় বোধ খুব চাগিয়ে ওঠে। দেশে যেখানে যত অন্যায় আর দুষ্কর্ম হচ্ছে সব কিছুর বিপক্ষে ভীষণ রুখে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

আর তাই সে রোজ নিয়ম করে এসে গাঁয়ের সবচেয়ে বিষয়ী লোক জগবন্ধু সমাজদারকে গালমন্দ করে যায়। বলতে কি জগবন্ধুকে গাল না দিয়ে সে জল খায় না।

সকালে উঠে হাটখোলা পেরিয়ে নদীর ধারে পেচ্ছাপ করতে বসে একটা নতুন ধরনের গালাগাল মনে পড়ল। এর মধ্যে কবে যেন সে শুনেছে, কে যেন কাকে গাল দিচ্ছে "ভূতের পুত" বলে। মনে পড়তেই আপনমনে খুব হাঃ হাঃ করে হাসে রাখালবাঁশি। আজ এ গালটা দিতে হবে বুড়ো সমাজদারকে।

রাখালবাঁশির সকাল হয় একটু বেলায়। তখন রোদ বড় কটকটে সাদা। যে যার কাজে লেগে পড়েছে। হারু তান্ত্রিক তার জপ-তপ শেষ করে তোলা আদায় করতে বেরিয়েছে। সাত সকালেই মানুষের ধান্ধাবাজি শুরু হয়ে যায়।

মানুষের ধান্ধাবাজি একদম সইতে পারে না রাখালবাঁশি। খা, দা, ফুর্তি কর, যেখানে যা পাবি উড়িয়ে দে। অত ধান্ধাবাজি কেন রে শালারা?

হাটখোলাটা ফাঁকা। হপ্তায় দু'বার বসে মাত্র। বাকি সময়ে রোগা রোগা বাঁশের খুঁটি আর শনের চালাঘরগুলো কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষের ধান্ধাবাজির আর একটা জায়গা হল এটা। রাখালবাঁশি নদীর ঘাটে চোখে মুখে জল দিয়ে ফেরার পথে দুটো চালাঘরের খুঁটিতে ধপাধপ লাথি চালাল। শরীরে তাল নেই। তাই পড়েও গেল কয়েকবার। কিন্তু লাথি মারতে পেরে ভারী একটা

আনন্দও হল তার। গল গল করে হাসি বেরোতে লাগল। কী হাসি! কী হাসি! হাসতে হাসতে বেদম হয়ে চোখে জল এসে গেল।

একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে বটগাছের তলায় হারু তান্ত্রিকের টিনের ঘরে এসে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে আধখানা বোতল ফাঁক করে ফেলল হাসতে হাসতে। হাসতে হাসতেই চোখের জল মুছে বিষম খেয়ে কেশে আপনমনে বলল—না বাবা। যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম সন্না! ওরে বাবা! কী ধাপ্পাবাজ লোক সব রে!

বলে ফের হাসে সে। গল গল করে!

সামনেই জিভ বারকরা মাটির কালীমূর্তি। তেল সিঁদুরে মাখামাখি। টাট্‌কা জবার মালা গলায় দুলছে। সামনে ধুনির ছাই স্তূপাকার। মাটির নিচে পাঁচটা নরমুণ্ড পোঁতা আছে, তার ওপর কম্বলের আসন, যার ওপর রাখালবাঁশি বসে আছে এখন। কম্বলের বদলে বাঘছালেরই শখ হারুর। কিন্তু সেটা আর যোগাড় হচ্ছে না।. বড্ড দাম। একধারে মাটির ওপর চ্যাটাই পাতা তাতে কম্বলের বিছানা। হারু শোয়।

এ ঘরের চারদিকে চেয়ে ধাপ্পাবাজির মেলা জিনিস দেখতে পায় রাখালবাঁশি, আর গল গল করে হাসির কল খুলে যায় ভিতরে।

তারপরই সে খুব অবাক হয়ে ভাবে—আচ্ছা, হারু তান্ত্রিকের তো একটা বিছানা এখানে দেখছি। তবে আমি কোথায় শুই রোজ রাতে? অ্যাঁ! কোথায় শুই?

যত ভাবে তত আশ্চর্য হয়ে যায় রাখালবাঁশি। সে কোথায় শোয় তবে?

ভেবে কূল কিনারা পায় না। মাঝে মাঝে সে ঘুম থেকে উঠে নিজের গায়ে ধুনির ছাই বা হাটখোলার মাটি লেগে থাকতে দেখতে পায় বটে। তবে কি তার বিছানাই হয় না? বেওয়ারিশ পড়ে থাকে যেখানে সেখানে? সে কি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হরেরাম দাসের ছেলে নয়? তার কি জমি জিরেত, ঘর বাড়ী নেই? সে কি ছোটোলোক?

রোসো শালা হারু তান্ত্রিক, আজ দেখাচ্ছি তোমাকে! রোজ আমাকে মাঠ-ময়দানে ফেলে রাখো কুকুর বেড়ালের মতো! আমার কি মা-বাবা নেই নাকি?

যত রাগ গিয়ে হঠাৎ পড়ে জগবন্ধু সমাজদারের ওপর। তাই আর দেরী করে না রাখালবাঁশি। একটা বিড়ি কষ্টে সৃষ্টে ধরিয়ে উঠে পড়ে।

গালাগালটা মনে আছে। ভূতের পুত। জব্বর গাল বাবা। ভূতের পুত। ভারী নতুন।

॥ চার ॥

বঙ্কিশোরের বউ তনু ভাল বটে, কিন্তু তার শ্বশুরবাড়িটা যেন কেমন কেমন। সে নতুন জামাই, তার ওপর বেশী বুদ্ধিও খেলে না, তাই তলিয়ে না বুঝলেও কিছু কিছু বোঝে। বাড়ীটা গণ্ডগোলের।

পুজোর পর বউ নিয়ে যাবে বলে এসেছে সে। গত চারদিন আছে। তার মধ্যেই টের পেয়েছে, এ বাড়ীতে নানা ফিসফাস, গুজগাজ, ষড়যন্ত্র, শলা পরামর্শ চলে সব সময়ে। তার শ্বশুর জগবন্ধু সমাজদার লোক ভাল নয় বলে শুনেছে সে। তাই হবে। প্রায় দিনই সকাল সাঁঝে একটা মাতাল লোক এসে যা নয় তাই বলে বারবাড়ীতে দাঁড়িয়ে গালাগাল করে যায় শ্বশুরকে। তনুর বড় বোন মনুকে তার স্বামী নেয় না। একটা ছেলে নিয়ে মনু বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকে। এ সব পছন্দ নয় বঙ্কিশোরের।

কিন্তু সে ভারী ভদ্রলোক। ঐ যে মাতালটা এসে গালমন্দ করে যায়, গত পরশু সে তার বউ তনুর নামেও যাচ্ছেতাই বলেছে। তনু নাকি বিয়ের আগে কালু নামে কোন ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। গর্ভপাত করে ঘরে ফেরে। বঙ্কিশোর কথাটা শুনেও শোনেনি। শুনতে নেই। প্রথম কথা, খুব নিরীহ আর ভদ্র বলে সে কোনদিন কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেনি, তার ওপর শ্বশুরবাড়ীর দেশে অচেনা একটা মাতাল লোকের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার কথাই ওঠে না। এমন কি সে তার বউ তনুকেও লজ্জাবশে এসব কথা জিজ্ঞেস করেনি। যদি কিছু হয়ে থাকে তো হোক গে। মানিয়ে টানিয়ে নেওয়াই ভাল।

বঙ্কিশোর ভারী মুখচোরাও। এ বাড়ীর একজন পুরুত আছে। রোজ পাঁজি বগলে করে এসে তিথি নক্ষত্র বিচার করে। কাল সে লোকটা বঙ্কিশোরের মুখের ওপর বলল—বঙ্কিশোর আবার কি রকম নাম হে! তোমার বাবা মা লেখাপড়া জানত না নাকি? ওটা হবে ব্রজকিশোর। এই অপমানের কথা শুনেও বঙ্কিশোর কিছু বলেনি। সত্য বটে, তার নামটা একটু গোলমেলে, মানেও হয় না। তা বলে কেউ মুখের ওপর বলতে পারে? কিন্তু একে সে নিরীহ, তার ওপর এটা শ্বশুর-বাড়ী। তাই পুরুতমশাইকে মুখের ওপর জবাব দেয়নি।

কাণ্ড আরো আছে। এ বাড়ীতে যেদিন পা দিল সেদিনই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে সে এক দৃশ্য দেখে। খোলা জানালা দিয়ে আঁকশি ঢুকিয়ে ভরভরন্ত জ্যোৎস্না রাতে একটা লোক ঘরের আলনা থেকে তার সোনার বোতাম লাগানো বিয়ের গরদের

পাঞ্জাবীটা সরাচ্ছে। বজ্রকিশোর অনেকক্ষণ ধরে ভেবেও ঠিক করতে পারল না, ব্যাপার কী। একবার মনে হল, চোর এসেছে, পাঞ্জাবি চুরি করছে। আবার মনে হল, ধেৎ শ্বশুরবাড়ীতে কি আব চুরি হয়! শেষ, পর্যন্ত নিশ্চয়ই নেবে না।

কিন্তু নিয়েছিল। চুরিই। ব্যাপারটা যে সে দেখেছে তা আর কবুল করেনি বজ্রকিশোর। মনমরা হয়ে চোরের কিল খাচ্ছে মনে মনে। তার একটা আশা, শ্বশুর-বাড়ী থেকেই যখন চুরি হয়েছে তখন শ্বশুরমশাই হয়তো ফের সোনার বোতাম আব পাঞ্জাবী দেবেন। কিন্তু ত ব কোনো লক্ষণ নেই। পুলিশ এসে নীরস তদন্ত করে গেছে মাত্র।

শ্বশুরবাড়ীতে আসা তক থুপ হয়ে ঘরে বসে থাকে বজ্রকিশোব। বাইরে বেরোতে বা হাঁটাচলা করতে ভারী সংকোচ তার। কিন্তু গত চারদিন ধরে পোলাও, মাছ, মাংস, লুচি, পায়েস ক্রমান্বয়ে খেয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। ফলে পেটটা সবসময় ভার ভার। আজ সকাল থেকে তলপেটে একটা আমাশার ব্যথাও চাগাড় দিচ্ছে। একটু হাঁটাচলা না করলে বায়ুটাও নামবে না।

একা ঘরে সন্তর্পণে পায়চারী করতে থাকে বজ্রকিশোর। আর তখন শুনতে পায় বারবাড়ীতে সেই মাতালটা চেঁচিয়ে বলছে এই শালা ভূতের পুত! তোব লজ্জা করে না আমার বিধবা বউয়ের এক বিঘা জমি মেরে দিলি। বিধবার জমি মেরে স্বর্গে যাবি শুয়োরের বাচ্চা? সইবে? আমার বিধবা অনাথা বউটা বলে কত কষ্ট করে মুখের রক্ত তুলে ছেলেপুলে মানুষ করছে, আর তুই ভূতের পুত, বিধবার জমি নিলি? সেই জমিতে নিজের স্বামী তাড়ানো মেয়েকে বসিয়েছিস রে ভূতের পুত?...

বজ্রকিশোর বুঝতে পারে, মাতালটা যেন কোথায় একটা মস্ত ভুল করছে। কিন্তু ভুলটা ঠিক ধরতে পারে না।

পেটের ব্যথাটা বেশ চাগাড় দিচ্ছে। বেগ পাচ্ছে। একবার পায়খানায় যেতেই হয়। কিন্তু এত বেলায় একবাড়ীলোকের চোখের সামনে জামাই হয়ে যায়ই বা কেমন করে? ভারী অপ্রস্তুত হয়ে থপ করে বসে বেগটা সামাল দিতে চেষ্টা করে বজ্রকিশোর। আর তা করতে গিয়ে তার মুখটা ভারী করুণ হয়ে যায়। ব্যথা বেদনার ভাব ফুটে ওঠে মুখে।

ঠিক সেই সময়ে বড়শালী মনু ঘরে ঢুকে এক গাল হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বলে —চা খাবে নাকি? হচ্ছে কিন্তু...।

এর ওপর চা পড়লে রক্ষে আছে! আতঙ্কিত বজ্রকিশোর বলে—না, না।

মনু তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখে নিয়ে বলে—ঐ মাতাল লোকটার গাল শুনে মন খারাপ করছো ভাই? মুখ শুকনো কেন?

—ও এমনি। বজ্রকিশোর অসহায়ভাবে বলে।

মনু একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—লোকটা যে খুব মিথ্যে বলে তাও নয়। এ বাড়ীতে অনেক গণ্ডগোল। তোমার ভাইরা যে আমাকে নেয় না তার জন্য দায়ী কে বলো তো! বাবা।

বজ্রকিশোর বেগটা প্রায় সামলেই উঠল। এখন স্বাভাবিক লাগছে, তাকাতে পারছে, বুঝতে পারছে। এই মনু মেয়েটা তাও বউ তনুর চেয়ে অনেক সুন্দর। মাজা রং, দীঘল চেহারা, চোখে মুখে একটা অন্যমনস্ক মুগ্ধ ভাব। দেখেই মনে হয়, এ মেয়ে ভাবের রাজ্যের লোক, সংসারের কূট কচালিতে নেই। কেমন সরলভাবে বলল—এ বাড়ীতে অনেক গণ্ডগোল।

মনু একটা জালের আলমারি খুলে পেয়ালা পিরিচ বের করতে করতে আপন মনে বলছিল দশ বিঘে জমি দেবে বলে বিয়ের সময় কথা হয়। শেষ পর্যন্ত দলিল একটা লিখে দিয়েছিল বটে কিন্তু জামাই এসে দখল নিতে গিয়ে দেখে, সেটা দেবোত্তর সম্পত্তি। কী গণ্ডগোলেই যে পড়েছিল লোকটা! কার না রাগ হয় বলো! জমি দেবে না তো দেবে না। তা বলে ভুয়ো দলিল করে নিজের জামাইকে ঠকায় কেউ? সেই থেকে তার এ বাড়ীর ওপর রাগ।

বজ্রকিশোর অবশ্য তনুর কাছে শুনেছে, বড় জামাই বিদ্যাধরের অন্য দোষও আছে। একটা সধবা মেয়ের সঙ্গে তার নাকি সেই ছেলেবেলা থেকে ভাব। সেই মেয়েটাই বিদ্যাধরকে আড়াল থেকে নাচায়। বজ্রকিশোর তাই অবাক হয়ে মনে মনে বলে—কিন্তু তার চরিত্রদোষের কথাটা কি নয় তবে?

মনের কথাটা কি বে-খেয়ালে জোরে বলে ফেলেছিল বিদ্যাধর? নইলে মনু হঠাৎ সোজা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলবে কেন—চরিত্র দোষটা কি পুরুষের কোনো দোষ নাকি? তোমার নেই চরিত্র দোষ?

বজ্রকিশোর হাঁ করে থাকে।

মনু ভারী সুন্দর, দুষ্টু একটু মুচকি হাসি হেসে বলে—যখন তেমন মেয়ের পাল্লায় পড়বে তখন দেখব কেমন ঠিক থাকো। এখন চলো আমার ঘরে। এখানে বসে থাকলে বারবাড়ীর যত গোলমাল কানে আসবে। ঐ বুড়ো লোকটা ভাল নয়, লোকে এসে অ-কথা কু-কথা বলবেই। সেসব তোমার কানে যাওয়ার দরকার নেই।

ভদ্র বজ্রকিশোর কারো আদেশ অমান্য করে না। উঠে পড়ল। এই সুন্দর মেয়েটার পিছু পিছু যেতে বড় ভাল লাগছে তার। এই মেয়েটার সঙ্গে একা কিছুক্ষণ কাটাতে ভীষণ ভাল লাগবে।

মনে কি পাপ আছে ? বজ্রকিশোর আপন মনে জিব কাটে। ছি ছি। না, তা নয়। তবে—

বজ্রকিশোরের মনে পাপ না থাক মনুর মনে আছে। তার ছোটো বোন তনু চিরকালের পাজি। আলায় বালায় ঘুরত, দু দু'বার কুমারী অবস্থায় গর্ভ হয়। রাখালবাঁশি এক বর্ণ মিথ্যে বলে না। সবাই জানে।

সেই তনুর কেমন মেড়া বড় জুটেছে। ডালে আর জলে ভারী বনিবনা। খুব সেদ্ধ হয়েছে ডাল, গলে ক্ষীর হয়ে গেছে। মনুর বুকে একটা বাতাস গোল্লা পাকিয়ে আটকে থাকে। বিদ্যাধরের সঙ্গে তারই ডালে মিশ খেল না।

আগে মনু, পিছনে বজ্রকিশোর। সুপুরি বনের মধ্যে ছিলিবিলি ছায়া আর রোদ। মিঠে বাতাসে গাছপালার গন্ধ। পাখীর ডাক।

শিউলিতলাটা বেছে নিয়ে মনু আস্তে হয়, তারপর থেমে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি বজ্রকিশোরের মুখের ওপর তার টর্চ মারে।

মুচকি হেসে বলে – বেশ, না ?

বজ্রকিশোর কথাটা বোঝে না। কিন্তু মুচকি হাসিটা তার বুকে বিঁধে গিয়ে ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ মিট্ মিট্ করে তাকিয়ে সে ককিয়ে উঠে শ্বাসরোধের গলায় বলে—তুমি বড় ভাল।

চারধারে লোকজন নেই। ছিলিবিলি আলো আর ছায়া। মিঠে হাওয়া। শিউলি ঝোপের ঘন আড়াল।

দু'জনেরই শ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে।

॥ পাঁচ ॥

হারু তান্ত্রিক প্রায়ই বলে—রাখালবাঁশি হে, তন্ত্রের ব্যাপার হল নরবলি। ও না হলে কি সিদ্ধি হয়! কিন্তু বলির জিনিস পাই কোথা বলো ? ধরা পড়লে ফাঁসি।

রাখালবাঁশির তন্ত্রে মন্ত্রে তেমন গা নেই। তবে নরবলিতে তার বিশ্বাস আছে। বেছে বেছে কিছু লোককে যে মায়ের সামনে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়াটা দরকার, এটা সে বোঝে।

পারলে জগবন্ধু সমাজদারকেই নিয়ে গিয়ে বলি দিত। কিন্তু তাতে বড় ঝঞ্ঝাট।

বুড়ো সমাজদারকে গালাগাল দেওয়া শেষ করে টাল্লা খেতে খেতে ফিরবার মুখে রাখালবাঁশি তার জমিটার ধারে একটু দাঁড়ায়। পুরো এক বিঘে। জমিটা আজ থাকলে তার অনাথা বিধবা বউটার কত সুবিধে হ'ত।

বাঁশের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে জমিটা দেখতে দেখতে রাখালবাঁশির চোখে জল আসে। আহা! বিধবার জমি।

রাখালবাঁশি মড় মড করে বাঁশের বেড়া ভাঙতে থাকে টেনে হিঁচড়ে, চেঁচায়—ভূতের পুত! আমার বিধবা বউয়ের জমি নিয়ে মেয়েকে বসিয়েছিস! মুখে গু-উঠবে।

আচমকাই সে থেমে যায়। দেখে, উঠানে একটা জামা হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর মনুর বছর দেড়েকের ছেলেটা 'বাঘা হাম!' 'বাঘা হাম!' বলে হাত তালি দিয়ে খুব হাসছে।

নরবলির কথাটা চড়াং করে মাথায় খেলে যায় রাখালবাঁশির।

জামাটার ভিতর থেকে একটা মুণ্ডু আর চারটে হাত পা বেরিয়ে আসে প্যাংলার। খুব খাতির দেখানো হাসি হাসতে হাসতে প্যাংলা রাখালবাঁশির দিকে চেয়ে বলে—তোমার বউ বিধবা হল কেমন করে গো! তুমি যে বেঁচে আছো।

রাখালবাঁশি বেয়াদবি সহ্য করতে পারে না। ধমকাল—মুখে মুখে কথা বলবি না।

প্যাংলা মিটমিটিয়ে হাসে। আজকাল সে বউ, বিয়ে—এসব কথাও বোঝে।

রাখালবাঁশি হাতছানি দিয়ে ডাকে প্যাংলাকে। কাছে এলে বলে—পাঁচ টাকা পাবি। কাউকে বলবি না। সমাজদারের নাতিটাকে জামায় ঢেকে নিয়ে আয়।

প্যাংলা পাপ পুণ্য ভগবান বলে কিছু শোনেনি। কেউ শেখায়নি। তবে সে টাকাটা বোঝে।

পাঁচ টাকার কথা শুনে প্যাংলা এক গলা হাসল মূলোর ঢেঁকুর উঠল একটা। বড ভাল ঢেঁকুর। বার বার তুলতে ইচ্ছা যায়।

ছেলেটার সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেছে। তাই প্যাংলাকে বেগ পেতে হল না। ঢলঢলে জামার মধ্যে নিয়ে নিল ছেলেটাকে এল ঝটকায়। তারপর দৌড়।

রাখালবাঁশি একটু এগিয়ে বাঁশঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো। দু' হাত বাড়িয়ে খোকাটাকে নিতেই খোকাটা হাসিমুখে চলে যায়। ভারী ভাল খোকা, লোক বাছে না।

প্যাংলা হাত বাড়িয়ে বলে—টাকা দেবে যে!

রাখালবাঁশি চোখ রাঙিয়ে বলে—ধাপ্পাবাজি ছাড। তাগাদা দিবি তো মেরে ফেলব।

—দেবে না তো? তাহলে বলে দেবো।

ভারী বিরক্ত হয়ে রাখালবাঁশি জামার পকেট আর ট্যাঁক খুঁজে দু'টো টাকা আর বিড়ির বাণ্ডিল পেল। তাই দিয়ে বলল—বাকিটা পরে নিস।

সমাজদারের নাতিটাকে বাগে পেয়ে ভারী আনন্দ হয় তার। হারু তান্ত্রিকও খুশী হবে। কতদিন ধরে বেচারা 'নরবলি নরবলি' করছে! বিধবার জমি গাপ করার শোধও নেওয়া হয়ে যাবে। বুঝবে ব্যাটা সমাজদার, জাত সাপের ল্যাজ দিয়ে কান চুলকোনোর মজাটা!

তান্ত্রিক ঘেমে নেয়ে ফিরেছে আখড়ায়। রক্তাম্বর খুলে আদুড় গায়ে নদীর মিঠে বাতাস লাগাচ্ছে। আজ কচি লাউ পেয়েছে একটা তাই দিয়ে ভাল একটা ঘ্যাঁট ভোগ হবে বলে ভাবছিল।

ঠিক এই সময়ে রাখালবাঁশি একটা গ্যাদড়া বাচ্চা কোলে টাল খেতে খেতে হাট-খোলার দিক থেকে নেমে এসে এক গাল হেসে বলে—এই নাও, মাকে উচ্ছুগু করে কেটেকুটে রান্না করো।

হারু হাঁ। অতিকষ্টে বলে—এটা কার রে?

—বুড়ো সমাজদারের নাতি। শালা বিধবার জমি গাপ করছে। যার তার বিধবা নয়, রাখালবাঁশির বিধবা। জাত সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোচ্ছিল শালা ভূতের পুত। এবার দ্যাখ মজা।

হারু তান্ত্রিক বেশী কথার মানুষ নয়। বহু কাল ধরে সে এই গিদ্ধরটার অত্যাচার সহ্য করছে। উঠে তার ভারী হাতে খুব জমিয়ে একটা চড় কষাল রাখাল-বাঁশির বাঁ গালে। পটকার শব্দ হয় তাতে। গ্যাদড়া বাচ্চাটা সেই দেখে গাঁ-গাঁ করে চেঁচাতে থাকে ভয়ে। রাখালবাঁশি পড়ে যাচ্ছিল, হারু তাকে ধরে কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে নিল।

উবু হয়ে বসে রাখালবাঁশি রক্ত মাখা নাল ফেলতে থাকে আর উঁ-উঁ করে কুকুর-ছানার কান্নার মত শব্দ করতে থাকে।

হারু বাচ্চাটাকে চুপ করাতে হাতে বাতাসা দিল। কোলে নিয়ে নাচাল। ভাল বাচ্চা, একটুতেই চুপ করে হাসতে থাকে।

দাঁড়ানো অবস্থাতেই হারু আর একখানা লাথি ঝাড়ে আস্তের ওপর। বলে—ওঠ গাধা! ওঠ বলছি! নইলে চিমটে দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ উপড়ে নেবো। গাঁয়ের মধ্যে ছেলে চুরি! তার সঙ্গে আবার আমাকে জড়ানো! যার বাচ্চা তাকে এক্ষুনি দিয়ে আয়।

রাখালবাঁশি খেঁকিয়ে উঠে বলে—লোকের ভাল করতে নেই! তুমি নরবলির কথা বলতে না!

—চোপ! গলায় বাজ ডেকে ওঠে হারুর। একহাতে চুলের ঝুঁটি ধরে মুরগীর মতো রাখালবাঁশীকে তুলে ফেলে বলে—নরবলির কথা ফের মুখে এনেছিস কি

সামনে অমাবস্যায় তোরই গর্দান যাবে। গেলি বাচ্চা ফেরত দিতে, না কি আরো ওষুধ দিতে হবে।

বাচ্চাটা নিয়ে ভারী বিপদে পড়ে যায় রাখালবাঁশি। তান্ত্রিক ফেরত দেওয়ার পর সোজা নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল।

বউ বলল—ওটা কি?

—বাচ্চা।

—কার?

—আমার।

—মানে?

রাখালবাঁশি একটু গরম খেয়ে বলে—মানে আবার কি? এ ছেলেটা আমার। পালব, পুষব।

বউটা মৃগী রুগীর মতো হঠাৎ চেঁচাতে থাকে বেমাক্কা। সব কথা বুঝতে পারে না রাখালবাঁশি। কিন্তু সেই গোলমালে তার মা, ভাই, ছেলেপুলে, পাড়াপড়শী চোখের পলকে জড়ো হয়ে যায়।

বেকুবের মতো ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে থাকে রাখালবাঁশি। বউ নাগাড়ে চেঁচাচ্ছে। কী বলছে মাগী?

॥ ছয় ॥

সম্পর্কে আটকায়। ভদ্রতায় আটকায়।

এই সুপুরি বনের মধ্যে শিউলি ঝোপের আড়ালে ছিলিবিলি আলো-ছায়া আর মিঠে বাতাসে কত কী ঘটে যেতে পারে।

যাচ্ছিলই। মনু নিজেকে ভারী সুন্দর ভঙ্গীতে ভেঙে একধারে কোমর তুলে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বলে—কাকে ভয় বলো তো?

বঙ্কিশোরের বুক গলা শুকিয়ে কাঠ। সবই তো খোলাখুলি, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জলের মতো। সকালের দিকে লোকের কামবোধ কম থাকে। কিন্তু সেটাও বেশ চড় চড় করে চেগে উঠছে আজ।

বঙ্কিশোর বলে—ভয়? না। ভয় আবার কাকে?

—তবে কি ঘেন্না?

—দূর।

—তবে?

বঙ্কিশোর ঠিক বোঝাতে পারে না। তবে জানে মনুর সঙ্গে যদি আজ তার

ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় তো সারাজীবনের মতো দুজনেই দাগী হয়ে গেল। গোপন সম্পর্কের পাপবোধ খোঁচাবে মরা ইস্তক। গোপন যেখানে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সেইখানেই দুর্বলতা, সেইখানেই পাপ।

মনু মনে মনে ভারী হাসে। মেড়াটা ঘামছে, ভয় খাচ্ছে। চেহারাটা বেশ বজ্রকিশোরের, ফরসা, লম্বা তাগড়াই। কিন্তু চেহারাতেই মানুষটা শেষ।

এমনি হলে এ লোকের সঙ্গে ভাব করতে যেত নাকি মনু? ওয়াক থুঃ!

কিন্তু তনুর এত সুখ কেন এইটেই ভেবে কূল পায় না মনু।

মেড়াটা যদি পিছিয়ে যায় এখন তবে মনুর বড় লজ্জা। সে তাই আর সময় দিল না। এক পা এগিয়ে বজ্রকিশোরের হাতটা ধরে বলল—তুমি কেমন পুরুষ মানুষ? তপ্ত হও কেন? কামড়াচ্ছে নাকি?

বজ্রকিশোরের আমাশার বেগটা চলে গিয়েছিল। এখন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো তলপেট মন্থন করে বেগটা এল।

মনু হঠাৎ দেখে, এই ছিল বজ্রকিশোর—হাতে ধরা কাপুরুষ—পরমুহূর্তেই নেই হয়ে গেল লোকটা। সুপুরিবনের ভিতর দিয়ে বুনো ঘোড়ার মতো ছুটছে উত্তরে আগাছার জঙ্গলের দিকে।

একটু অবাক হল মনু। তারপরই হঠাৎ আকাশ ভেঙে লজ্জা নেমে এল তার মাথায়।

এমন কাজ সে আর কখনো করেনি। এই প্রথম সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল। নিজের তনুর, বজ্রকিশোরের, নিজের ছেলের, এমন কি বিদ্যাধরেরও। আজ সকাল থেকে ভূতে পেয়েছিল তাকে। ছিঃ ছিঃ!

ছেলেটা একা উঠোনে খেলছে। কাঁদছে বোধ হয়।

মনু তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। তার রোগা ছেলেটা দেড় বছর বয়সেও হাঁটতে পারে না দাঁড়াতে পারে না। কত ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ফল হয় না। সারাদিন শুয়ে বসে খেলে। ছেলের কথা ভেবে হঠাৎ চোখে জল এল তার। ভাবল, আমি তো কেবল মেয়েমানুষ নই, মাও তো। মা হলে আর মেয়েমানুষ সাজবার দরকার কি?

উঠোনে পা দিয়ে মনু অবাক। আনন্দে আর সুখে গায়ে শুঁয়ো পোকার মতো কাঁটা দিল। এ কী! তার ছেলেটা দাওয়া ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে যে!

আগাছার জঙ্গলে ঢুকে বজ্রকিশোর খালাস হল। সেই সঙ্গে একটা জ্ঞানের দৃষ্টিও খুলে গেল তার। মনে হল এই যে আমাশার অভদ্র বেগ, এর মধ্যেও কি ভগবান নেই?

॥ সাত ॥

বাঁশঝোপে বসে তিন তিনটে মুলো খেল প্যাংলা। তারপব বিড়ি ধরাল। আস্ত বিড়ি। ট্যাঁকে দুটো টাকা আছে। ঢলঢলে জামার মধ্যে বসে প্যাংলা চারদিক দেখে। রেলগাড়ির মতো নদী বয়ে যায়, আকাশে নৌকোর মতো মেঘ ভাসে, চারদিকে দুধের পুকুরের মতো রোদ। ভারী ভাল লাগে প্যাংলার।

চরেদিকে কত কী ব্যাপার হয। প্যাংলা তার সব বোঝে না। কিন্তু জানে, যত যাই হোক, আবার ঠিক সূর্য উঠবে। দিন হবে। রাত হবে। খিদে পাবে। দিনটা কোনদিন ভাল যাবে। কোনদিন যাবে না।

আজকের দিনটা ভালই গেল প্যাংলার। একটু আগেই দেখেছে, রাখালবাঁশি চুপিসাড়ে এসে মনুদিদির ছেলেকে ফিবিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু প্যাংলার কাছে টাকা বা বিড়ি ফেরত চাইল না।

॥ মেঘ–বৃষ্টি–রোদ্দুর ॥

শমিতা ভাবছিল।

ভাবছিল বিয়ের পরেও চাকরিটা তাকে বজায় রাখতে হবে কি না।

শরীর ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ছে তার। দশটা পাঁচটার ধকল। আগ্রাসী সংসারের জন্য অষ্টপ্রহর চিন্তা। গানের টিউশানি। এমি সব নৈমিত্তিক একঘেয়ে কাজের আবর্তে জীবনের প্রতিটি দিন দ্রুতগামী কোন গাড়ির মত অসম্ভব দ্রুতভাবে কেবলই এগিয়ে চলেছে সামনে—আরো সামনে। মাঝখান থেকে একা সেই শুধু নিঃশেষে ফুরিয়ে যাচ্ছে। বুড়িয়ে যাচ্ছে। অনবরত।

পিছনে পড়ে থাকছে অনেকগুলি পরিচিত মুখ। কিছু সুন্দর মুহূর্তের স্মৃতি। বিশেষ একটি মানুষ। বিভূতি।

এমন অনেক কিছুই ভাবে শমিতা। ভাবনার সে তরঙ্গে পথভোলা কোন পথিকের মত বিভূতির কথা কখনো মনে হলেও সঞ্চিত সেই স্মৃতির ভার এবার থেকে শমিতাকে হাল্কা করতে হবে। কেননা দিনকয়েকের মধ্যেই সে পরস্ত্রী হতে চলেছে। শালকিয়ার বাসিন্দা, সংসারে একান্তই নিঃসঙ্গ প্রসূণবাবুর স্ত্রী। ক্লাস ওয়ান অফিসারের ঘরণী।

সম্বন্ধটা শমিতার বড় জামাইবাবুই এনেছিলেন। প্রসূণের অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট বন্ধু তিনি। সেই সুবাদেই সহজ সরল নিঃসঙ্গ প্রসূণকে বিনয় খুব সহজেই রাজি করাতে পেরেছিল।

একটিই মাত্র দিনের দেখা। লজ্জিত ভাষায় দু চারটি প্রশ্নোত্তর। তাতেই সন্তুষ্ট প্রসূণ সম্মতি দিয়েছিল। বিয়ে আগামী মাসের তিন তারিখে। গোধূলী লগ্নে।

এসব কথা ভাবলে নিজেরই আশ্চর্যান্বিত না হয়ে উপায় থাকে না। কারণ বিয়ের ইন্টারভিউ-এর পিঁড়িতে বসে আড়চোখে ভালভাবেই প্রসূণকে দেখেছে সে। বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষালী চেহারা। মাথাভর্তি একরাশ ঘণ কোঁকড়ানো চুল। দীর্ঘকায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণের এক আশ্চর্য সুপুরুষ। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখবার মতই চেহারা বটে।

তুলনামূলকভাবে ওর পাশে আকর্ষণশূন্য অতি সাধারণ বেঁটে তুচ্ছ নিজেকে শমিতার অসম্ভব বেমানান এবং অযোগ্য বলে মনে হতে থাকে। সর্বোপরি বাঁ নাকের ধার ঘেঁসে গুটিকয়েক লোমসহ বিশ্রী আঁচিলখানার দুর্বলতা তো রয়েইছে। ভবিষ্যৎ ভেবে তাই তো চিন্তা হয় শমিতার। ভাবে কী দেখে প্রসূণ যে তাকে পছন্দ করল কে জানে। আশ্চর্য রুচি বটে মানুষের।

বিভূতি কেও তো দেখেছে সে। প্রসূণের মত সে মানুষটা এতখানি সুদর্শন হয়ত নয়, তবে অসম্ভব সপ্রতিভ। উজ্জ্বল। প্রতিভাদীপ্ত ওর চোখ দু'খানির মধ্যে শমিতা বরাবরই কী একটা অব্যক্ত গভীরতা যেন লক্ষ্য করে এসেছে। বিভূতির সেই গাম্ভীর্যের কাছে ক্ষণিকের দেখা প্রসূণের স্বভাব খানিকটা উচ্ছল প্রকৃতির বোধ হওয়া স্বাভাবিক। কে জানে ওটা প্রসূণের খোলস কিনা কিংবা সহজাত প্রবৃত্তি।

॥ দুই ॥

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নিয়মশূন্য একটি পরিবারে মানুষ হয়েছে শমিতা। তর তবিয়ে নয়, বেড়ে উঠেছে একান্তই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দুবেলা নয় প্লাস নয়—মোট আঠারটি মুখের অন্ন জুগিয়ে উঠতে জ্ঞান হয়ে অবধি বাবাকে শমিতা হামেশাই নাজেহাল হতে দেখে আসছে। তারপর হঠাৎ করে সওদাগরী অফিসে টাইপিস্টের এই কাজখানা জুটে যাওয়ার পরেও সংসারের পরিচিত দৈন্যে বিন্দুমাত্র সুখের আভাষ স্পষ্ট হয়নি!

শমিতার কষ্টটা ঠিক ওখানেই।

বাবা সদানন্দবাবু আগাগোড়াই সদাশিব মানুষ, সংসারের জটিল ঘোর প্যাঁচ বোঝেন না। মাস-মাইনের পুরো টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত তিনি। অফিসের পর বাকি সময়টুকু পূজা অর্চা, ধর্মগ্রন্থপাঠেই দিব্যি কাটিয়ে দেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোন বাড়তি চাহিদা নেই। দু'বেলা যাহোক কিছু দু'মুঠো পেলেই তিনি শান্ত, শিব।

স্বামীর এই ঔদাসীন্যের সুযোগেই হয়ত শমিতার মায়ের এই ছন্নছাড়া বে-হিসেবী অবস্থা। তা না হলে বাবার মোট টাকার সঙ্গে নিজের সাড়ে তিন'শ টাকা যোগ করেও কেন সংসারের অনটনে খানিকটা সচ্ছলতা আসে না!

তা' কেন আসেনি—তেমন প্রশ্ন তুললে মা'র সামনে শমিতাকে অসম্ভব ছোট হতে হয়। তেমন প্রশ্ন অন্ততঃ মাকে শমিতা করতে পারে না। কারণ, মাকে সে ভালভাবেই চেনে। নিজস্ব সংসারের সামান্য ঘটনাকে প্রতিবেশীর কাছে সাতকাহন করে ব্যাখ্যা করতে তাঁর জুড়ি নেই এ তল্লাটে। তাছাড়া পরের সামান্যতম দুঃখে

নিজের প্রয়োজনীয় সংসারের জিনিসপত্র অপরকে দুহাতে উজাড় করে দান করতেও সিদ্ধহস্ত তিনি বারণ করলেও শুনবে না। বরং বিজ্ঞের মত জ্ঞান দিয়ে বলবে—এ জন্মে পরের উপকার করলে পরজন্মে এর চারগুণ পাবি—বুঝলি ?

ধর্মকর্মে নিমগ্ন মানুষ সদানন্দ কোনদিনই এসব বুঝতে চাননি। কিন্তু শমিতা তো পরিশ্রমের মূল্য বোঝে। রক্তজল করে আনা টাকা-পয়সার এমন যথেচ্ছ দান-খয়রাতি কেন সে বরদাস্ত করবে ?

ঝগড়া নয়, বচসা নয় —ধীর স্থির সংযত ভাষায় সে তাই অবুঝ মাকে বোঝাতে চেয়েছিল। বলেছিল—দ্যাখ মা, আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে দান খয়রাত করে পুণ্যার্জনের চেষ্টা একটা মিথ্যে বিলাসিতা মাত্র। তাছাড়া নিজের পেট মেরে পরের মুখে তাৎক্ষণিক হাসি ফুটিয়ে সত্যি সত্যিই কি পরজন্মের পথ প্রশস্ত হয় না ?

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের এতখানি গভীরে না তলাতে নারাজ। শমিতার সমস্ত সপ্রশ্ন যুক্তি তাই বৃথা অরণ্যে রোদনের পর্যায়ে চলে যায়। ফলে মাসের মাঝামাঝি এসে বাপ মেয়ে উভয়কেই দিব্যি হোঁচট খেতে হয় সংসারের আগ্রাসী ঘাটতির ফর্দ দেখে, অথচ ঘাটতি বাজেট পেশ করেই মায়ের ডিউটি খতম।—“মর তোরা, আমার কি—দু'বেলা দু'মুঠো যা হোক পেলেই হ'ল। সংসারে কে কার”।— মায়ের ভাবখানা তখন এম্নিই দাঁড়ায়।

অথচ মায়ের এই উদাসীন টানটান ভঙ্গীতে বেকার ভাই দুটি দিব্যি বুক চিতিয়ে আছে। এবং স্বগৌরবেই। বাজার সরকারের ভার দিলেই ওরা পয়সা মারে। মায়ের আঁচলের ফসকা গেরো খুলতে বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। পয়সা ওদের চাই-ই-চাই। তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন। নইলে লুকিয়ে সিগারেট টানার এজমালী অভ্যেসে জং ধরে যায়। সিনেমার থার্ডক্লাসের খিঞ্জি লাইনে অভ্যস্ত দাদাগিরির গৌরবে ভাঁটা পড়ার চান্স থাকে। মায়ের সুচারু আদর এবং আস্কারা-তেই নিলু এবং বিজু এখন সম্পূর্ণ শাসনের বাইরে বনেছে লেজ বিহীন দুটি আদর্শ বানর। অবশিষ্ট চারটি বোনের মধ্যে মেয়েটি একেবারেই দুগ্ধপোষ্য, উপরের তিনটি এখনো স্কুলের মুখ দেখেনি। কবে দেখবে কিংবা আদৌ তা তাদের দেখান হবে কিনা কে বলবে তা' !

বিভূতির দিকে ঝুঁকলে তাও বা আশা ছিল কিছুটা। ভাই দু'টির চাকরীর ব্যাপারে বিভূতি নিজেই কয়েকবার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিল। শমিতাই তখন গা করেনি। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, বিভূতি নক্করের মত সামান্য একজন কেরানীর কথাকে।

তারপর হঠাৎ বিভূতিকে ভুলবার পরোয়ানা এল। প্রসূণ এসে পছন্দ করে গেল শমিতাকে। দেনা পাওনা, দিনস্থির, পাকাদেখা—সব কিছুই একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে গেল শমিতার জামাই বাবু বিনয়ের মধ্যস্থতায়। সঙ্গত কারণেই বিভূতি পর হয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। কেননা, বর্ণের মিল হ'ল না। বিভূতির মত নীচু জাতের ছেলের সঙ্গে অসবর্ণ বিয়ের :ব্যাপারে শমিতার মা-ই সর্বপ্রথম বেঁকে বসলেন। নিভৃতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের দলে টানলেন সদাশিব স্বামীকে। সেই প্ররোচনায় এসে যোগ দিল শমিতার বড়দি নীমা এবং জামাইবাবু বিনয়।

॥ তিন ॥

হয়তো শেষ বারের মতই বিভূতির অনুরোধে শমিতা এসেছিল ইডেনের সেই পরিচিত স্থানটিতে। বসেছিল পাশাপাশি। পশ্চিমাকাশের ম্লান সূর্য সেদিন মেঘের আড়ালে থেকে থেকেই ডুব দিচ্ছিল। শমিতার দুচোখে ভেসে উঠেছিল সমবেদনার অশ্রু। লজ্জিত কণ্ঠে অপারগ শমিতা অবশেষে ব্যক্ত করেছিল নিজের অক্ষমতার কাহিনী।

বিয়ের ব্যাপারে শমিতার অক্ষমতার কাহিনী শুনে বিভূতি হতবাক হয়েছিল। মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গিয়েছিল ভাষা হারিয়ে। তাই বেহায়া কোন ব্যর্থ-অনুরোধ-টনুরোধের ধার কাছ দিয়েও সে গেল না। কারণ তার মত নিম্নবর্ণের সাধারণ এক বিত্তহীন মানুষের ঘরণী হয়ে শমিতার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোক তেমন নিষ্ফল দাবী বিভূতি অন্ততঃ জানাতে পারবে না।

এহেন মানসিক দৃঢ়তার বলেই হয়তো আশ্চর্যভাবে প্রতিবাদহীন করুণনেত্রে বিভূতি সেদিন উঠে আসতে পেরেছিল শমিতার পাশ থেকে। এবং মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিল—ঈশ্বর শমিতাকে তুমি সুখী করো, শান্তিতে রেখো।

—তবু বলবো দোষ শমিতার। কচি খুকুটি নয়—উনত্রিশ বছরের একটি সাবালিকা সে। সেচ্ছায় রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করলে আইন তার বিপক্ষে যেতে পারতো কি? কই, সে তো তা করলো না। বড চাকুরে, বেশী মাইনে অথণ্ড সুখ, সুদৃশ্য ফ্ল্যাট, গাড়ি, চাকর-বাকর—এসব সুখ-সাধনের কথা ভেবেই না গদগদ কণ্ঠে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নাক ঘুরিয়ে তখন লাথিটা মারলে তোকে। আর তুই, শালা হিজড়ের মত থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ফিরে এলি। আর এসেই বিরহ যন্ত্রণায় কাতর মুখখানা সর্বক্ষণ আমসী করে রেখেছিস। ছ্যাঃ, এই তোদের প্রেম না আমার ইয়ে……! বিলাস থামতেই তার কথার খেই ধরে সুধীর কিছু বলতে যাচ্ছে দেখেই চেয়ার ছেড়ে বিভূতি উঠে পড়ে। তারপর বিলবাবদ পুরো

পাঁচ টাকার একখানা নোট "ইভিনিং রেস্টুরেন্ট"—এর মালিক সুবল সামন্তের হাতে তুলে দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে যায় সোজা টালাপার্কের দিকে, নির্জন কোনখানে বিভূতির হঠাৎ এই ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করে বিলাস আর সুবীর তো হেসেই অস্থির।

বিয়ের ঠিক দুদিন আগে অফিসের ঠিকানায় বিভূতি পেল সমিতার চিঠিসহ বিয়ের সুদৃশ্য একটি ইনভিটেশান কার্ড। তাতে শমিতার ব্যক্তিগত দুঃখ মিশ্রিত সহানুভূতি প্রকাশের সঙ্গে তার বিয়েতে বিভূতির আবশ্যিক উপস্থিতির জন্য ছিল বিনীত অনুরোধ।

শমিতার এসব দুঃসহ ছেলেমানুষীর কথা চিন্তা করলে দুঃখের চেয়ে বরং বিভূতির হাসিরই উদ্রেক হয় বেশী। ভাবে, নিমন্ত্রণের নাম করে শমিত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতভাবে আর তাকে বোকা বানাবে ?

তাই ওর বিয়ের দিনটাতেও যথারীতি বিভূতি অফিস করল। কাছেপিঠের একটা টেলিগ্রাফ অফিস থেকে শমিতার নামে পাঠাল একখানা গ্রিটিংস্ টেলিগ্রাম তার-মারফৎ সামান্য এই আশীর্বাদটুকু ছাড়া বিভূতির কি-ই বা আর দেওয়ার ছিল ? শমিতার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরই চোখের সামনে অপরের হাতের মধ্যে নিশ্চিন্তে হাত রেখে—"যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম"—চিরাচরিত এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শমিতা ক্রমশঃই অন্যের হয়ে যাবে তা শুধু বিভূতি কেন—যে কোন ব্যর্থ প্রেমিকের পক্ষে সামনে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা শুধু অসম্ভবই নয়—সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ও বটে।

অসম্ভব ভেবেই বিভূতি যায় নি। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছে।

অথচ বিয়ের পর মাত্র পক্ষকাল উত্তীর্ণ হতে না হতেই অভিমানেভরা শমিতার একখানা ছবি বিভূতি পেয়েও উত্তর দেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করে নি। ওদের নতুন ফ্ল্যাটে খাওয়ার জন্য চিঠিতে ভীষণ পীড়াপীড়ি করেছিল শমিতা। বিভূতি তা ভ্রুক্ষেপও করেনি। শমিতারই মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করে। শমিতার নতুন সংসারে বিভূতি আগাছার মত একটা তুচ্ছ উপদ্রব হয়ে উঠতে পারে না। তার আকস্মিক উপস্থিতি (তা যে কোন বানানো মিথ্যে সম্পর্কের সূত্রে হোক না কেন) শমিতার পরিপাটি সুখী জীবনে সহসা বিপর্যয় ডেকে আনুক বিভূতির পক্ষে কোনক্রমেই তা কাম্য হতে পারে না বলেই সে এখন উদাসীন থাকতে চেয়েছে। চেষ্টা করেছে মনের মুকুর থেকে অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে। শমিতাকে ভুলে থাকতে।

অথচ পেরে উঠছে কোথায় ? পারছে, কই সংযমের বন্ধনীতে নিজের শিথিল

মনটাকে শক্ত করে বাঁধতে। সে চেষ্টা যতবারই করেছে অতর্কিতে ততবারই এসে হাজির হয়েছে শমিতার চিঠি; ওর সংসারের যতকিছু তাজা খবরাখবর বয়ে নিয়ে। বিগত একটি বছর ধরে এমনিই চলে আসছে। সপ্তাহে অন্ততঃ একটি করে চিঠি শমিতা লিখে এসেছে। বিভূতিকে। জবাবের প্রত্যাশা না করেই বোধকরি লিখেছে সে। অনলস ভঙ্গীতে। নিয়ম করে।

॥ চার ॥

পিছুটানশূন্য একা মানুষ বিভূতির সংসার পাতবার সাধ মিটে গেছে। যৌবনের সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষায় আগুন ধরিয়ে শমিতা চলে যাওয়ার পর থেকে বিভূতি কি তাহলে সাত্ত্বিক বিবাগী পুরুষ বনে যাবে? যৌবনের চাহিদা থেকে নেবে নিজেকে গুটিয়ে? মনের অন্তরঙ্গে তেমন ইচ্ছে বিভূতির হয়তো ছিল, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর সবসময় শেষ রক্ষা হয়ে ওঠে না। তা হয় না বলেই বিভূতির সবকিছু ভেস্তে দিতে এল বুঝি বিকশিত যৌবনা শংকরী।

এ্যাদ্দিন শংকরীর মা বিভূতির সংসারের যাবতীয় কাজ সামলাতো। পরিবর্তে দু'বেলা খাওয়া পরা সহ পেত মোট ত্রিশটাকা। অবশেষে বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং বাতের অসহ্য টাটানিতে বিপর্যস্ত সুরবালা নিজের অক্ষমতার কথা জানালো বিভূতিকে। এবং শূন্য কর্মস্থলে যাওয়ার আগে একমাত্র মেয়ে শংকরীকে বিভূতির যাবতীয় দেখাশোনার ভারটুকু অবশ্যই দিয়ে গেল।

মা ও মেয়ে উভয়ে নিশ্চিন্ত হলেও অন্যত্র শংকরীর উদ্দাম যৌবনের উত্তাপে বিভূতির নরম যৌবন গলতে শুরু করল।

বয়সের অনুপাতে শংকরীর বাড়ন্ত শরীর ওর ফিনফিনে ফ্রকের বাধা মানতে চাইত না। সামান্যতম শৈথিল্যেই মারত উঁকিঝুঁকি। বিশেষকরে শংকরী যখন সংক্ষিপ্ত ঝাঁটা হাতে নিজের সুধাম দেহবল্লরী সামনে ঝুলিয়ে মেঝেয় ঝাঁট দিত তখন। বুক বরাবর ওর ঢিলে ফ্রক আলগা হয়ে ঝুলে পড়ত সামনে। আর লুব্ধ ওর স্তনযুগল একজোড়া শঙ্খের মত যেন মেঝের ওপর নেমে থাকতে চাইত। প্রায়ই লোভনীয় সে দৃশ্য বিভূতির নজরে আটকাত। তাতে বিভূতির নিস্তেজ যৌবন উত্তেজনার চরম আগুনে জ্বলত ধিকি-ধিকি। রাতের সমস্ত কাজ সেরে শংকরী বাড়ী ফিরে গেলেই দুঃসহ এক অদ্ভুত যন্ত্রণার আবেগে আপ্লুত হত বিভূতি।

একি হ'ল বিভূতির! ঘরে শংকরী, বাইরে শমিতা—দু'জনে মিলে ওরা কি বিভূতিকে পাগল করে ছাড়বে?

দেহের সবকটি কোষে যখন যৌবন উন্মত্ত হয়ে দোল খাচ্ছিল ঠিক তখনই এল

শমিতার সেই চিঠি। কাতর আহ্বান। শেষবারের মত বিভূতিকে সে দেখতে চায়। কঠিন রোগশয্যায় জীর্ণ জীবনের এক একটি দিনকে শমিতা হারাচ্ছে। কোন কথা নয়। কোন অজুহাত শমিতা শুনতে চায় না। আসতেই হবে বিভূতিকে।

বিভূতি পারল না। এবার আর উপেক্ষা করা গেল না শমিতাকে। অতএব সে যাবে। শত পর হোক এখন—তবু একদার অন্তরঙ্গ সাথী তার একান্তই প্রিয় সমিতাকে অন্ততঃ একবারটির জন্য গিয়ে সে দেখে আসবেই। শনিবারের অফিস সেরে সে তাই বেরিয়ে পড়ল। ঠিকানা মিলিয়ে সন্ধের মুখোমুখি সটান গিয়ে হাজির হল শমিতার সুদৃশ্য ফ্ল্যাটের দরজায় কলিংবেল। টিপে অপেক্ষা করতে হ'ল না। হাসিমুখে দরজাখুলে সশরীরে শমিতা এসে দাঁড়ালো বিভূতির সামনে। যেন তারই অপেক্ষায় শমিতা তৈরী ছিল এতক্ষণ।

শমিতাকে দেখে বিভূতি তো থ। একবছর আগের লিকলিকে হাড়হাড় শমিতাকে এখন যেন চেনাই যায় না। ওর দেহের প্রতিটি অংশে পরিপূর্ণ পুষ্টির নিদর্শন আজ ভীষণ স্পষ্ট। ফুলে ফেঁপে শমিতা সত্যিই এখন উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে মনে মনে বিভূতি ভাবছিল—এই নাকি অসুস্থ শমিতা! রোগশয্যায় শমিতা অন্তিম পথের যাত্রী।

কি হল, ভেতরে এস।

ও হ্যাঁ, চলো।

দরজা বন্ধ করে ড্রয়িং রুম ডিঙিয়ে বিভূতিকে শমিতা একেবারে এনে তুলল নিজের পরিপাটি বেডরুমে। তারপর বলল—এখন কি খাবে বল? চা, কফি না ঠাণ্ডা কোন ড্রিংকস্।

কিছু না, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস—নিস্পৃহকণ্ঠে বিভূতি উত্তর দিল।

ওমা—সেকি! এই প্রথম তুমি আমার বাড়ীতে এলে, আর আমি কিনা স্রেফ একগ্লাস জল খাইয়ে তোমায় ছেড়ে দেব ভেবেছ? তুমি বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।

শমিতার তুলতুলে নিভাঁজ শয্যার ওপর বসে অস্বস্তি হচ্ছিল। স্তিমিত আলোর মধ্যে শমিতার গোছানো বেডরুম যেন স্বপ্ন পুরীর মত মনে হচ্ছিল বিভূতির। এত সুখ, এমন ঐশ্বর্য, এতখানি বিলাস তার পক্ষে শমিতাকে দেয়া কখননই সম্ভব হতো না। শমিতা সত্যই ভাগ্যবতী। মনে মনে যা চেয়েছিল তার অতিরিক্তই বোধকরি সে পেয়েছে। শমিতার মত বিভূতিও আজ মনেপ্রাণে তৃপ্ত, শমিতার সুখে সুখী।

একটু বাদেই প্লেটে একরাশ খাবার সাজিয়ে বিভূতির সামনে এসে হাজির হল শমিতা। সংক্ষিপ্ত একখানা টুল বিভূতির সামনে এগিয়ে দিয়ে খাবারের প্লেটখানা নামিয়ে রাখল সেটার ওপর। তারপর ফ্রিজ থেকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে বলল—নাও, শুরু কর। শুধু একখানা সন্দেশ প্লেট থেকে তুলে মুখে দিল বিভূতি। বাঁ হাতে জলের গ্লাসখানা তুলে তৃষ্ণা নিবারণ করে বলল—ওগুলো নিয়ে যাও শমি। যতটুকু খাওয়ার তা আমি খেয়েছি। তাছাড়া তোমার এখানে খাওয়ার জন্য তো আসিনি। গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই এসেছিলাম তোমায় দেখতে। অথচ…

আমি তা জানি। আর এও জানতাম এমন করে একটা দুঃসংবাদ না পাঠালে কোনদিনই আমার এখানে তুমি আসতে না। তাই এইটিবার তোমায় দেখার জন্য বাধ্য হয়েই এই মিথ্যের আশ্রয়টুকু নিতে হল। এতে রাগ করনি তো তুমি?

না, রাগ করবো কেন? শুধু তোমাকে দেখে আজ আমার ভীষণ অদ্ভুত লাগছে। বড় মানুষের ঘরণী হয়ে কত বদলে গেছ তুমি!

তাই বুঝি?—শমিতা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল এবার। তারপর বলল—তা বদলে যাওয়ার দোষটা কোথায় বল? আসলে দোষ বোধকরি বড়লোক মানুষের ঘরণী হওয়ার সুবাদেই গড়ে উঠে থাকবে।

হুম, তাই বটে। বিভূতির কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল। তবু প্রশ্ন করল—কই তোমার স্বামী প্রসূণবাবুকে দেখছি না তো? অফিস থেকে ফেরার সময় হয়নি বুঝি?

না—না, তা কেন? এর আগেই ও বাড়ী ফেরে।

তাহলে?

রিসেন্টলি অফিসের কাজে ও মাস খানেকের ট্যুরে বেরিয়েছে কিনা, তাই।

ও তাই বল। কিন্তু তোমার চাকরেরা গেল কোথায়?

চাকর তো নেই, চাকরাণী আছে দু'জন। দু'দিন হ'ল সপ্তাহ খানেকের ছুটি নিয়ে তারাও দেশে গেছে। বাড়ীতে এখন আমি সম্পূর্ণ একা। নিঃসঙ্গ। সময় কাটতে চায়না। আগে সন্ধ্যে হলে টি. ভি. দেখতাম। এখন আর ভাল্লাগে না। বড্ড একঘেয়ে মনে হয়। তাই তো তোমাকে লিখলাম।

শমিতার অদ্ভুত এই সখের কথা শুনে বিভূতির বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। বিভূতি কি শমিতার খেলার পুতুল, অবসর বিনোদনের সামগ্রী অথবা প্রবাসী স্বামীর অভাব পূরণের বিকল্প আয়ুধ বিশেষ?

বিভূতির মাথার মধ্যে সবকিছুই ক্রমশঃ তালগোল পাকাতে থাকে। তবু তারই মধ্যে কৌতূহলী হয়ে বলে—বছর খানেকের ওপর তো হল বিয়ে হয়েছে, তোমাদের, এখনো কোলশূণ্য কেন তোমার?

বিভূতির আকস্মিক এই প্রশ্নে শমিতার উজ্জ্বল মুখের হাসি নিমেষে নিভে গিয়ে সহসা তা দুর্বার কান্নার রূপ নিল। গভীর চোখের দু কোণে হতাশামিশ্রিত দুঃখের করুণ অশ্রু ওঠে স্পষ্ট হয়ে। আচমকা বিভূতির প্রশস্ত বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের সজল মুখখানা ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শমিতা।

অপ্রস্তুত বিভূতি এখন কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। কান্নার আবেগে শমিতা যে ঠিক কি বলতে চায় তাও বিভূতির বোধের অগম্য। নম্রকণ্ঠে তাই প্রশ্ন করে—কি হল শমি? তুমি কাঁদছ কেন এমন করে? লক্ষ্মীটি মুখ তোল। বল কি হয়েছে তোমার? সত্যি বলছি, কষ্ট পাবে জানলে এ প্রশ্ন তোমায় করতাম না। শমি, কেঁদোনা—প্লীজ।

বিভূতির সান্ত্বনায় শমিতার কান্নার বেগ এবার যেন ধরে আসে। সে এখন কিছু বলতে চায়। শমিতার ভেজা ঠোঁট ও দুচোখে তারই আভাষ বিভূতি অনুভব করতে পেরে বলে—বলোই না শমি, কি হয়েছে তোমার?

ক্লান্ত শমিতার চোখে ব্যর্থতার আবেগ উপচে পড়ে।

আমি হেরে গেছি, আমি প্রতারিত হয়েছি বিভূতি। কোনদিনও আমি আর মা হতে পারব না। মাতৃত্বের সম্ভাবনাশূণ্য নিষ্ফল জীবনের কি দাম আছে বলতে পার তুমি?

কেন কি হয়েছে তোমার? কেন তুমি মা হতে পারবে না শমি?—বিভূতি চকিতে প্রশ্ন করে বসে।

প্রসূন নির্মমভাবে ঠকিয়েছে আমাকে। নিজের অক্ষমতার কথা জেনেও এই সর্বনাশ ও কেন করল বলতে পার তুমি?

বিভূতি নিরুত্তর। সান্ত্বনা দেবার মত কোন যুতসই ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না এখন। শুধু ভাবছে—বিধাতার কি নির্মম পরিহাস, প্রকৃতির কি আজব বিচার। মানুষ কত বেশী স্বার্থপর কিংবা কতদূর অক্ষম।

॥ পাঁচ ॥

শমিতার সুদক্ষ কান্নায় বিভূতি কি অবশেষে গলে গেল, নাকি সুপ্ত কোন আবশ্যিক ইচ্ছা পূরণের তাগিদে সে রাতে শমিতার নির্জন ফ্ল্যাটে বিভূতি রয়ে গেল?

কার অনুরোধ কিংবা ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল বলা শক্ত। কিন্তু রাতের তারারা দিনের আলোর আভাষে ভীষণ লজ্জা পাওয়ার আগেই লজ্জিত, পরাজিত, ঘৃণ্য বিভূতি পরিতৃপ্ত ঘুমন্ত শমিতার বিছানা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল

কোলকাতা থেকে বহু দূরে—নির্জন অজানা কোন প্রদেশে, পরিচিত মানুষের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে দুস্তর কোন পার্থক্যে।

অন্তত্র দশমাস দশদিন উত্তীণ করে শমিতার কোলে এল সম্ভাব্য সেই সন্তান। খুব ভরল শমিতার। প্রসূণের মুখেও ফুটল হাসি। কিন্তু শমিতা কি জানত প্রসূনের সেই হাসি নির্মমভাবে এতখানি ব্যর্থ্যক হবে?

হলোও তাই। নেক্সট ট্যুরে নিজেই ড্রাইভ করে অফিসের কাছে একা প্রসূন এবার বাইরে গেল। মাত্র সাত দিনের ট্যুরে।

অথচ পুরো সাতটাদিন উত্তীর্ণ হবার আগেই কার-অ্যাক্সিডেন্টে প্রসূণের মৃত্যু সংবাদটা সংবাদপত্রের এককোণে ছেপে বেরুল।

সে সংবাদে পরনের উগ্র শাড়িখানা বদলে চিকনের কারুকার্য শোভিত দামী সাদা সিফনের শাড়ি পরেছিল সমিতা। কাঁদেনি একটুও।

অক্ষম প্রসূনের জন্য কোনকালেই কি তবে শমিতার বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না, কে বলবে তা?…

মহাভারতীয় কুন্তীর মত শমিতাও আজ সমান গর্বিতা। সে এখন জননী। তার প্রশস্ত কোলে বিভূতির সন্তান প্রসূনের মির্মম স্মৃতিকে ভুলে থাকতে না সাহায্য করবে।

জানিনা এ সংবাদ পেলে প্রসূনের মত বিভূতিও আত্মঘাতী হবে কিনা। কারণ ঘৃন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্মমভাবেই হওয়া দরকার। তাতে বিচারের তুলাদণ্ড সমান থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত বিভূতিরও করা দরকার কারণ জঘন্য তম পাপী সেই।

কে জানে বিভূতির পাপ, প্রসূনের অক্ষম পরাজয়ের গ্লানি শমিতার কোলের নিষ্পাপ শিশুটিরও পরে বর্তাবে কিনা!

সমিতা তা ভাবছে না। সে এখন মৃত প্রসূনের লাইফ ইনসুারেন্স, প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড আর গ্রাচ্যুইটির টাকার মোট অংকে গ্রাণ্ডটোট্যাল দিচ্ছে।

কোলের নবজাত শিশুটি হাসছে খিলখিলিয়ে। অলক্ষ্যে হাসছেন বোধকরি বিধাতাও।…

ফ্রিৎস

সত্যজিৎ রায়

জয়ন্তর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তাকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'তোকে আজ যেন কেমন মনমরা মনে হচ্ছে? শরীর খারাপ নয় ত?'

জয়ন্ত তার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে একটা ছেলেমানুষী হাসি হেসে বলল, 'নাঃ! শরীর তো খারাপ নয়ই, বরং অলরেডি অনেকটা তাজা লাগছে। জায়গাটা সত্যিই ভালো।'

'তোর তো চেনা জায়গা। আগে জানতিস না ভালো?'

'প্রায় ভুলে গেস্‌লাম।' জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অ্যাদ্দিন বাদে আবার ক্রমে ক্রমে মনে পড়ছে। বাংলোটা তো মনে হয় ঠিক আগের মতোই আছে। ঘরগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ফার্নিচারও কিছু কিছু সেই পুরোন আমলেরই রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন এই বেতের টেবিল আর চেয়ারগুলো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সবে চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ পড়ে এসেছে। টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিগ্যেস করলাম, 'কদ্দিন বাদে এলি?'

জয়ন্ত বলল, 'একত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স ছিল ছয়।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেটা বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসের বাগান। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। জয়ন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক স্কুলে ও এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখন ও একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে, আর আমি করি ইস্কুল মাস্টারি। চাকুরি জীবনে দুজনের মধ্যে ব্যবধান এসে গেলেও বন্ধুত্ব টিকে আছে ঠিকই। রাজস্থান ভ্রমণের প্ল্যান আমাদের অনেকদিনের। দুজনের একসঙ্গে ছুটি পেতে অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যাদ্দিনে সেটা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোকেরা রাজস্থান গেলে আগে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোরটাই দেখে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম থেকেই বুন্দির উপর জোর দিচ্ছিল। আমিও আপত্তি করিনি, কারণ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'বুঁদির কেল্লা' নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কেল্লা এতদিনে চাক্ষুস দেখার সুযোগ হবে সেটা ভাবতে মন্দ লাগছিল না। বুন্দি অনেকেই আসে না; তবে তার মানে এই নয় যে এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে উদয়পুর,

যোধপুর, চিতোরের মূল্য হয়ত অনেক বেশি, কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে বুন্দি কিছু কম যায় না।

জয়ন্ত বুন্দি সম্পর্কে এত জোর দিয়ে বলাতে প্রথমে একটু অদ্ভুত লেগেছিল; ট্রেনে আসতে আসতে কারণটা জানতে পারলাম। সে ছেলেবেলায় একবার নাকি বুন্দিতে এসেছিল, তাই সেই পুরোন স্মৃতির সঙ্গে নতুন করে জায়গাটাকে মিলিয়ে দেখার একটা ইচ্ছে তার মনে অনেকদিন থেকেই ঘোরা-ফেরা করছে। জয়ন্তর বাবা অনিমেষ দাশগুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করতেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগেই জয়ন্তর বুন্দি দেখা হয়ে যায়।

সার্কিট হাউসটা সত্যিই চমৎকার। বৃটিশ আমলের তৈরি, বয়স অন্তত শ'খানেক বছর ত বটেই। একতলা বাড়ি, টালি বসানো ঢালু ছাত, ঘরগুলো উঁচু উঁচু, উপর দিকে স্কাইলাইট দড়ি দিয়ে টেনে ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। পূব দিকে বারান্দা। তার সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে কেয়ারি করা বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে। বাগানের পিছন দিকটায় নানারকম বড বড় গাছে অজস্র পাখির জটলা। টিয়ার ত ছড়াছড়ি। ময়ূরের ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তবে সেটা কম্পাউণ্ডের বাইরে থেকে।

আমরা সকালে পৌঁছেই আগে একবার শহরটা ঘুরে দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে বসানো বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা। আজ দূর থেকে দেখেছি, কাল একেবারে ভিতরে গিয়ে দেখব। শহরে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো না থাকলে মনে হত যেন আমরা সেই প্রাচীন রাজপুত আমলে চলে এসেছি। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনের দিকে দোতালা থেকে ঝুলে পড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য করা বারান্দা, কাঠের দরজাগুলোতে নিপুণ হাতের নকশা—দেখে মনেই হয় না যে আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করছি।

এখানে এসে অবধি লক্ষ্য করেছি জয়ন্ত সচরাচর যা বলে তার চেয়ে একটু কম কথা বলছে। হয়ত অনেক পুরোন স্মৃতি তার মনে ফিরে আসছে। ছেলেবেলার কোনো জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে এলে মনটা উদাস হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর জয়ন্ত যে সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি ভাবুক সেটা ত সকলেই জানে।

চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জয়ন্ত বলল, 'জানিস শঙ্কর, ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। প্রথমবার যখন এখানে আসি, তখন মনে আছে এই চেয়ারগুলিতে আমি পা তুলে বাবু হয়ে বসতাম। মনে হত যেন একটা সিংহাসনে বসে আছি। এখন দেখছি চেয়ারগুলো আয়তনেও বড় না দেখতেও অতি সাধারণ। সামনের যে

ড্রয়িংরুম, সেটা এর দ্বিগুণ বড় বলে মনে হত। যদি এখানে ফিরে না আসতুম, তাহলে ছেলেবেলার ধারণাটাই কিন্তু টিকে যেত।'

আমি বললাম, 'এটাই ত স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় আমরা থাকি ছোট, সেই অনুপাতে আশেপাশের জিনিসগুলোকে বড় মনে হয়। আমরা বয়সের সঙ্গে বাড়ি, কিন্তু জিনিসগুলো ত বাড়ে না।'

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে বলে উঠল—'দেবদারু।'

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম। জয়ন্ত আবার বলল, 'একটা দেবদারু গাছ—ওই ওদিকটায় থাকার কথা।'

এই বলে সে দ্রুতবেগে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কম্পাউণ্ডের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দেবদারু গাছের কথা জয়ন্ত মনে রাখল কেন?

কয়েক সেকেণ্ড পরেই জনন্তর উল্লসিত কণ্ঠস্বর পেলাম—'আছে! ইট্‌স হিয়ার! ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই—'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাছ যদি থেকে থাকে ত সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। গাছ ত আর হেঁটে চলে বেড়ায় না!'

জয়ন্ত একটু বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'সেখানেই আছে মানে এই নয় যে আমি ভেবেছিলাম এই ত্রিশ বছরে গাছটা জায়গা পরিবর্তন করেছে। সেইখানে মানে আমি যেখানে গাছটা ছিল বলে অনুমান করেছিলাম, সেইখানে।'

'কিন্তু একটা গাছের কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন তোর?'

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী একটা কারণে জানি গাছটার কাছে এসেছিলাম—কী একটা করেছিলাম। একটা সাহেব··

'সাহেব?'

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না। মেমারির ব্যাপারটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত···

এখানে বাবুর্চির রান্নার হাত ভালো। রাত্রে ডাইনিংরুমে ওভাল-শেপের টেবিলটায় বসে খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, 'তখন যে বাবুর্চিটা ছিল, তার নাম ছিল দিলওয়ার। তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ ছিল, ছুরির দাগ—আর চোখ দুটো সব সময় জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত। কিন্তু রান্না করত খাসা।'

খাবার পরে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে জয়ন্তর ক্রমে আরও পুরোন ক। মনে পড়তে লাগল। তার বাবা কোন সোফায় বসে চুরুট খেতেন, মা কোথায় বসে উল বুনতেন, টেবিলের উপর কি কি ম্যাগাজিন পড়ে থাকত—সবই তার মনে পড়ল।

আর এইভাবেই শেষে তার পুতুলের কথাটাও মনে পড়ে গেল।

পুতুল বলতে মেয়েদের ডল পুতুল নয়। জয়ন্তর এক মামা সুইটজারল্যাণ্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা সুইসদেশীয় পোশাক পরা একটা বুড়োর মূর্তি। দেখতে নাকি একেবারে একটি খুদে জ্যান্ত মানুষ। ভেতরে যন্ত্রপাতি কিছু নেই, কিন্তু হাত পা আঙুল কোমর এমনভাবে তৈরি যে ইচ্ছামতো বঁকানো যায়। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাথার উপর ছোট্ট হলদে পালক গোঁজা সুইশ পাহাড়ী টুপি। এছাড়া পোশাকের খুঁটিনাটিতেও নাকি কোনরকম ভুল নেই—বেল্ট বোতাম পকেট কলার মোজা—এমনকি জুতোর বক্‌লসটা পর্যন্ত নিখুঁত।

প্রথমবার বুন্দিতে আসার কয়েকমাস আগেই জয়ন্তর মামা বিলেত থেকে ফেরেন, আর এসেই জয়ন্তকে পুতুলটা দেন। সুইটজারল্যাণ্ডের কোনো গ্রামে এক বুড়োর কাছ থেকে পুতুলটা কেনেন তিনি। বুড়ো নাকি ঠাট্টা করে বলে দিয়েছিল, 'এর নাম ফ্রিৎস। এই নামে ডাকবে একে। অন্য নামে ডাকলে কিন্তু জবাব পাবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি ছেলেবেলায় খেলনা অনেক পেয়েছি। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে কখনো বঞ্চিত করেন নি। কিন্তু মামার দেওয়া এই ফ্রিৎস-কে পেয়ে কী যে হল—আমি আমার অন্য সমস্ত খেলনার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। রাতদিন ওকে নিয়েই পড়ে থাকতাম; এমনকি শেষে একটা সময় এলো যখন আমি ফ্রিৎস-এর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি আলাপ চালিয়ে যেতাম। এক তরফা আলাপ অবিশ্যি, কিন্তু ফ্রিৎস-এর মুখে এমন একটা হাসি, আর ওর চোখে এমন একটা চাহনি ছিল, যে মনে হত যেন আমার কথা ও বেশ বুঝতে পারছে। এক এক সময় এমনও মনে হত যে আমি যদি বাংলা না বলে জার্মান বলতে পারতাম, তাহলে আমাদের আলাপটা হয়ত একতরফা না হয়ে দু'তরফা হত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষী পাগলামি বলে মনে হয়, কিন্তু তখন আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভীষণ "রিয়েল"। বাবা-মা বারণ করতেন অনেক, কিন্তু আমি কারুর কথা শুনতাম না। তখনও আমি ইস্কুল যেতে শুরু করিনি, কাজেই ফ্রিৎসকে দেবার জন্য সময়ের অভাব ছিল না আমার।'

এই পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চুপ করল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে ন'টা। বুন্দি শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা সার্কিট হাউসের বৈঠকখানায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম, 'পুতুলটা কোথায় গেল?'

জয়ন্ত এখনও যেন কী ভাবছে। উত্তরটা এত দেরিতে এলো যে আমার মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা বুঝি ওর কানেই যায়নি।

'পুতুলটা বুন্দিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে নষ্ট হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে যায়?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কিভাবে?'

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন বাইরে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা। পুতুলটাকে পাশে ঘাসের উপর রেখেছিলাম। কাছে কতকগুলো কুকুর জটলা করছিল। তখন আমার যা বয়স, তাতে চা খাবার কথা নয়, কিন্তু জেদ করে চা নিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ পেয়ালাটা কাত হয়ে খানিকটা গরম চা আমার প্যান্টে পড়ে যায়। বাংলোয় এসে প্যান্ট বদল করে বাইরে ফিরে গিয়ে দেখি পুতুলটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি আমার ক্রিৎসকে নিয়ে দুটো রাস্তার কুকুর দিব্যি টাগ-অফ-ওয়ার খেলছে। জিনিসটা খুবই মজবুত ছিল তাই ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায়নি। তবে চোখ মুখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, আমার কাছে ক্রিৎস-এর আর অস্তিত্বই ছিল না। হি ওয়াজ ডেড।'

'তারপর?' ভারি আশ্চর্য লাগছিল।জয়ন্তর এই কাহিনী।

'তারপর আর কী? যথাবিধি ক্রিৎস এর সৎকার করি।'

'তার মানে?'

'ওই দেবদারু গাছটার নিচে ওকে কবর দিই। ইচ্ছে ছিল কফিন জাতীয় একটা কিছু জোগাড় করা—সাহেব ত! একটা বাক্স থাকলেও কাজ চলত, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই শেষটায় এমনিই পুঁতে ফেলি।'

এতক্ষণে দেবদারু গাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল।

দশটা নাগাদ ঘুমোতে চলে গেলাম।

একটা বেশ বড় বেডরুমে দুটো আলাদা খাটে আমাদের বিছানা। কলকাতায় হাঁটার অভ্যেস নেই, এমনিতেই বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তার উপর বিছানায় ডানলোপিলো। বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন ক'টা জানি না, একটা কিসের শব্দে জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখি জয়ন্ত সোজা হয়ে বিছানার উপর বসে আছে। তার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, আর সেই আলোয় তার চাহনিতে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জিগ্যেস করলাম, 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে আমাকে একটা পালটা প্রশ্ন করল—'সার্কিট হাউসে বেড়াল বা ইঁদুর জাতীয় কিছু আছে নাকি?'

বললাম, 'থাকাটা কিছুই আশ্চর্য না। কিন্তু কেন বল ত?'

'বুকের উপর দিয়ে কি যেন একটা হেঁটে গেল। তাই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'ইঁদুর জিনিসটা সচরাচর নর্দমা টর্দমা দিয়ে ঢোকে। আর

খাটের ওপর ইঁদুর ওঠে বলে ত জানা ছিল না।'

জয়ন্ত বলল, 'এর আগেও একবার ঘুমটা ফেঙেছিল, তখন জানালার দিক থেকে একটা খচখচ শব্দ পাচ্ছিলাম।'

'জানালায় যদি আওয়াজ পেয়ে থাকিস তাহলে বেড়ালের সম্ভাবনাটাই বেশি।'

'কিন্তু তাহলে…'

জয়ন্তর মন থেকে যেন খটকা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাতিটা জ্বালার পর কিছু দেখতে পাসনি?'

নাথিং। অবিশ্যি ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিটা জ্বালিনি। প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গেসলাম। সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ই করছিল। আলো জ্বালার পর কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তার মানে যদি কিছু এসে থাকে তাহলে সেটা ঘরের মধ্যেই আছে?'

'তা…দরজা যখন দুটোই বন্ধ…'

আমি চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আনাচে কানাচে, খাটের তলায়, সুটকেসের পিছনে একবার খুঁজে দেখে নিলাম। কোথাও কিচ্ছু নেই। বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল; সেটার ভেতরেও খুঁজতে গেছি, এমন সময় জয়ন্ত চাপা গলায় ডাক দিল।

'শঙ্কর!'

ফিরে এলাম ঘরে। জয়ন্ত দেখি তার লেপের সাদা ওয়াড়টার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে লেপের একটা অংশ ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কি দ্যাখ তো।'

কাপড়টার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি তাতে হাল্কা খয়েরি রঙের ছোট ছোট গোল গোল কিসের জানি ছাপ পড়েছে। বললাম, 'বিড়ালের থাবা হলেও হতে পারে।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। বেশ বুঝতে পারলাম কী কারণে জানি সে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে রাত আড়াইটে বাজে। এত কম ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হবে না, তাছাড়া কালকেও সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে। তাই, আমি পাশে আছি, কোন ভয় নেই, ছাপগুলো আগে থেকেই থাকতে পারে, ইত্যাদি বলে কোনরকমে তাকে আশ্বাস দিয়ে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে জয়ন্ত যে অভিজ্ঞতার কথাটা বলল সেটা আসলে তার স্বপ্নের অন্তর্গত। বুন্দিতে এসে পুরোন কথা মনে পড়ে ও একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে, আর তার থেকেই বুকে বেড়াল হাঁটার স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে।

রাত্রে আর কোন ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি, আর জয়ন্তও সকালে উঠে নতুন কোন অভিজ্ঞতার কথা বলে নি। তবে তাকে দেখে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম যে রাত্রে তার ভালো ঘুম হয়নি। মনে মনে স্থির করলাম যে আমার কাছে যে ঘুমের বড়িটা আছে, আজ রাত্রে শোবার আগে তার একটা জয়ন্তকে খাইয়ে দেব।

আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে ন'টার সময় বুন্দির কেল্লা দেখতে গেলাম। গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। কেল্লায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে ন'টা।

এখানে এসেও দেখি জয়ন্তর সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার পুতুলের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কি, জয়ন্তর ছেলেমানুষী উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় পুতুলের কথাটা ভুলেই গেছে। একেকটা জিনিস দেখে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'ওই যে গেটের মাথায় সেই হাতি! ওই যে সেই গম্বুজ! এই সেই রূপোর খাট আর সিংহাসন! ওই যে দেয়ালে আঁকা ছবি!'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার ফুর্তি কমে এলো। আমি নিজে এত তন্ময় ছিলাম যে প্রথমে বুঝতে পারিনি। একটা ঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর সিলিং-এর দিকে চেয়ে ঝাড় লণ্ঠনগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল জয়ন্ত আমার পাশে নেই। কোথায় পালাল সে?

আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিল, সে বলল বাবু বাইরে ছাতের দিকটায় গেছে।

দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি জয়ন্ত বেশ খানিকটা দূরে ছাতের উল্টো দিকে পাঁচিলের পাশে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন চিন্তায় এমনই মগ্ন যে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। শেষটায় আমি নাম ধরে ডাকতে সে চমকে উঠল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর ঠিক করে বল ত। এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুই মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি—এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

জয়ন্ত শুধু বলল, 'তোর দেখা শেষ হয়েছে কি? তাহলে এবার··'

আমি একা হলে নিশ্চয়ই আরো কিছুক্ষণ থাকতাম, কিন্তু জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। আমরা দুজনে চুপচাপ গাড়ির পিছনে বসে আছি। জয়ন্তকে সিগারেট অফার করতে সে নিল

না। তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তার হাত দুটোর অস্থিরতায়। হাত একবার গাড়ীর জানলায় রাখছে, একবার কোলের উপর, পরক্ষণেই আবার আঙুল মটকাচ্ছে, না হয় নখ কামড়াচ্ছে। জয়ন্ত এমনিতে শান্ত মানুষ। তাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে আমার ভারি অসোয়াস্তি লাগছিল।

মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তোর দুশ্চিন্তার কারণটা আমায় বললে হয়ত তোর কিছুটা উপকার হতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'বলে লাভ নেই, বললে তুই বিশ্বাস করবি না।

'বিশ্বাস না করলেও, বিষয়টা নিয়ে অন্তত তোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।'

'কাল রাত্রে ফ্রিৎস আমাদের ঘরে এসেছিল। লেপের উপর ছাপগুলো সব ফ্রিৎসের পায়ের ছাপ।'

একথার পর অবিশ্যি জয়ন্তর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। যার মাথায় এমন একটা প্রচণ্ড আজগুবি ধারণা আশ্রয় নিয়েছে তাকে কি কিছু বলে বোঝানো যায়? তবু বললাম, 'তুই নিজের চোখে দেখিস নি কিছুই।'

'না—তবে বুকের উপর যে জিনিসটা হাঁটছে যে চারপেয়ে নয়, দুপেয়ে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।'

সার্কিট হাউসে এসে গাড়ি থেকে নামার সময় মনে মনে স্থির করলাম জয়ন্তকে একটা নার্ভ টনিক গোছের কিছু দিতে হবে। শুধু ঘুমের বড়িতে হবে না ছেলেবেলার সামান্য একটা স্মৃতি সাঁইত্রিশ বছরের জোয়ান মানুষকে এত উদ্ব্যস্ত করে তুলবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না।

ঘরে এসে জয়ন্তকে বললাম, বারোটা বাজে, স্নানটা সেরে ফেললে হত না।

জয়ন্ত 'তুই আগে যা' বলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্নান করতে করতে আমার মাথায় ফন্দি এল। জয়ন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বোধ হয় এই একমাত্র রাস্তা।

ফন্দিটা এই—ত্রিশ বছর আগে যদি পুতুলটাকে একটা বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়ে থাকে, আর সেই জায়গাটা কোথায় যদি জানা থাকে, তাহলে সেখানে মাটি খুঁড়লে আস্ত পুতুলটাকে আগের অবস্থায় না পেলেও, তার কিছু অংশ এখনো নিশ্চয়ই পাবার সম্ভাবনা আছে। কাপড় জামা মাটির তলায় ত্রিশ বছর থেকে যেতে পারে না; কিন্তু ধাতুর জিনিস—যেমন ফ্রিৎসের বেল্টের

বকলস বা কোটের পেন্টলের বোতাম—এসব—জিনিসগুলো টিকে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। জয়ন্তকে যদি দেখানো যায় যে তার সাধের পুতুলের শুধু ওই জিনিসগুলোই অবশিষ্ট আছে, আর সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তাহলে হয়ত তার মন থেকে এই উদ্ভট ধারণা দূর হবে। এ না করলে প্রতিরাত্রেই সেই আজগুবি স্বপ্ন দেখবে, আর সকালে উঠে বলবে ফ্রিৎস আমার বুকের উপর হাঁটাহাঁটি করছিল। এভাবে ক্রমে তার মাথাটা বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব না।

জয়ন্তকে ব্যাপারটা বলাতে তার ভাব দেখে মনে হল ফন্দিটা তার মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল, 'খুঁড়বে কে? কোদাল কোথায় পাবে?

আমি হেসে বললাম, 'এত বড় বাগান যখন রয়েছে তখন মালীও একটা নিশ্চয় আছে। আর মালী থাকা মানেই কোদালও আছে। লোকটাকে কিছু বকশিস দিলে সে মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ির পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে দেবে না—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ রাজী হল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আরো দু'একবার হুম্‌কি দেবার পর সে স্নানটা সেরে এল। এমনিতে খাইয়ে লোক হলেও, দুপুরে সে মাত্র দুখানা হাতের রুটি আর সামান্য মাংসের কারি ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া সেরে বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে রইলাম দুজনে। আমরা ছাড়া সার্কিট হাউসে আর কেউ নেই। দুপুরটা থমথমে। ডানদিকে নুড়ি ফেলা রাস্তার ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে কয়েকটা হনুমান বসে আছে, মাঝে মাঝে তাদের হুপ্‌ হুপ্‌ ডাক শোনা যাচ্ছে।

তিনটে নাগাদ একটা পাগড়ি পরা লোক হাতে একটা ঝারি নিয়ে বাগানে এল। লোকটার বয়স হয়েছে। চুল গোঁফ গালপাট্টা সবই ধপধপে সাদা।

'তুমি বলবে, না আমি?'

জয়ন্তর প্রশ্নতে আমি তার দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ইশারা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলাম মালীটার দিকে।

মাটি খোঁড়ার প্রস্তাবে মালী প্রথমে কেমন জানি অবাক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বোঝা গেল এমন প্রস্তাব তাকে এর আগে কেউ কোনদিন করেনি। তার 'কাহে বাবু?' প্রশ্নতে আমি তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললাম, 'কারণটা না হয় নাই জানলে। পাঁচ টাকা বকশিস দেব—যা বলছি করে দাও।'

বলা বাহুল্য মালী তাতে শুধু রাজীই হল না, দন্ত বিকশিত করে সেলাম-টেলামে ঠুকে এমন ভাব দেখালো যেন সে আমাদের চিরকালের কেনা গোলাম।

বারান্দায় বসা জয়ন্তকে হাতছানি দিকে ডাকলাম। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এলে বুঝলাম তার মুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আশাকরি খোঁড়ার ফলে পুতুলের কিছুটা অংশ অন্তত পাওয়া যাবে।

মালী ইতিমধ্যে কোদাল নিয়ে এসেছে। আমরা তিনজনে দেবদারু গাছটার দিকে এগোলাম।

গাছের গুঁড়িটার থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এইখানে।'

'ঠিক মনে আছে ত তোর?' আমি জিগ্যেস করলাম।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে কেবল মাথাটা একবার নাড়িয়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

'কতটা নিচে পুঁতেছিলি?'

'এক বিঘত ত হবেই।'

মালী আর দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে কোপ দিতে শুরু করল। লোকটার রসবোধ আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে একবার জিগ্যেস করল মাটির নিচে ধনদৌলত আছে কিনা, এবং যদি থাকে তাহলে তার থেকে তাকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা। একথা শুনে আমি হাসলাম, জয়ন্তর মুখে কোন হাসির অভাস দেখা গেল না। অক্টোবর মাসে বুন্দিতে গরম নেই, কিন্তু কলারের নিচে জয়ন্তর সার্ট ভিজে গেছে। সে একদৃষ্টে মাটির দিয়ে চেয়ে রয়েছে। মালী কোদালের কোপ মেরে চলেছে। এখনো পুতুলের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কেন?

একটা ময়ূরের তীক্ষ্ণ ডাক শুনে আমি মাথাটা একবার ঘুরিয়েছি, এমন সময় জয়ন্তর গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে আমার চোখটা তৎক্ষণাৎ তার দিকে চলে গেল। তার নিজের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই তার কম্পমান ডান হাতটা সে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিয়ে তর্জনীটাকে সোজা করে গর্তটার দিকে নির্দেশ করল। আঙুলটাকেও স্থির রাখতে পারছে না সে।

তারপর এক অস্বাভাবিক শুকনো ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন এলো—

মালীর হাত থেকে কোদালটা মাটিতে পড়ে গেল।

মাটির দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আপনা থেকেই আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দেখলাম, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিৎ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটি দশ-বারো ইঞ্চি ধপধপে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল।

শ্বশুরবাড়ীর শাল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়বাজারের এক ঘুপচিগলির দোকানের দোতলায় শালের আড়ত। সারা ভারতবর্ষের শাল, দোশাল, তুঁষ,, মলিদা, এই একেবারে মঝে থেকে সিংলিং পর্যন্ত ডাঁই হয়ে আছে। স্বয়ং মালিক টেরিকটনের ধুতি পরে একটা উরু দোকানের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু মনে করে, বের করে বসে আছেন। পেছনে একটি মানানসই দশাসই তাকিয়া। বঙ্কিম এখন ক্রেতা। ফিনানসিয়ার তার সম্বন্ধী। শীতে ভগ্নী-পতিকে একটি শাল দেবার কথা ছিল। দিচ্ছি দেবো করে দুটো শীত পার করে দিয়েছে। এই থার্ড উইন্টারে বঙ্কিমবাবুর কাঁধে শাল উঠবেই। দোকানটা সম্বন্ধীরই আবিষ্কার। আড়ত থেকে কিনলে দুটো পয়সা সস্তা হবে।

মালিক জংঘাদেশ আয়েস করে চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পকে-টের খবর কি ? সেই অনুসারে মাল ফিট করবেন। পকেট তো সম্বন্ধীর। উত্তরটা সেই দেবে। বঙ্কিম উদাস হয়ে মালিকের থাই দেখতে লাগল। ছেলেবেলায় ওয়ার্ড-বুকে পড়েছিল—শূকরের শুষ্ক লবণাক্ত জংঘা, হ্যাম। কেন জানে না তার এই কথা-টাই মনে পড়ল। সম্বন্ধী ইতিমধ্যে টাকার অংক বলে দিয়েছে দেড়শো, ম্যাকসি-মাম একশো পঁচাত্তর।

ওই দামের শালেরা সব অ্যালুমিনিয়ামের মই বেয়ে বঙ্কিমের সামনে নেমে এল। দেড়শো টাকায় আর কত ভাল জিনিস হবে ? হাল্কা একরোখা কাজ। জমি তেমন ভাল নয়। মধ্যবিত্তের শাল এর চেয়ে ভাল হলে মানাবে না। বঙ্কিম দেখে শুনে একটা সাদা শাল পছন্দ করে নিল।

সম্বন্ধী ফিস ফিস করে বললে, দেখ এইটাই নেবে তো ? রাখতে পারবে না কিন্তু।

বঙ্কিমের মনে হল সম্বন্ধীর এই কথায় নিশ্চয়ই কোন ইন্টারেস্ট আছে। সাদা থেকে বঙ্কিমকে তুঁতে রঙেরটায় নামাতে পারলেই, পঁচিশ টাকা সেভিংস। বঙ্কিম কানে কানে বললে, তোমার বোনকে যখন রাখতে পেরেছি শালটাকেও না পারার কোনো কারণ নেই। মেনটিন্যান্স ইজ আ্যান আর্ট।

দোকানের মালিক আর্ট শব্দটা শুনতে পেয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে আর্টিস্ট লোককো লিয়ে হায়। পয়ের পয়সামে যো লোক টিংচার আইডিন ভী পিতা হায় এ সাদা শাল উঃ আদমী কে লিয়ে।

বঙ্কিম মনে মনে বললে—ধুর ব্যাটা। পরের পয়সা কি রে! হিসেব করে দেখ, সারা জীবন একটা মেয়েকে মেনটেন করায় কষ্ট, আর শ্বশুরবাড়ীর সারা জীবনের পাওনা, ইনভার্স রেসিওতে চলে। সবশেষ ওই জামাই ষষ্ঠী। তাও বন্ধ হয়ে যায়। ওয়ান জামাই গোজ, অ্যানাদের জামাই কামস। দাঁত পড়া, চুলে পাক ধরা জামাইরা লিস্ট থেকে বাদ পড়ে যায়। আসর দখল করে থাকে ফ্রেশ কি, রাঙা জামাই। আদরের ধর্মই হল উজ্জ্বল রংয়ের মত ক্রমশঃ ফেড করে আসে। বিবর্ণ দাম্পত্য জীবন এই শাল দিয়ে চাপা দেওয়া যাবে।

সম্বন্ধীর নাম সূর্যকুমার। বিদেশে কাজ করে। সেখানে সে সুরয কুমার। সুরয কুমার, এক টাকা দাম কমাবার জন্যে যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে বঙ্কিম তখন দূর ভবিষ্যতে শালগায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেনারসের গঙ্গার ঘাটে বৃদ্ধ বঙ্কিম। শালটার রং তখন সাদা নয়। পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। রংটা হয়েছে শনের মত। জায়গায় জায়গায় তেলের ছোপ। পাশে এক গাল তোবড়ানো বুড়ী, বঙ্কিমের স্ত্রী। কয়েকটা লম্বা পাকা চুল জড়িয়ে আছে শালের এখানে ওখানে। অনেক অনেক আগে যখন তাদের যৌবন ছিল তখন লেগে থাকত কাঁচা চুল। এই বুড়িটারই যখন যৌবন ছিল, তখন আকাংক্ষা ছিল, লোভ ছিল, রক্তে আগুন ছিল। তখনও কাঁধে মাথা রাখতো, এখনও রাখে। তখন রাখতো, কাজ আদায়ের জন্যে, পাওনা বুঝে নেবার জন্যে। এখন রাখে নির্ভরের জন্যে। দিন তো শেষ হয়ে আসছে। কে আগে যায়, কে যায় পরে। শুরুতে এক যাবার সময় বিচ্ছিন্ন। বঙ্কিম শালের একটা অংশ বুড়ীর গায়ে জড়িয়ে দিল। বয়েস হয়েছে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একজনের শীর্ণ হাত অন্যজনের শীর্ণ হাতে ধরা। মৃত্যু হাত বেয়ে উঠে আসছে।

বঙ্কিমের ধ্যান চটকে গেল। সুরয কুমার কানে কানে বললে, কিছুতেই এক টাকাও ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। দু' কাপ চা আদায় করেছি। আমার নাম সুরয কুমার। বঙ্কিম এসব উঞ্ছবৃত্তি ভালবাসে না। সে বললে, তুমি চা খেয়ে এস, আমি নিচে দাঁড়াই।

সুরয কুমার বললে, না না ও বেটার দু' কাপ চাই ধ্বংস করে যেতে হবে, চালাকি, নাকি। তাকিয়াবাজী করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে, আর আমরা মরছি গাধার মত খেটে।

বড় এলাচ, ছোট এলাচ, জায়ফল, জৈয়ত্রী দেওয়া চা খেয়ে দুজনে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে রাস্তায় নেমে এল। শালের মোড়কটা সম্বন্ধীর বগলে। বঙ্কিমের হাতে এখনই দেওয়া যায় না। নানা রকম প্রোটোকল আছে। বলা যায় না

সামনে একাধিক বিয়ের লগ্ন, সুরথ কুমার হয়তো শালটাকে বার কতক ব্যবহার করে দামটা খানিক উসুল করে নেবে।

শালের প্রোটোকল হল এক বাকসো ন্যাতা সন্দেশ। চিনির ভাগ বেশী, ছানার ভাগ কম। শালেতে সন্দেশেতে শীতের একটা কুচো তত্ত্ব মত হল। বঙ্কিমের স্ত্রী প্রতিমার তাইতেই কি আনন্দ। কী উঁচু নজর আমার বাপের বাড়ীর। ওঃ পিওর কাশ্মিরী শাল। আড়ত থেকে কিনেছে তো, তাই একটু সস্তা হয়েছে। বাইরে থেকে কিনলে পাঁচশো টাকার কম নয়।

প্রতিমা শালটা হাতে নিয়ে বললে, যাওনা একবার তোমার বাবাকে দেখিয়ে এস, সন্দেশের কথাটাও বোলো। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বঙ্কিম দোতলায় উঠেছিল সত্যি, তবে পিতা পরমেশ্বরের ঘরে না গিয়ে, তিন তলার ছাদে গিয়ে শালটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে এনেছিল। বলা যায় নাকি—এই যে, এই দেখুন শ্বশুরবাড়ীর শাল, কাশ্মীর কি কলি।

শালটা দিন সাতেক একজিবিট নম্বর এক হয়ে বাইরের ঘরে রইল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই জেনে গেল বঙ্কিমের একটা শাল হয়েছে, শালা পছন্দ করে কিনে দিয়েছে শালের গুদাম থেকে। বঙ্কিমের মনে হয়েছিল একটা গ্লাস, কেস তৈরি করে, শালটাকে ভরে রেখে দেবে। সকাল সন্ধ্যে ধুনো গঙ্গাজল দেবে। একটা করে ধূপ জ্বেলে দেবে। ওপরে ফুল ছড়িয়ে দেবে গোটা কতক।

বঙ্কিমের শাল গায়ে দিয়ে কাপ্তেনী করার অবসর কোথায়? সে তো মেইনতী জনতারই একজন। সকালে বাজারে গুঁতোগুঁতি। নটার সময় বাসে বাঁদরামি। সাত ঘণ্টা অফিসে ফাজলামি। ছ'টায় আবার বাসে বাঁদরামি। এরপর বাড়ীতে সংসার নামক শূণ্য প্রাঙ্গণে ছেলে মানুষ করার ধাষ্টামি। মহামূল্যবান শাল ন্যাপথলিনের গোল্লা বগলে নিয়ে কাপড়ের আলমারির ভি আই পি কর্ণারে অপেক্ষা করে রইল, কবে আসবে সেদিন যেদিন বাবু বঙ্কিমের কাঁধে চাপবেন তিনি।

অবশেষে সেই দিন এল। ছোটো সম্বন্ধীয় বিয়ে বরযাত্রী বঙ্কিম, বঙ্কিমের স্ত্রী। ধবধবে সাদা ধুতির ওপর লালচে পাঞ্জাবি। ধুতির রংয়ের সঙ্গে, পাঞ্জাবির রংয়ের উনিস বিশ হবেই। সংসারের ধর্মই তাই। কারুর সঙ্গে কারুর মিল হতেই পারে না। সব সময় কনট্রাস্ট। আগে বঙ্কিমের খুঁতখুঁতানি ছিল। এখন এইসব পার্থক্য সে গ্রাহ্যই করে না। শালটা বগলের তলা দিয়ে আড়াআড়ি করে চিত্র তারকাদের মত গায়ে চাপিয়ে নিল। একটু সেন্ট লাগাতে যাচ্ছিল, প্রতিমা হৈ হৈ করে উঠল, কর কি, কর কি? বঙ্কিম যেন খুন করতে যাচ্ছিল। এক্ষুনি দাগ লেগে যাবে। ঘটে কি কোনো বুদ্ধিই নেই। কানের লতিতে লাগাও। বঙ্কিম

লাগাল। শালে দাগ লাগে, মানুষের চামড়া সে দিক থেকে নিরাপদ। সহজে দাগ লাগে না। শালের ধাত একমাত্র তার বৌই বোঝে।

বরযাত্রীরা বাসে যাবেন। একে একে সবাই উঠছে। বঙ্কিমও উঠছিল। পেছনেই প্রতিমা। হঠাৎ প্রতিমা চিৎকার করে উঠল, দেখে দেখে। বঙ্কিম তাড়াতাড়ি যে পা'টা ফুটবোর্ডে রেখেছিল নামিয়ে নিল। কি দেখবে? কেউ বমি-টমি করে রেখেছে নাকি? না সে সব নয়। প্রতিমা বললে, শাল গায়ে দিয়ে ওভাবে কেউ হুড়মুড় করে ওঠে নাকি। বাসের চারদিকে পেরেক খোঁচা হয়ে থাকে, এক্ষুনি লাগবে আর ফাঁস করে ছিঁড়ে যাবে।

চলতি বাসের জানালা দিয়ে হুহু করে হাওয়া আসছে। ভেতরে একটা সোয়েটার পরলে ভাল করত। শালটার কোনো দাম নেই। শালটা গায়ে দেবার আগে ওভার এস্টিমেট করে ফেলেছে। একে সর্দির ধাত। ভুগতে হবে। প্রতিমাকে বললে, শালটার তেমন গরম নেই। প্রতিমা বললে, সে কি গো। আমি পাশে বসে গরম পাচ্ছি। মনে হচ্ছে তোলা উনুনের পাশে বসে আছি, তুমি পাচ্ছ না? বঙ্কিমের পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, ও তুমি তো ভুল গায়ে দিয়েছো। ঠাণ্ডার দিকটা ভেতরে দিয়েছো। গরমের দিকটা ওপরে।

বঙ্কিম কিছুক্ষণ হাঁ করে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সে কি রে বাবা! শালের আবার গরম পিঠ, ঠাণ্ডা পিঠ আছে নাকি? শুনি নি তো কখনও। নিজে একবার হাত বুলিয়ে দেখল। দুটো পিঠই তো একরকম। বঙ্কিম বললে, এরকম হয় নাকি?

প্রতিমা বিশেষজ্ঞের মত বললে, হয় না? শালের তুমি জান কি? সারা জীবন তো দোলনা আর ফতুয়া পরে কাটালে। আমার দাদুর একটা শাল ছিল। সে যুগেই তার দাম ছিল হাজার টাকা, বিলিতি শাল, এয়ার কণ্ডিশান্ড। একটা দিক গরম কালে গায়ে দিতেন, আর একটা দিক শীতে।

বঙ্কিম ব্যাপারটা হজম করার জন্যে একটু সময় নিল। সংশয়টা তার তখনও কাটে নি। বিলেতে আবার শাল হয় নাকি। বঙ্কিম বললে, উল্টে গায়ে দিলে গরম লাগবে?

নিশ্চয় লাগবে।

তাহলে এই কাজটাও তো উল্টে যাবে।

তাতো যাবেই। ওরা তো ভুল করেছে। আর তুমিও তো তেমনি মূর্খ। দেখে দেখে উল্টোটাই ঠিক কিনে নিয়ে এলে। একটা কাজ যদি তোমাকে দিয়ে ঠিকমত হয়। সমস্ত দোষ বঙ্কিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রতিমা খোঁপার ফুল ঠিক করতে

লাগল। আর বঙ্কিম নিজের দোষে ঠাণ্ডা শাল গায়ে দিয়ে শীতে হি হি করতে করতে সম্বন্ধীর বিয়ের বরযাত্রী হয়ে নৈহাটি চলল।

বিয়ে বাড়ীর মেয়েদের ভিড়ে মিশে যাবার আগে প্রতিমা সাবধান করে দিয়ে গেল, কাপে যদি চা খাও, বাঁ হাতটা কাপের তলায় ধরে মুখে তুলবে, তা না হলে শালে চায়ের ফোঁটা পড়বে। ভাঁড়ে খেলে দেখে নেবে, ছ্যাঁদা আছে কিনা। বরং আর একটা ভাঁড়ের ওপর বসিয়ে নেবে। পান খাবে না। পিক ফেলতে গেলেই ফোঁটা পড়বে। ফোল্ডিং চেয়ারে বসার সময় পেরেক উঠে আছে কিনা দেখবে। চেয়ারে আলুর দমের ঝোল লেগে থাকে। হলুদ আর লংকার দাগ লাগলে হয়ে গেল, জীবনের মত দাগয়াজি। তুমি তো আবার চোখে কম দেখ। যে কোনো লোককে দিয়ে চেক করিয়ে নিও। প্যাণ্ডেলের বাঁশে হেলান দিও না। তুমি তো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার না, সব সময় ত্রিভঙ্গমুরারি। যদি গোলাপের বোকে দিতে আসে নেবে না। কাঁটা আর লাল রং দুইই আছে। তোমার মত বেহুঁশো লোককে আর কত সাবধান করব বল। সব সময় নজর রাখবে, পেছন থেকে কেউ এসে হাত না মুছে দিয়ে যায়। হাঁ করে মেয়েছেলে দেখো না। তোমার যা স্বভাব। প্রতিমা ডুজ আর ডোন্টস বলে দিয়ে হুল্লোড়ে মিশে গেল। বঙ্কিমের ইচ্ছে করছিল, শালটাকে পাট করে বগলে নিয়ে বসে থাকে। নেহাত শীত করবে তাই। দরকার নেই শালে। খুব শিক্ষা হয়েছে।

এক সময় খাবার ডাক পড়ল। আবার ফিরতে হবে তো একটা রাস্তা। বঙ্কিমের ঠিক উল্টো দিকে বসেছে প্রতিমা। প্রতিমার পাশে বসেছেন তার সম্পর্কেব মাসি। বঙ্কিমের গায়ের শালটা দেখিয়ে প্রতিমা মাসিকে কি যেন বলল। মাসিব মুখে হাসি আর ধরে না। ইতিমধ্যে পাতে পড়েছে ফ্রায়েড রাইস আর মাংস। বঙ্কিম খাওয়ায় একেবারে তন্ময়। হঠাৎ সাবধানবাণী। প্রতিমায় গলা, সামলে, সামলে। বাঁ-কাঁধ থেকে শালটা নেমে আসছে পাতের দিকে। বঙ্কিম হেল্পলেস। ডান হাত জোড়া। প্রতিমা বঙ্কিমের পাশের অপরিচিত ভদ্রলোককে অনুরোধ করল, আপনার বাঁ-হাত দিয়ে বেশ করে ওপরে তুলে দিন তো। এক্ষুণি ঝোলেঝালে মাখামাখি করে বসে থাকবে।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে শালটাকে উঠিয়ে দিতে দিতে বললেন, থাকবে না, আবার এক্ষুণি ঝুলে যাবে, কাঁধে একটা সেফটিপিন লাগিয়ে দিলে ভাল হয়।

প্রতিমাও জানে থাকবে না। ভদ্রলোকের উপদেশ কার্যকরী করার জন্য সে পাশের মাসিমার কাছে সেফটিফিন চেয়ে বসল। প্রবীণা মহিলাদের ব্লাউজে বোতাম থাকে না। ঠিক তাই। প্রতিমা মাসিমার ভুঁড়ির কাছে হাত চালিয়ে

কাম্য জিনিসটি খুলে নিয়ে এল। ওদিক থেকে এদিকে আসতে গিয়ে গোটাকতক গেলাস ওল্টালো।

যাঁরা দেখতে পাচ্ছন তাঁরা সকলেই এখন বঙ্কিমকে দেখছেন। প্রতিমা টেনটান করে সেফটিপিন আটকে দিয়ে গেছে। ডান হাতটা মুখের কাছে পুরোপুরি তুলতে গেলে টান পড়ছে। মুখটাকে নামিয়ে আনতে হচ্ছে পাতের কাছে হাতের সীমানায়। অনেকটা কুকুরের টেকনিকে খেতে হচ্ছে। প্রতিজ্ঞা, আর যদি সে কখনো শাল গায়ে দিয়েছে। চাটনির সময় প্রতিমার চিৎকার, না না ওখানে নয়। বঙ্কিমের বরাতে প্ল্যাস্টিক চাটনি জুটলো না।

ফেরার সময় প্রতিমার সঙ্গে বাক্যালাপ হল না। মেরুদণ্ড সোজা করে, লগবগ করতে করতে বঙ্কিম ফিরে এল। শীত করছে। শালটা মুড়ি দেবারও উপায় নেই। মাথার তেল লেগে যাবে। বঙ্কিম ঘরে ঢুকেই টান মেরে শালটা খুলে ফেলল। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের মত শালটাকে মাটিতে ফেলে দুপায়ে ঠাসতে লাগল আর বলতে লাগল—শালা শালার শালের নিকুচি করেছে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিমা বলছে—একি একি। পাগল হয়ে গেলে নাকি।

বঙ্কিম জানে পাগল নয়, সে এতক্ষণে সুস্থ হতে চলেছে।

ভাঙা আয়নায়

শচীদুলাল দাশ

স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত ত্রিদিব। দেখতে ভালবাসে। যেমন তেমন নয়, বেশ গুছনো নিটোল স্বপ্ন, জেগে ওঠার পরেও মনের মধ্যে লেপটে থাকে, দিনের হাজার ঝড়-ঝাপটাতেও নড়ে না, অন্ততঃ আরেকটা নতুন স্বপ্ন না দেখা পর্যন্ত। ত্রিদিবেরও ভাললাগে সারাদিন ঐ ছোঁয়াটুকুকে বুকে করে বেড়াতে। শুধু কি রাত্রে? আজকাল দিনমানেও স্বপ্ন দেখতে কসুর করে না ও। তবে রাত্রিবেলার স্বপ্নগুলোর সঙ্গে সেগুলোর কিছুটা তফাৎ থেকে যায়। সেগুলো বললে আশপাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আর কিছুটা যেন আলগা বুনুনীর হয়। রাত্রের স্বপ্নে প্রায়ই অপরিচিত পরিবেশে পরিচিত বিষয় মিশে থাকে। মোটকথা কি দিনে কি রাত্রে ওর স্বপ্নের চলন ধরন কিম্বা অভিব্যক্তিগুলোর মধ্যে যাদেরকে ও দেখতে পায় তারা ওর স্ত্রী সুলেখা, অশোকা ওর দু-একজন বন্ধু, আর—প্রণতি।

প্রণতি কবে ওর কি ছিল সে কথা ওর ঘনিষ্ঠ গুটিকয়েক লোক ছাড়া বড় একটা কেউ জানে না। অন্যেরা যেটা জানে, সেটা হল প্রণতি ওর পিসতুতো দাদার স্ত্রী, যে দাদা ওর চেয়ে পাঁচ ছ' বছরের বড়, বার্ড কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকুরী করেন। একডালিয়ায় ওঁর বাড়ীতে কাজে-অকাজে যায় ত্রিদিব। কখনো হয়ত বৌদি অর্থাৎ প্রনতির সঙ্গে দুটো পল্লগাছা করে চলে আসে, তবু যাওয়া ওর চাই-ই মাঝে মাঝে। নাহলে ক'দিন বাদে বাদেই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিজনক তাগাদা অনুভব করে ও। কি যেন কাজ জমে গেছে ওর। ওর তখনকার আনচান ভাব দেখে সুলেখা ভাবে ওর বোধহয় ভিটামিনের অভাব হয়েছে আর তখন আরো বেশি মন দিয়ে ওর টিফিন তৈয়ার করে দেয়। রাত জেগে পড়াশুনো করতে বারণ করে। মনীশ বা চিন্ময়ের মত বন্ধুরা তখন গা-ঢাকা দেয় যতক্ষণ না ওর সঙ্কট কাটছে।

দাড়ি কামিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে খেয়াল করল ত্রিদিব। ডান চোখটা যেন একটু লালচে ঠেকছে। ঠাণ্ডা লেগে থাকবে অথবা হয়ত রাত্রে চুপিসারে রক্তচাপ বেড়েছিল। অসন্তুষ্ট মুখে একটু সময় তাকিয়ে থেকে চিরুনী চালাল মাথায়। আজ তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে বলে চান করা হয়নি। চুলগুলো কিছুতে বশ মানছে না। তখনি নজরে পড়ল, আয়নার ঠিক মাঝখানে একটা সরু কাটা

দাগ ওপর থেকে নিচে অবধি নেমে এসেছে। ওর ছায়াটা মাঝখানে আছে বলে কাটা দাগটা নাকবরাবর গিয়ে ওর মুখটাকে সূক্ষ্ম একটা সীমারেখার দুপাশে ভাগ করে দিচ্ছে। প্রথমে একটু কৌতুক বোধ করল ও, তারপর মনে হল ওর ডানদিককার লাল-চোখ, একটা কাটা-দাগওয়ালা গাল। এমন কি মাথার ডানপাশের আবধ্য চুলগুলো। এরা সবাই যেন একসাথে জুড়ে গিয়ে একটা পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। যেন বাঁদিককার আধখানা ডানদিকের সঙ্গে কিছুতেই আত্মীয়তা বজায় রাখতে পারছে না। যেন ডান বলছে বামকে, 'কোনও মিল নেই তোমাতে আমাতে, কিসের সম্পর্ক তোমার সঙ্গে?' দেখতে দেখতে ত্রিদিব ওর ড্রেসিং টেবিলের আয়না, চিরুনী আর নিজের হতচ্ছাড়া দুফাঁক মূর্তি নিয়ে ডুবতে লাগল। পিছনে ছুটল সুলেখা। মনে হচ্ছে দরজায় এসে দাঁড়াল মনীশ কিম্বা চিন্ময়। এবং তারও পেছনে একটু তাকাতে যার শুধুমাত্র ছায়াটুকু দেখা যাচ্ছে, স্বচ্ছন্দে বলে দেওয়া যায় সে হচ্ছে প্রণতি।

সুলেখার সঙ্কটের কথাই আগে ওর মাথায় এল। হাজার হোক জীবনসঙ্গিনী বলে কথা। ওর পক্ষে কোনদিকটাকে নিজের স্বামী বলে মেনে নেওয়া সম্ভব? ডানদিকে তো স্পষ্ট একটা জেহাদের অভ্যাস। যেন এতদিনের অভ্যস্ত সবকিছুকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। লাল চোখে শানাচ্ছে, 'বাধা দিতে এলে বিপদে পড়বে। আর বাঁ-দিক তা দেখে দস্তুরমতো বিপন্ন বোধ করছে। ভেবে পাচ্ছে না কিভাবে অস্তিত্বটুকু বাঁচানো যায়। অন্যদিকের পরিবর্ত-প্রবণতা যত বাড়ছে, তার প্রতি ওর প্রচণ্ড একাত্মবোধ বাঁ-দিককে উত্তরোত্তর অসহায় করে তুলছে। আচ্ছা, সুলেখা কি একবারও বুঝতে পারছে না ডানদিকটার মতিগতি মোটেই সুবিধের নয়। কে জানে, যা সাদামাটা ওর বুদ্ধিশুদ্ধি। এগিয়ে গিয়ে ওকে বুঝিয়ে দেবে, এমন সময় দরজার কাছ থেকে কয়েক পা এগিয়ে এল মনীশ, চোখ টিপল ওর দিকে। ভাবখানা যেন, 'ব্যস্ত হোস না, ওর ভালমন্দ ওকে নিজের থেকে বুঝে নিতে দে।' ফলে সুলেখাকে বুঝিয়ে দেওয়া আর হল না, কিন্তু মন ভরেউঠল। কেন মনীশ বারণ করছে? যদি সুলেখা ভুল করে? তবে কি তাই ওরও ইচ্ছে? কিন্তু তাই বা কেন হবে? মনীশ ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। খাঁটি ভালবাসে ওকে আর সুলেখাকে। না, না, মিথ্যেই এসব ভাবছে ত্রিদিব।

আবার কে যেন ঘরে ঢুকল। কে আবার, প্রণতি ছাড়া? কিন্তু কারো দিকে না তাকিয়ে ও সোজা এগিয়ে গেল সুলেখার দিকে। ঐ তো, আদরের ভঙ্গীতে সুলেখার গলা জড়িয়ে কত কি যে বলছে ফিসফিস করে। সুলেখাও গভীর মনযোগে শুনছে। বোধকরি ডানদিক-বাঁদিক নিয়েই কিছু বলছে। কি বলতে পারে?

প্রণতি নিজে কি ভাবছে এই দুটো দিক সম্পর্কে সেটাই তো বোঝা শক্ত। সে তো সেই কবেকার কথা, যখন সামান্য ভাবভঙ্গী থেকেই ও প্রণতিকে বুঝে ফেলত।……দেয়াল ঘেরা বিশাল কম্পাউণ্ডের একধারে বসে দু-বেনী দোলানো একটি মেয়ে অবাক বিস্ময়ে ডাগরদুটো চোখ মেলে ত্রিদিবের চোস্ত 'মার'গুলো দেখছে আর মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে, 'এবার আউট হয়ে চলে এস, আমি আর বসে থাকতে পারছি।'……আউট হয়ে ও চলে এসেছে অনেকদিন, প্রণতির ফরমাশে না হোক নিজের অদৃষ্টলিপির ফরমাশে। আজ আর বোঝা যায় না। এই এপাশ-ওপাশের সমস্যা মেটাতে সুলেখাকে ও কি সিদ্ধান্ত দিতে পারে। ওর নিশ্চিন্ত সুখী-সুখী জীবনযাত্রার দিকে তাকালে আজকাল ভাবাই যায় না কোনদিন ও খুটিনাটি ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাত, দুঃখের গানটান গাইত। আর তাপসদার মত 'জুয়েল' স্বামী যা ওর জীবনে পাবার বাকীটা রইল কি। সীমাহীন পরিপূর্ণতার চাপে তাই হারিয়ে গেছে ত্রিদিবের চেনা প্রণতি। বু কি করে যেন ওর বিশ্বাস প্রণতি চাইবে সুলেখা হঠকারী ডানদিকটা বর্জন করে বিবেক নির্ভর বাঁদিকটাই বেছে নিক। তক্ষুনি আবার প্রণতির এক একটা লাখটাকা দামের চাউনি মনে এসে ভাবনাকে স্থির থাকতে দেয় না। বুকের মধ্যে তখন অবিরাম গুনগুন বাজছে—দি-ই নে-এ-র বেলায় বাঁ-আ শি-ই-ই তোমার…। এদিকে মনীশের মুখটা হঠাৎ পাল্টে যাচ্ছে। কিছু একটা গোলমাল আঁচ করে ইসারায় কিছু বলতে বা সাবধান করতে চাইছে। সুলেখার দিকে এগোচ্ছে। আবার উত্তেজিত হতে গিয়ে পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ করল ত্রিদিব। না, মনীশ হঠাৎ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রণতির সামনাসামনি হতেই। প্রণতি এবার তাকাল ত্রিদিবের দিকে। মুখে ভুবনভোলানো হাসি। ঠিক যেন রাজরাণীর মত। জানি ম্যাডাম, তোমার মাতুলবংশ রাজা খেতাব পেয়েছিল সেই পাবনা না কোথায় যেন। তুমিও তো ছিটে কোঁটা রক্ত পেয়েছ ওখান থেকে। ভাল করে তাকিয়ে এবার ত্রিদিব দেখছে প্রণতির পরিচিত ভঙ্গীটা ক্রমশ সরে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে একটা চাপা রুক্ষতার প্রলেপ। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে সুলেখাকে সাবধান করতে চাইল ত্রিদিব। কি সাবধান করবে, কেন করবে কিছুই জানা নেই। শুধু বুক জুড়ে এক অব্যক্ত বিপদের আশঙ্কা। গলা দিয়ে কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। বোধ হয় ওকেও মনীশের মত পাথর বানিয়ে ফেলেছে। গায়ে চিমটি কেটে পরখ করতে চাইল ত্রিদিব, হাত নাড়ল না। সীমাহীন আতঙ্কে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করেও প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল নিজেকে। দেখল চিরুণীহাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে ও নিজের ডানচোখটা দেখছে। আয়নার মাঝখানে উপর থেকে নীচে অবধি একটা লম্বা

সরু কাটা দাগ। —আস্তে আস্তে আবার ভেসে উঠছে ত্রিদিব। ও ঘরে সুলেখার গেলতাশীর টুংটাং শব্দ। বোধহয় ত্রিদিবের টিফিনে মরিচের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে। শালা! নিজের ছায়াকে অস্ফুট গালাগাল দিয়ে সরে এল ত্রিদিব।

খেতে বসতে সুলেখা বলল দুপুরে ও কেয়ামাসীর বাড়ী যাবে, ফিরতে সন্ধ্যে হবে। শুনে অপ্রসন্ন হল ত্রিদিব। তার মানে আজ এসে কাজলির বানানো চা খেতে হবে। অফিস থেকে ফিরে সুলেখাকে বাড়ীতে না দেখলে ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। সাতবছরের বিবাহিত জীবনে এটুকুই প্রদর্শনীর মত টিকে আছে। মনে মনে স্থির করল আজ সোজা বাড়ী না ফিরে একডালিয়ায় সন্ধেটা কাটিয়ে আসবে।

প্রণতি দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ীর সামনের একচিতলে বাগানে। ওকে দেখে সুন্দর দাঁতের পাটি বের করে হাসল। তারপর দুজনে গিয়ে বসল বারান্দায়। কোনও ভূমিকা না করেই ত্রিদিব প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ? এই ধর রাত্রে কিম্বা দিনের বেলাতেই জেগে জেগে? উঁহু, দুষ্টুহাসি হেসে মাথা নাড়ল প্রণতি, 'কোনদিন না। তোমার দাদা বোধহয় দেখে। জানো, ও ঘুমের মধ্যে প্রায়ই কু বলে।' ত্রিদিবের উৎসাহ নেই তাপসদার স্বপ্ন দেখা নিয়ে। কিন্তু প্রণতি স্বপ্ন দেখে না শুনে স্পষ্টতই নিরাশ হল। ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। একজন দিন নেই রাত নেই স্বপ্ন দেখে চলেছে আর আরেকজন আদৌ দেখে না, এটা কি করে হয়। হতেও পারে, যাদের জীবনে চিন্তা ভাবনার বালাই নেই তারা স্বপ্ন দেখবেই বা কি নিয়ে। প্রণতি হয়ত বুঝতে পারছিল, ত্রিদিবের মেজাজ আজ কোনও কারণে ঠিক নেই। ও তাই চাইছিল মন রাখা ধরনের কথাবার্তা বলে ওর মনটাকে মেরামত করতে। ত্রিদিব কড়াইশুঁটির কচুরী ভালবাসে, দোকান থেকে তাই আনাল প্রণতি। তারপর কথার কথা বলছে এভাবে জিগ্যেস করল শনিবারে ত্রিদিব ওকে রঙমহলে নিয়ে যেতে পারবে কি না। 'অনেকদিন ধরে দেখব ভাবছি, তোমার দাদার যদি একটু সময় হয়।' ত্রিদিব যতই বুঝতে পারছিল প্রণতি ওকে খুশী করাবর চেষ্টা করছে, ততই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। একবার ভাবল সকালের স্বপ্নের জের টেনে জিগ্যেস করে বসবে, ওর মতে সুলেখার কোনদিকটা নির্বাচন করা উচিৎ। কিন্তু করল না। এখন হাজার রকমের গৌরচন্দ্রিকা ওর পোষাবে না।

বাড়ী ফিরে দেখল সুলেখা একটু আগেই ফিরেছে। ওকে দেখে হাসি হাসি মুখে এসে বলল, এই জানো, ইন্দুর না, ছেলে হয়েছে।' ইন্দু অর্থাৎ কেয়ামাসীর মেয়ে। ত্রিদিব আদরের ভঙ্গীতে ওর গালে টোকা দিয়ে বলল, 'বেশ কথা খুকুমণি,

এবার তোমারটা কবে হবে বলে ফেল দিদিমণি।' মুখের ভাবে 'ধ্যেৎ অসভ্য' ফুটিয়ে সুলেখা পালিয়ে গেল চা আনতে। আর সিগারেট হাতে ত্রিদিব পা নাচাতে নাচাতে ভাবল, বেশ আছ সোনামণি, তোমার দিব্যি কড়াইশুঁটির কচুরী আনাবার কোনও দায় নেই।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুলেখা যখন বলল 'আমার সবচেয়ে ভাললাগে তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুতে.' তখন ভালো লাগছিল ত্রিদিবের। একবারও ইচ্ছে হয়নি কম্পারেটিভ স্টাডির দোহাই পেড়ে ওকে ঠাট্টা করে, তার মানে কি অন্য কাইকে জড়িয়ে শুতে আর একটু কম ভালো লাগে। 'সবচেয়ে' বলতে তো এরকমও বোঝায়।

ঘুম আসতে না আসতে অনকোরা নতুন এক স্বপ্ন হাজির। গাছপালাবিহীন রুক্ষ একটা পাহাড়ের ঢালু গায়ে বসে তন্দ্রায় ঢুলছে একটা তক্ষক সাপ। কিসের একটা শব্দে চোখ মেলতে দেখা গেল ওটার একটা চোখ টকটকে লাল। তারপরেই দেখা যাচ্ছে সামনে একটা জলাশয় ছাড়া আর কিছুই নেই। ওতেই নিজের ছায়া দেখতে পাচ্ছে ও। জলের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিজের দিকে দেখল, দিব্যি মানুষেরই মত সবকিছু। তবে জলের মধ্যে কেন সরীসৃপ দেখাচ্ছে? এবার আরো অবাক কাণ্ড! জলটা হঠাৎ পরিষ্কার দু-ভাগ হয়ে দু'-দিকে সরে যাচ্ছে। একদিকে অস্থির ঢেউ, তার উপর চক্রাকারে ঘুরছে। একটা পাখী যেন কিছু খুঁজছে অথবা শুধু ঘোরার খেয়ালেই ঘুরছে। অন্যদিকটা দিব্যি শান্ত, অল্প হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে। কাছেই ডালে বসে অন্য একটা পাখী ডাকছে সুরেলা গলায়। কান পাতলে মনে হয় ঠিক যেন প্রাণের গান নয়, শেখানো বুলিতে মন-রাখা গান। কিন্তু ডানদিক কোনটা। বাঁ-দিকই বা কোনটা হতে পারে। জলের ভেতরকার ছায়ায় ডানদিকটাই বাঁদিক হবে আসলে। আবার জলের বাঁ-দিকটা আসলে ডানদিক। না কি যেন একটা ব্যাপার আছে আসল আর ছায়ার মধ্যে। যতই পরিষ্কার করে ভাবতে চাইছে ততই যেন এলোমেলো ঠেকছে। জট ছাড়াতে গিয়ে নতুন জট পাকাচ্ছে। ইস্, এখনো তোর ডান-বাঁ জ্ঞান হল না রে ত্রিদিব। অথচ জীবনভোর যেখানে তুমি ছায়া ফেলেছ সেখানেই এক অনিবার্য্য নিয়মে দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছ তুমি। দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নিয়ে। বৃথাই ও দুটোর মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা। তুমি নিজে কিম্বা তোমার চারপাশে যা কিছু সব রয়েছে তার কোনটাই কি অটুট থাকতে পেরেছে তবে কেন আর ডান-বাঁ নিয়ে মিথ্যে হয়রাণ হওয়া। যে আয়নাতেই পাও না কেন, তোমাকে দু-ভাগ করে দেবার জন্য সে তৈরী হয়েই আছে। একটা চোখ রক্তচক্ষু হয়ে দৃষ্টি অস্বচ্ছ করবেই। এসব কথা ত্রিদিবের কানের কাছে কে যেন গুনগুন করে বলে যাচ্ছে। যতোই ছায়া

ফেলতে চাও সেখানটা আগেভাগেই দু-টুকরো হয়ে আছে। ফলে তার ভেতরে তোমার প্রতিবিম্বও দু-ভাগ। একেকটা দিকের ধরন ধারণ অন্যদিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না। না—না -না। ক্রমশঃ দুটো ভাগই ভুলে যায় একদিন ওরা একই জায়গাতে একসাথে জুড়ে ছিল। তারপর? একদিন সাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদ ভুঙ্গে উঠলে নখ, দাঁত আর থাবা বেরোতে কতক্ষণ?

কুলকুল করে ঘামতে ঘামতে জেগে উঠল ত্রিদিব আর এই প্রথমবার আন্তরিক ভাবেই ও চাইল একটু অ গে দেখা স্বপ্নটাকে আদ্যোপান্ত ভুলে যেতে।

শূণ্যযান

সন্তোষকুমার ঘোষ

অনীতা তাকে বকল। তুমি যেখানে সেখানে থুতু ছিটোও কেন বলো তো? সারা ঘর নোংরা হয়ে যায়।

লোকনাথ ফোকলা দাঁতে হাসল।—বয়েসের দোষ। কী করি বলো তো? যেমন পেচ্ছাপ, তেমনই থুতু, এখন আর ইচ্ছেমতো সামলাতে পারিনে।

অনীতা হাসল। বিশ্রী। অন্তত সেই হাসির ঝিলিকে লোকনাথের মনে হল বিশ্রী, দাঁতে এত মিশি? বুক মানে কি শুধু বোঁটা? উরু মানে খালি দুটো ঢ্যাঙোস ঢ্যাঙোস ঠ্যাং? অথচ মেয়েদের শরীর নিয়ে, এমন কি অনীতার খাঁচাটাকে নিয়েও একদিন লালায়িত জিভে কত না রস ঝরেছে। চোখের দু-দুটো মণি হয়ে গেছে চারশো পাওয়ারের বাল্‌ব।

মেয়েদের শরীর, মেয়েদের শরীর। আর কিছু না থাকুক পুরুষের চেটে চেটে নেওয়া চোখ আছে। লোকনাথ তাব চব্বিশটা দাঁত মেলে (বত্রিশটা আর নেই তাই চব্বিশটা, হাঁ করে একটা দীর্ঘশ্বাস না ছেড়ে পারল না। হাপর যেমন ছাড়ে। তবে হাপরে আগুনও থাকে এই কটকটে হাঁ করায় কোথাও আগুন নেই।

নাই থাক তবু বাতাস আছে। হাওয়া, হাওয়া ফুরফুরে হাওয়া। যে হাওয়ায় একদিন সমস্ত রোম এবং সঙ্গোপনে আরও অনেক কিছু চনমন করে উঠে দাঁড়াত। সেই হাওয়া আজ নেই।

কিংবা আছে। লোকনাথবা আব তা টের পায় না। তাদের শরীরের রোম রেডিও বা টিভি-র অ্যানটেনার মতো খাড়া হয় না। আগে হত। কখন হত? ধরা যাক, ছোটনাগপুরের এবড়ো খেবড়ো জমি যখন পাড়ি দিচ্ছে, তখন মেয়েরা, মাইরি মেয়েরা, তাঁদের দেহের নরম-গরম, শক্ত-কোমল ছা॰॰া নিয়ে আতুর চোখে দিব্যি বাংলাটা কী যেন হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, উদ্ভাসিত হত।

মেয়েরা বন্ধু কিংবা বান্ধবী। তাই বলে তাদের অবয়ব এমন বন্ধুর প্রাকৃতিক মানচিত্র হবে কেন?

আজ অনুভূতিতে এইসব নেই। মানে চামড়ায় নেই। চামড়ায় যা নেই, তা চালান হয়ে গেছে মগজে। সুতরাং লোকনাথ খুব সুস্থির, সুস্থিত আর সংযত হয়ে পিছনের সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে।

যেভাবে আমরা নদীর ওপারে গিয়ে এপারের দৃশ্য-চিত্র দেখি একটু ঝাপসা, কুয়াশা, তবু তো দেখি।

এত কথা অনীতাকে বলা যাবে না বলেই লোকনাথ অনীতার ধমকের জবাবে শুধু বলল, বয়স গেছে। বলেছিলে না? প্রকাণ্ড এই হলঘরটায় থুতু ছিটোনোর সাফাই হিসেবে বয়সকে দাঁড় করানো। হা-হা। বয়সকে কেউ এর আগে মোক্তার হিসেবে ভেবেছে?

লোকনাথ বলেছিল বয়সের দোষ আর সঙ্গে সঙ্গে গুল্‌তি থেকে ছিটকোনো গুলির মতো অনীতা বলে উঠল, বয়সকে দোষ দিচ্ছ? কিন্তু বয়স কি তোমার আর আছে?

ফোকলা দাঁতে ফ্যাঁসফেঁসে গলাতেও এই তেড়িয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। দেওয়া যেত, যদি এক থাপ্পড়ে। কিন্তু থাপ্পড় মারবে যে-হাত, সেই হাতও তো কুঁচকে প্রায় কুমীরের পিঠের চেহারা নিয়েছে। রগগুলো যেন নদী-নালা। কব্‌জি চিমসে।

লোকনাথ সুতরাং ওই হা-হা হলঘরে হাসতেই থাকল। যখন জবাব নেই, যখন মারার উপায় নেই, তখন হাসি ছাড়া আর গতি কী? হাসতে হবেই। হোক না ওর দিকে ছুঁড়ে মারা সেই হাসি, তার দাঁতে মিশি, তার সমস্ত শরীর বঙ্গদেশের মতো সমতল।

তবে ওই সমতট, সমতল বঙ্গদেশই তাকে স্তোক দিল। অনীতা বলল, আচ্ছা, তোমার না হয় সাড়ে তিন কাল গিয়ে আধকালে ঠেকেছিল, তাই তুমি এখানে এলে। কিন্তু আমি তো তোমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট, আমাকে এখানে আসতে হল, বলতে পার কী জন্যে?

লোকনাথ বলতে পারল না। পারল না বলেই ফের হাসল। চব্বিশটি দাঁতে যতটা হাসি বিকশিত করা যায়, ঠিক ততটা।

হাসতে হাসতে সে বলল, তুমি বোধ হয় খুব পাপ করেছিলে, তাই।

ছাড়বার পাত্রী নয় অনীতা। সঙ্গে সঙ্গেই বলল, যদি করে থাকি, তবে তোমার সঙ্গে। আমার সোয়ামির সঙ্গে তো করিনি। সোয়ামির সঙ্গে যা যা হয়ে থাকে, সে-সব কি পাপ? সে-সব তো পুণ্যি। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গঙ্গাজলে চান করাও যা, সোয়ামির সঙ্গে শোয়াও তা-ই। কর্তব্য।

লোকনাথকে তখন কথায় পেয়েছিল। তাই বলল, অনেকটা ঠিক বলেছ বটে, কিন্তু প্রয়াগের জলে পেটে বাচ্চা আসে, এটা তো কখনও শুনিনি।

—অথচ দুটোই সঙ্গম। দুজন এক স্বরে বলল।

আর ঠিক তখনই দেখল, আশেপাশে যারা ছিল, তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

ওরা পাশাপাশি ছিল, লোকনাথ আর অনিতা। লোকনাথ ফ্যাঁসফেঁসের বদলে চিত্তকে স্থির করে কণ্ঠস্বরকে ফিসফিস করে বলল, আচ্ছা, এটা কি সহমরণ? তুমি তো আমার বিয়ে-করা বউ ছিলে না। তবু আমারই সঙ্গে এখানে এলে কেন, এবং কী করে? আমাকে বাঁচাতে?

—তোমাকে বাঁচায় কারুর বাপের সাধ্যি নেই। অ-নেক চেষ্টা করেছি। অ-নেক। পারিনি বলেই শেষ পর্যন্ত আমিও এলুম।

—কী করলে? বিষ খেলে না গলায় দড়ি? দড়ি-কলসি অবিশ্যি হতে পারে। জানো, আমি এমন হতচ্ছাড়া, কলসি দেখলেই তোমাদের দিব্যি সুডৌল গড়নটা মনে পড়ে যায়। বলো, কোন্‌টা তুমি বেছে নিয়েছিলে?

এখনও জেরা মুখপোড়া? দেখছিস না, সক্কলে রেলিং-এর ওদিকে চলে যাচ্ছে?

হঠাৎ ফোকলা মুখেও কী করে যেন লোকনাথের গলা গাঢ় গদগদ হয়ে গেল। সে তুই-তোকারি করল না। আস্তে আস্তে গভীর করে বলল, ভেবো না অনীতা, সকলেই যায়, সকলকেই যেতে হয়। ভেবো না অনীতা, আমরাও যাব।

—মাইরি বলছ একসঙ্গে যাব?

—কোনও কথা দিতে পারছি না। তবে জানি যে, যাব। এগোব।

॥ দুই ॥

পাশপোরট্ অফিসার হাঁকলেন, আপনাদের খাতাপত্তর কই? সে সব না দেখিয়েই যে বেশ ড্রুড়্ক গলে যাচ্ছিলেন?

লোকনাথ—ফোকলা দাঁতই তার সহায়—বলল, এগুচ্ছি না পিছোচ্ছি, তা তো জানি না। শুধু যাচ্ছি।

পাশপোরট্ অফিসার বললেন, এই বেড়া ডিঙোতে হলেও একটা বই চাই। আপনার আছে? ওনার আছে? সব দেখেশুনে তবে আমরা স্ট্যামপো মেরে দিই।

লোকনাথ অমায়িক পিছন দিকে হাত বাড়াল। সেখানে উঠে এল অনীতার পাশবই।

ঠক ঠক দুটো ছাপ মেরে অফিসারবাবু বললেন, ঠিক আছে। আপনারা যে মরেছেন, তাতে ভুল নেই।

উল্লুক লোকনাথ—সঙ্গে সঙ্গে বলল, মরেছিলাম তো আগেই। যখন আমরা এ ওর প্রেমে পড়ি।

অফিসারবাবু খুব জ্যোৎস্না হাসলেন। প্রেমে পড়লে মরে তো সবাই। বাঁচে আর কজন? কিন্তু বলুন তো, লোকে খালি প্রেমে পড়া বলে কেন? প্রেম কি শুধুই পড়া? ওঠা নয়? প্রেমে ওঠা তবে কেন বলা হয় না?

অফিসারবাবু ঠকঠক স্ট্যামপো মেরে লোকনাথ আর অনীতার প্রতি আবার চাঁদিনী হলেন।

॥ তিন ॥

ওরা এগোতে যাচ্ছিল। তক্ষুনি একটা বেড়া, একটা বাধা।

—কোথায় যাচ্ছেন? খুব ঘড়ঘড়ে গলায় একটা তখ্‌মা-আঁটা লোক জিগ্যেস করল।

—কোথাও যাচ্ছি না তো! কিংবা কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমরা শুধু এসেছি।

—হাওয়াই জাহাজে হাওয়া হবেন?

—শুনেছিলাম তো। তাই নিয়ম।

—এলেই যাওয়া যায় না। হাওয়ায় হাওয়া হওয়া কি চাট্টিখানি?

—আমরা তো পুলিস কনট্রোল পার হয়ে এলাম। জমা দিলাম আমাদের পাশপোর্ট।

—কিন্তু আপনাদের মালপত্তর? তার হিসেব তো দেননি! ওজনও করেননি। এভাবে অন্তত এই হাওয়াই জাহাজে ওঠা যায় না। জেনে রাখুন।

ঘড়ঘড়ে গলাওয়ালা সেই লোকটা নির্বিকার, ভাবলেশহীন বলল, বলে গেল, এরপর আছে 'কাসটমস'।

—হেলথ কাউন্টার নেই? লোকনাথ জিগ্যেস করতে পারত। তবে করল না, কারণ সত্যিকার শরীর থাকলে তবে তো হেলথ! অফিসার বড়া গলায় বললেন, কী আছে আপনাদের সঙ্গে?

—একটা সুটকেস আর একটা ফোলিও ব্যাগ। বিশ্বাস করুন শুধু এই।

অফিসার বলল, তবু খুলতে হবে।

লোকনাথ খুলল। সেভিংসেট, টুথপেস্ট আর ব্রাস। দুই একটি ম্যাগাজিন। বলল, দেখলেন তো শুধু এই।

গম্ভীর গলায় অফিসার বললেন, দেখার আরও বাকি আছে। কিংবা আপনারা দেখান নি। আরও তুলুন।

—ভাবছেন, ভুললে জবরদস্ত কাস্টমস অফিসার আপনি আরও হলুস্থুল অনেক ব্যাপার দেখতে পাবেন ?

অফিসার এতক্ষণ বাদে মানবিক অমায়িক হাসলেন। বললেন,—দেখতে না পাই, বুঝতে পারব। অদৃশ্য কোনও কিছু যদি আপনি এবং আপনার সঙ্গী মহিলা নিয়ে যেতে চান, তাও আটকাব। এখনও বলুন, এমন কিছু আছে, আছে, আছে ?

চিৎকার করে উঠল লোকনাথ। বলল, আছেই তো। আলবাৎ আছে। আমার সঙ্গিনী মহিলাটি কতটুকু আনতে পেরেছেন, জানি না। তিনি আনতে চেয়েছিলেন কি না তাও আমার জানা নেই। কিন্তু সরাসরি বলছি,—আমি এনেছি। অনেক খুইয়েও আমার আছে। আমার চাওয়া, আমার মোহ, আমার পাপ, আমার উচ্চাশা, আমার ভালোবাসা। সব নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম আপনারা দেখতে পাবেন না।

অফিসার খুব করুণাময় হেসে বললেন, দেখতে না পেলেও আমরা অনেক কিছু টের পাই। আপনার চাওয়া-টাওয়া' আপনার মোহ, পাপ বামনা আর ভালোবাসা।

—সবগুলোই কাস্টমসে আটকায় ?

—সবগুলোই এই কাস্টমস অফিসার আমরা আটকাতে পারি।

—দারুণ বেড়া তো !

—এই শেষ বেড়া যে। লোকনাথ অপাঙ্গে অনীতার দিকে তাকিয়ে বলল, বৈধ পাশপোরট না থাকলে বিবিধ কারণে ওরা তোমাকেও হয়ত আটকাতো।

অনীতার মুখে ভাবের লেশমাত্র ছিল না। সে শুধু হাসল।

তখন লোকনাথ সটান এগিয়ে গেল আবার সেই কাস্টমস অফিসারের দিকে। বলল, সব ডিক্লেয়ার করেছি। যা ডিক্লেয়ার করিনি তাও আপনি আন্দাজ করে নিয়েছেন। আমার আসক্তি আর পাপ ? আমার মোহ আর উচ্চাশা আমার ভালোবাসা ?

অফিসার বললেন, ভালোবাসার সাংঘুন মাপ। যান না, নিয়ে যান না। ভালোবাসাকে সঙ্গে নিলেও এই শরীরে সেটাকে তো আর পাবেন না।

আমরা অশরীরী প্রেমেও বিশ্বাস করি।

—যেখানে যাচ্ছেন, অমায়িক হেসে অফিসার বললেন, সেখানে দেখবেন কথাটার অর্থই নেই। অশরীরী প্রেম ? দেহহীন চামেলি ? ওসব এই জগতের রক্তমাংসের শিরায় চনমন খেলে। যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ভালোবাসাকে আগল

ধরে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলব না। কারণ শরীরই যেখানে নেই সেখানে অশরীরী কোনও টানাপোড়েন, ভালোবাসাটাসার কোনও দাম নেই। সেখানে কিছুতেই কিছু হয় না। সত্যি বলতে কি ইচ্ছেই হয় না।

লোকনাথ আর অনীতা বলল, তবে সেখানে আছে কী?

অফিসার আবার হাসলেন, বললেন, যা আছে তা নিজেদের খুঁজে আর বেছে নিতে হয়। কেউ পায় নীল নীল, কেউ বেগনি, কেউ হলুদ কেউ রামধনুর সবকটা রঙ—যে যা পায়। আসক্তি-টাসক্তির কথাই ওঠে না, কারণ সেই হয় হরিৎ নয় পীত ওই ইন্দ্রধনু শূন্যে কেউ বিশেষ করে কিছু চায় না। কাউকে তো নয়ই।

—তবে আমরা পাশ বা এই গেট থেকে খালাস? লোকনাথ বলল। সে তখনও অনীতার কাঁধে তার হাত রেখেছিল।

অফিসারবাবু ফের স্ট্যামপো মেরে দিলেন। যেমনই হোক, পাশ বা খালাস আছে।

বেড়ার ওদিকে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে লোকনাথ বলল, আপনি খালি মোহ আর আসক্তির তল্লাসি করেছিলেন অফিসার সাব। তলায় যেটা ছিল সেটা আর নাড়াচাড়া করে দেখেন নি।

অফিসার বললেন, দেখেছি। আপনার লেখা অনেকগুলো কাগজ তো। ওগুলোতে শুধু নিজের কথা। রাগ অনুরাগ ক্ষমা আর বিস্মরণ। চান তো এসব চোতাকাগজ সঙ্গে নিয়েও ওপরে যেতে পারেন। কারুর কিছু যাবে আসবে না।

বেড়া ডিঙিয়েছিল বলেই এতক্ষণ বাদে হো হো করে প্রাণ খুলে হাসতে পারল লোকনাথ। বলল, কাগজগুলো আপনার কাছে রয়ে গেল তো রয়েই গেল। অন্তত আমার ওগুলোতে আর কাজ নেই। কাকে ঘৃণা করেছি, কাকে করেছি ক্ষমা এসব বিবরণ অতঃপর—বলুন তো কী?—অবাস্তব।

বলতে বলতে লোকনাথের গলা গাঢ় হয়ে গেল। যা পেরিয়ে এলাম সেখানে কত কাম, কত কামনা, কত বাস কত বাসনা। শুধু ভোগ অথবা দুর্ভোগ। আঘাত-হানা কিংবা পদাঘাত। সব পেরিয়ে এলাম। জানেন, নিজেকে দারুণ হালকা লাগছে।

অফিসার কী বলতে যাচ্ছিলেন, লোকনাথ তাকে বাধা দিয়ে অনীতাকে বাহু বিস্তারে নিজের আরও সংলগ্ন করে স্ফূর্ত বলে গেল: যা পেয়েছি, যা পাইনি যাদের নিয়েছি, যাদের নিইনি, কিংবা ছোট করে বলতে গেলে যারা নেয়নি আমাকে, তাদের সব বৃত্তান্ত আপনার কাছেই জমা থাক। অনেকের সম্পর্কে আর বিরুদ্ধে

অনেক লেখা আছে এবং থাক আমার কলমে। বেড়ার এদিকে এসে আমার কারুর সম্পর্কে কিছুমাত্র রাগ অনুরাগ নেই।

লোকনাথ থামল না। বলেই গেল, ওই লেখায় কার হিত কার অহিত আমি তো জানি না, কোনও অভিমান, কোনও অভিযোগ নেই।

অফিসার বললেন, কিন্তু কাগজগুলো যে আমরা নষ্ট করে দেব।

লোকনাথ বলল, কাগজগুলো নষ্ট করতে পারেন করুন না, আমার আর কোনও মায়া নেই। কিন্তু সত্যকে নষ্ট করার শক্তি কার? সেই সত্য রইল আর কাগজগুলোও যদি আপনাদের নিয়মের আগুন থেকে বাঁচে তবুও কি সেগুলো বাঁচবে? বাঁচে যদি তবে নিজের প্রাণশক্তির জোরে। কোনওদিন নিজের কষ্ট, অভিমান উজাড় করে রক্ত ঢেলে লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, লিখেছি, লিখছি এই ব্যাপারই আসল কথা। তার মধ্যে সারবস্তু যদি কিছু থাকে তবে কোনওদিন কেউ হয়ত তার দু'এক পাতা কুড়িয়ে কিছু পাবে। ভুল বললাম অফিসার সাহেব— আমিও টের পাব। আমি আজ মরলাম, কাল বাঁচব। আজ কারুর কাজে লাগল না। কাল কেউ হয়ত তার মধ্যে চকচকে একটা সোনা দেখে ফেলল। দেখে যদি তবে তারই মধ্যে আমি বাঁচব। পুনর্জন্মতত্ত্ব সেখানে সেই অর্থে সত্য হবে। এবার বলুন তো, আমার সুটকেসে সেই হিজিবিজি লেখালেখির কোনও হদিশ পেয়েছেন?

—পেয়েছি। অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন।

—তাহলে কোনও প্রার্থনা তো জানাই নি। শুধু এটুকু বলছি, দয়া করে ওই কাগজগুলো পোড়াবেন না। অন্তত অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেও আমাকে বাঁচতে দিন।

—পোড়াব না। অফিসার প্রগাঢ় আশ্বাস দিলেন। আর সেই মুহূর্তে বায়ুর মতো হালকা চপল বয়ে গেল। লোকনাথ বলল, আঃ এবার আমি একেবারে মুক্ত। আপনাদের শূন্যযানে চড়তে আমার আর কোনও বাধা নেই। প্লেনটা ঠিক ক'টায় টেকঅফ করছে বলুন তো?

॥ চার ॥

অফিসার কী বলেছিলেন? তিনি কি বলেন, প্লেন টেক্ অফ্ করতে ঘণ্টা দুই দেরি?

লোকনাথ বলে থাকবে আপনাদেরও তবে দেরি হয়। আচ্ছা বলুন তো, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কী আছে? অফিসার তাঁর চাপা গলায় কী বললেন স্পষ্ট হল না।

অনেক পরে, তখন নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট যাবতীয় প্লেন ছেড়ে গেছে কি না গেছে, ঠিক নেই, লোকনাথ অনীতাকে বলল, "জানো, আমাদের এ-যাত্রা যাওয়াই হল না! সব ফ্লাইট মিস্ করেছি।"

—করলে কেন?

—ইচ্ছে করে। তুমি তো জানো না, অফিসারের সঙ্গে আমার কানে কানে চুপি চুপি কী কথা হল। উনি বললেন,যেখানে যাচ্ছি—ওঁরা সব জানেন তো—সেখানে নীল ছাড়া কোনও রঙ নেই। আমি যে লালও চাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যে বেড়ার ওদিকে সব চেহারা দেখতে পাচ্ছি, সব সাদা সাদা। সব ভূতুড়ে। যেন রাগ নেই, শ্লেষ্মা নেই, পিত্তি নেই। টাইট পোশাক আর বিলকুল সাদা। সারকাসের ক্লাউনদেরই যা থাকে, বা সাজে। আমি বললাম, ওদের নোখ নেই কেন? আর ওদের দাঁত? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। অফিসার কী বললেন জানো? ওদের আর নোখ, দাঁত-টাতের দরকার নেই যে। আমি বললাম, তবে কি ওরা আঁচড়ায় না, কখনও কামড়ায় না? অফিসার অল্প অল্প হেসে বললেন, দরকারই হয় না। ওখানে ওরা শুধু ভালোবাসে। জানো অনীতা এই ভালোবাসার নাম আমার কাছে মেনে নেওয়া বলে মনে হল।

—তারপর? অনীতা জিজ্ঞেস করল।

– পর বলে তো কিছু নেই, এখনটাই শুধু আছে। আমি তবু জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে নদীও কি আছে? অফিসার বললেন আছে। স্রোত? নেহাত নির্লজ্জ, তাই আমি জিজ্ঞাস করলাম। উনি বললেন, নেই। যেখানকার জল বরাবর সেখানেই টলটল করে। করেই চলে।

লোকনাথ বলেই চলল, জল বয় না থেমেই থাকে শুনে আমি ভয় পেলাম। আবার জানতে চাইলাম, নদী তো বুঝলাম, কিন্তু সমুদ্দুর? অফিসার কী অমায়িক জানো অনীতা, বললেন, আছে। খাসা নীল, টলটলে। আর তাতে একটুও নুন নেই। অনীতা, নুন আছে বলে সমুদ্রের জল আমরা দেখি কিন্তু চাখি না, কিন্তু নুন নেই শুনে আমার ভিতরটা নুনে পুড়ে গেল।

অবশেষে যখন শেষ ফ্লাইটটাও নেই, কাসটমসের এদিকে লোকজনও বিশেষ দেখা যায় না, তখন মানুষ হিসেবে, মানুষ বলেই গলা একটু চড়িয়ে লোকনাথ বলল, ভালোই হল অনীতা, শেষ প্লেনটাও যে ছেড়ে গেছে। ওই দেশের নিষ্কলঙ্ক নীলে যেতে আমার একটুও সাধ নেই জানো? আমি বরং লাল, হলুদ, সবুজ—এই সব রঙ মিলিয়েই বাঁচতে ভালোবাসি। সবটাকে, সাতটাকে মিলিয়ে সাদা করে দিই। কিংবা—হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকনাথ—পারলে আবার সেই রক্তাক্ত, কর্দমাক্ত

পৃথিবীতেই ফিরে যাই। যেখানে আমি আছি, তুমি আছ, নদীতে স্রোত আছে, সমুদ্রে লবণ। যেখানে আমরা এ ওকে চাই, যাকে ভালোবাসা বলে তা-ই, তবু কখনও কখনও নোখ দিয়ে আঁচড়াই, যখন জাপটে ধরি, তখনও দাঁত বসাই।

—যেখানে যাবার কথা, সেখানে কিচ্ছু নেই?

কিচ্ছু না অনীতা, কিচ্ছু না। দেখছ না ওদের এলুমিনিয়মে রঙ করা মুখ! দেখছ না, ওদের নোখ নেই, দাঁত নেই।

—আছে, সব আছে। অনীতা ঢাকা গলায় বলল। ওরাও হয়তো আর উপায় নেই বলে, আর জীবন নেই বলে নোখ-দাঁতে, আঁচড়ানো-কামড়ানোর সব সাধ ঢেকে রাখে।

—তবে ওদের ভিড়ে আমরা যাব কেন? লোকনাথ বলল। বরং এখানেই থাকি না কেন। এই কাসটমসের বেড়ার এপারে? এখানে কিছু পেলে খাব, না পেলে ঘুমোব, চাটাচাটি, আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়াকামড়ি সব চলবে, আর- আর, হয়তো-বা অনীতা, আমরা পরস্পরে প্রবেশও করব।

—মানে, আমরা থাকব। অনীতা জিজ্ঞেস করল।

—আমরা থাকব। প্রগাঢ় প্রতিধ্বনি করল লোকনাথ।

এভাবেই এখন

সুজিত মুখোপাধ্যায়

কাজে যোগ দিয়ে প্রথম দু'তিনদিন চুল কাটার সুযোগই পেল না নিখিল। প্রথম দিনতো ঠায় বসে থাকার পর বিকেলের দিকে তিন-চারটা দাড়ি কামাবার পর তার ছুটি হয়ে যায়।

সেদিন হাটবার ছিল। তাই দোকানের সবগুলো চেয়ারই ভর্তি। এবং দুটো বেঞ্চেও লোকজন বোঝাই। সুরেন, কমল ও নেপাল ওরা এনতার চুল কেটে যাচ্ছিল। দশ বার মিনিটের মধ্যেই ঝপা ঝপ চুল-দাড়ি কামিয়ে সাফ করে ফেলছিল। ক্ষুর-কাচির ঝম্ ঝম্ শব্দে ওদের কর্মব্যস্ত দুপুরটা নিখিলের কানে কেমন বিস্বাদ লাগছিল। সুরেনদের চুল কাটার নমুনা দেখে নিখিলের হাসি পাচ্ছিল এবং নিজের উপর রাগও বটে। ঘরভর্তি লোক গিজ গিজ করছে। অধিকাংশই হাটের লোক। কেউ সওদা করবে। কেউ বেচবে। নিখিল তার উল্টো দিকে বসা লোকগুলোকে আয়নায় দেখছিল। এরা প্রায় সকলেই গ্রামের লোক। চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ নেই বললেই চলে। অথচ সরলতার ছাপও যেন উধাও হয়ে গেছে। চেহারার মধ্যে কেমন একটা খেজো খেজো ভাব ফুটে উঠেছে। নিখিল দেখল একটা "আনন্দলোক"-এর পাতায় কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। আর একজন ঐ ভিড়ে মাথা গলাতে না পেয়ে দেয়ালে টাঙানো একটা মেয়েছেলের ছবির দিকে জুল জুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লোকটার হাতে-ধরা বিড়ির মাথায় ছাই জমে গেছে। নিখিলের হঠাৎ হাসি পেয়ে যায়। আর ঠিক তক্ষুণি লোকটার সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটার অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—চুল না দাড়ি? লোকটা কোন কথা না বলে নিখিলের চেয়ারের সামনে এগিয়ে এল। নিখিল সাদা কাপড়ের টুকরোটা দ্রুত-হাতে জড়িয়ে নিয়ে কাঁচি চালাতে শুরু করে। কাঁচি চালাতে চালাতে সে দশ আনা ছয় আয়ার হিসাবটা মনে মনে সেরে ফেলে। তিনটা দাড়ি আর একটা চুল। নিখিল বেশ যত্ন নিয়েই চুলটা কাটল। ঘাড়ে গলায় পাউডার ঢেলে ব্রাস দিয়ে টেনে টেনে ছাঁটা চুল পরিষ্কার করল। তারপর পেছনে একটা আয়না ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথার পেছনটা দেখাল। আয়নায় দু' জোড়া খুশীর ছোপ লেগে যায়। খুচরো পয়সা ফেরৎ দিলে লোকটা একটা দশ নয়া নিখিলের হাতে গুঁজে দেয়।

ক্যালেণ্ডারের পাতায় সাবানের ফেনা মুছতে গিয়ে নিখিল তার নতুন চাকরীর বয়স গোনে। সে নিজেই অবাক হয়, কেমন দেখতে দেখতে ক'টা মাস হয়ে গেল। নিখিল এখন একজন ব্যস্ত লোক। এ ক'মাসে ধীরে ধীরে তার কতগুলো নিজস্ব খদ্দের জুটে গেছে। তারা বসে থাকবে তবুও নিখিলের হাতে ছাড়া চুল কাটবে না। অথচ নিখলের এখন একটা বিড়ি খাওয়ার সময় পুরোপুরি হয় না। দু'টান দিয়েই কাঁচি চালাতে হয়। দোকানের মালিক মদনদা আজকাল আর কাঁচি ধরেই না, চেয়ারে বসে শুধু তদারকি করে। দোকানে আরো নতুন দুটো বড় আয়না এসেছে। অর্থাৎ আরো দু'জন লোক নেবে মদনদা। দোকানের উন্নতির সাথে সাথে মদনদার কাছে তার খাতিরও যে বেড়েছে তা নিখিল টের পায়।

চুল কাটার ফাঁকে নিখিল খদ্দেরের সাথে সুখ-দুঃখের গল্প করে। দিন কালের হাল-চাল ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন—গল্পের ভেতর এগুলো নিজের অজান্তেই আজকাল ঢুকে যায়। মাঝবয়সী ভদ্রলোকের নাম জানে না নিখিল। কিন্তু ভদ্রলোকের সাথে তার এক ধরণের সখ্যতা গড়ে উঠেছে বেশ কিছুদিন থেকে। নিখিলের হাতেই সে চুল কাটায়। নিখিল ঝোলান বেল্টে ক্ষুরটা ঘষসে ঘষতে বলে—দাদা, ভূট্টোর শেষপর্যন্ত ফাঁসি হয়ে গেল। একমুখ ফেনা নিয়ে ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, কাজীর বিচার বলে কথা। কে একজন চরম বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ একটা মটর বাইক সশব্দে গর্জন করতে একেবারে দোকানের কাছে এসে ক্যাচ্ করে ব্রেক কষে থামল। মদনদা এক লাফে চেয়ার থেকে নেমে আরে হীরাদা বলে গড় হয়ে প্রণাম করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। নিখিল দেখল লাল মটর বাইক থেকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান একজন যুবক রাজকীয় ঢঙে মদনদার কাঁধে হাতে দিয়ে দোকানে ঢুকল। বয়সে মদনদার সমবয়সীই হবে হয়তো। মদনদার এমন গদ গদ ভাব দেখে নিখিল আন্দাজ করতে পারে, লোকটা একজন কেউকেটা গোছের হবে। নিখিল দাড়ি কাটার ফাঁকে আড়চোখে মদনদার হীরাদাকে দেখছিল।

নেভি-ব্লু রঙের নাইলনের গেঞ্জিটা বিশাল পাটার মত বুকে খাপ খেয়ে লেগে আছে। চওড়া কব্জিতে মানানসই ঘড়ি। ঝোলান মোটা গোঁফে বেশ মজবুত লড়াকু আদমী বলেই মনে হয়। চা খেতে খেতে মদনদার সাথে কি যেন কথাবার্তা বলছে। ক্ষুর-কাঁচির শব্দ ছাপিয়েও লোকটার একতরফা কথা কানে আসছিল। হঠাৎ টেবিলের উপর সাবাস বলে একটা চাপড় দিতেই দেয়াল থেকে একটা ফটো ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝেতে ভেঙে পড়ল। সারা ঘরে কাচের টুকরো ছড়িয়ে যায়। মদনদার ভ্যাবাচেকা মুখের দিকে তাকিয়ে হীরাদা হাসতে হাসতে বলল—অনেক তো ঠাকুরের

ফটো ঝুলিয়েছিস্, একটা বাদ গেলে মরে যাবি না তুই।

এই ছোট্ট শহরে নিখিল খুব বেশীদিন আসেনি। সে গ্রামে-গঞ্জেই মানুষ। গ্রামের বনবাদাড়ে নিজের খেয়াল-খুশীভাবে ঘুরে বেরিয়েছে। জীবনের সবুজ দিকটা দেখতেই এতকাল সে অভ্যস্ত ছিল। কিছু জমি-জমা ও বাবার জাতব্যবসা— এইনিয়েই তাদের সুখের সংসারে সে ও তার ছোট বোন মালতী বড় হচ্ছিল। গ্রামে বসেই অনেক যুদ্ধের কথা শুনেছে। কামানের শব্দ ও মাথার উপর উড়োজাহাজের আনাগোনা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু যুদ্ধের উত্তাপে মানুষের কঙ্কাল কেমন করে অঙ্গার হয়ে যায় তা তারা বোঝেনি। কিন্তু মালতী বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আর এক যুদ্ধের উত্তাপ বাঁচাতে ক্রমেই তারা কোণঠাসা হতে শুরু করে। আর তখন থেকেই নিখিল বুঝতে শিখেছে বন্দুকের গুলির চেয়েও মানুষের লোলুপ দৃষ্টির তীব্রতা কম নয়। এ যেন অদৃশ্য এক ফাঁদে ধীরে ধীরে জড়িয়ে যাওয়া। বর্ষার জল পেয়ে ধানের শীষ যেমন এবেলা ওবেলা বাড়ে মালতীর শরীরটাও বুঝি তেমনি করে বাড়ছিল। মালতীর দিকে তাকিয়ে নিখিল নিজেও অবাক হয়ে ভাবত, তাদের সংসারে এমন রূপ নিয়ে মালতী কি করে এলো! তার মনে হ ত এ যেন চুরি করে কারো গুপ্তধন আগলিয়ে রাখার মত। কিন্তু আগলিয়ে রাখতে পারলো কোথায়? চারিদিকে কেমন ষড়যন্ত্রের ইশারা টের পায় ওরা। তাই আর দেরী না করে সামান্য কিছু সম্বল হাতে নিয়ে একরকম চোরের মতই গাঁ-ভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল এখানে। এখানে এসে নিখিলকেও অনিবার্যভাবে বাবার পাশে দাঁড়াতে হ'ল। শহুরে জীবনের সান-বাঁধান কঠিন চত্বরে পা রাখতে গিয়ে নিখিলকে এ ক'বছরে অনেক হোঁচট খেতে হয়েছে। গ্রামের ছেলে নিখিল শহরের এই ছৌ নাচের আসরে আস্তে আস্তে পাঠ নিতে শুরু করে। হীরাদাকে দেখার পর তাদের গ্রামের সামাদকে কেন যেন মনে পড়ে যায় নিখিলের। হীরাদা ও সামাদের মধ্যে একটা মিল খুঁজতে গিয়ে নিখিল কখন যেন তাদের গ্রামের মেঠো পথে হারিয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে মদনদা হাঁক দেয়, এ্যাই নিখিল, সুরেন ও কমল ওরা খেতে চলে গেছে এর মধ্যেই? নিখিল নিজেই অবাক হয়, সত্যি তো ওরা কখন চলে গেছে সে খেয়ালই করেনি। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে বাইরে থেকে আসায় মদনদার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছিল। ফ্যানের তলায় চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে মদনদা বলে, আর বলিস্ না, যত্তো উটকো ঝামেলা। যে ক'মাস গ্রীষ্মে ছিল বাঁচোয়া এখন আবার কিছুদিন জ্বালাবে।

মডার্ণ সেলুন। বেশ বড় করে সাইন বোর্ড লিখিয়েছে মদনদা। সাইন বোর্ডটা দোকানের মাথায় লটকানো হচ্ছে। কাঠের মিস্ত্রি দোকানের কিছু টুকিটাকি

কাজ সেরে এখন সাইন বোর্ডটা লাগাচ্ছে। মদনদা বাইরে দাঁড়িয়ে তদারকি করছিল। নিখিল যখন কাজে ঢুকেছিল তখন কোন সাইন বোর্ড তার নজরে পড়েনি। নিখিল বুঝতে পারে মদনদা আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। এ ক'মাসে দোকানটাকে ধীরে ধীরে সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ছিমছাম করেছে। এতকাল দোকানের কি নাম ছিল সে জানে না। তবে এখন 'মডার্ণ সেলুন' নামটি বেশ মানানসই হয়েছে।

পাশেই দুলালের চায়ের দোকান। চ্যাংড়া ছেলেদের ভিড়ে সবসময়ই থৈ থৈ করছে। হাতে হাতে পাঁচনের মত ফিফটি চা সহ চার্মিনারের কড়া নিকোটিন গিলে যাচ্ছে অনবরত। প্রতিদিনই সকাল থেকে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চলে ওদের আড্ডা। আড্ডাতো নয়, কথার চেয়ে খিস্তি খেউড়ই বেশী। প্রতিটা কথার ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট দু' অক্ষরের খিস্তিগুলো যেন ঠেকনা দিয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম নিখিলের কানে বাজত। ভাবত, এ আবার কোন্ দেশী কথা। এখন অবশ্য সয়ে গেছে। আর ঐ নিয়ে সে বিশেষ মাথাও ঘামায় না আজকাল। কারণ ওদের অনেকেই এখন তার খদ্দের। খদ্দের লক্ষ্মী, তাকে চটাতে নেই। দুলালের দোকানের ভেতর থেকে মদনদাকে উদ্দেশ্য করে গোপী কেমন বিকৃত উচ্চারণে— মডার্ণ সেলুন, হুম্ ইয়ের আবার জুলপি। বলেই হাসতে শুরু করল। সেও কিন্তু মদনদার একজন খদ্দেরলক্ষ্মী। একটু পরেই হয়তো দোকানে ঢুকে মদনদাকে জড়িয়ে ধরে বলবে—খাসা নাম দিয়েছ মদনদা মাইরি। এসব হালচাল দেখে দেখে নিখিল নিজেও মদনদার মত একটা মানানসই মুখোস এঁটে রাখতে চেষ্টা করে। চুল কাটার ফাঁকে গোপীর মুখেই সে শুনেছে রাস্তার উল্টো দিকের দোতলা বাড়ীটা তাদের। বাবা ডাক্তার। নিজে বি-কম্ পড়ছে।

রাতের খাওয়াটা নিখিলের কাছে বড় তৃপ্তির। মা পাশে বসে পরিবেশন করে আর সে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে গল্প করে। আজও নিখিল খেতে বসে গল্প করছিল মার সাথে। দাওয়ায় বসে বাবা ফুড়ুক ফুড়ুক তামাক টানছিল। আর মালতী চটের আসনে ফুল তুলছিল। ওর সামনে একটা লম্ফ জ্বালান। হাওয়ায় লম্ফের শীষ কাঁপছিল। নাকি ওর রূপের আগুনের শিখাটা ওভাবে থর থর করে কাঁপছে? ভাত খাওয়ার পর মা একটা বাটিতে করে একটু হালুয়া নিয়ে এল। নিখিল প্রশ্ন করে, আবার হালুয়া কেন? হালুয়া উপলক্ষ করেই মা কথাটা পাড়লেন। আমাদের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে ছেলের কাকা এসেছিলেন আজ। মালতীকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানেই মত দিয়ে দে।

দরজার সামনে বাবার গলা খাঁকারির শব্দে নিখিল চোখ তুলে তাকাল। বাবা বললেন—ছেলেটি কিন্তু দেখতে শুনতে খারাপ নয়। আর তাছাড়া আমিতো নিজে দেখে এসেছি, কতবড় মুদির দোকানে কাজ করে। দেখেশুনে মনে হ'ল মালিকের বেশ সুনজরেই আছে। কথাগুলো একনাগাড়ে বলে বাবা নিখিলের মুখে তার ঝাপসা দৃষ্টি মেলে ধরল। নিখিল বুঝতে পারে এ ব্যাপারে তার মতামতটা কেমন একঘরে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। নিখিল ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও নিজেকে সংযত রেখে বলে—দেখছেন না দিনের কি হালচাল হয়েছে। হাতের কাজ জেনেও আমরা এই পরিশ্রমের পর কি-বা আনতে পারছি ঘরে। আপনারা একটা বড় মুদি দোকান দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এ বাজারে কাজ চলে গেলে কাজ জোটাবে কোথায় ?

রোববারের বাজার। দুলালের দোকানের আড্ডা একেবারে তুঙ্গে। পত্রিকার হেডলাইন থেকেই লোড সেডিংয়ের প্রসঙ্গটা একটা তুমুল তর্কে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছিল ওদের। তর্কের কথাগুলো কানে না এলেও খিস্তি খেউড়গুলো কিন্তু সশব্দে বোমার মত ফাটছিল। মডার্ণ সেলুনেও আজ প্রচুর খদ্দের। দোকানের সব ক'টা আয়নায় আজ দুটো করে মুখ। অর্থাৎ একেবারে হাউস ফুল। নিখিল রোমিও মার্কা ছেলেটির গলায় মার্কিনের টুকরোটা জড়িয়ে ক্রমাগত শূণ্যে কাঁচি চালিয়ে যাচ্ছিল। সকাল আটটা থেকেই লোড সেডিংয়ের ধাক্কায় ফ্যানগুলো বিশ্রাম নিচ্ছিল। ছেলেটা দর দর করে ঘামছে। নিখিল মনে মনে হাসছিল। আজকাল চুল কাটাতো নয়, ড্রেস করা। সব নদের নিমাই। চুলের ডগা ছাঁটতে আর ক' মিনিট লাগে। পাঁচ মিনিটে কাজ সেরে দিলেতো আর পয়সা উঠবে না। তাই বাকি আর ছয়-সাত মিনিট জুলফির আগ, চুলের ডগা ইত্যাদি করে শুধু শূণ্যে কাঁচি চালিয়ে যাওয়া। এসব টেকনিক নিখিল এখন বেশ ভালই রপ্ত করে ফেলেছে।

হঠাৎ বট্......বট্......বট্ শব্দটা একেবারে দোকানের কাছে এগিয়ে আসতেই দুলালের দোকান থেকে গুরু গুরু বলে রব ওঠে। গুরু আ গিয়া বলে এক লাফে গোপী দোকান থেকে বুলেটের মত বেরিয়ে এল। একটা লাল প্রিন্টেড হাফহাতা হাওয়াই সার্ট সাদা ফুলপ্যান্টের সাথে গুঁজে পরা। কোমরে ০০৭ চওড়া বেল্ট। সান গগলসটা হাতে নিয়ে হীরাদা দোকানে ঢুকল। সাথে গোপী ও তার সাঙ্গপাঙ্গ একপাল ছেলে। মদনদা বেশ বিরক্তবোধ করলেও মুখে কষ্ট করে অমায়িক হাসি ধরে রাখে।

গোপী বলে, গুরু আজ খাওয়াতে হবে কিন্তু।

আমি খাওয়াব কিরে। দেখছিস্ না, আমি মদনের গেষ্ট। ও-ই আজ খাওয়াবে।

হুররে····· যুগ যুগ জীও গুরু, যুগ যুগ······

এরকম কতকগুলো উট্‌কো ধ্বনির ভেতর মদনের ক্ষীণ প্রতিবাদ তলিয়ে যায়। মদনের অর্ডার দেওয়ার আগেই পল্টু চেঁচিয়ে বলে—দুলালদা, ডিমের ওমলেট আর চা লাগাও জলদি। ভাল করে মাথা গুনে নাও, উট্‌কো লোক গুনতিনে ধরো না কিন্তু। চুল কাটাতে এসে এরকম আনখা ঝামেলায় কেউ জড়াতে চায় না। তাই আস্তে আস্তে দোকান পাতলা হয়ে যায়।

মদনদা তার অমায়িক হাসিটা আর বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। মদনদার কথায় এবার বিরক্তি ঝরে পড়ে। হীরাদা তুমি এসব কি আরম্ভ করলে, আমার রোববারের বাজারটাই মাটি করে দিলে। সাত সকালে এরকম অত্যাচার···। অত্যাচার কথাটা লুফে নিয়ে হীরাদা বলে, পোঁদে দুই লাথি কষাব বান্‌চোত, একশ টাকা খাইয়েই মাথা কিনে নিয়েছিস্। অত্যাচার মারাচ্ছে। গত বছর পি. ডাবলু. ডি. থেকে দোকান ভাঙার নোটিশ পেয়েতো কেলিয়ে পড়েছিলি। তখন কে বাঁচিয়েছিল তোকে? মদনদা মিন্ মিন্ করে কি একটা বলতে গেলে হীরাদা ধমক কষায়—প্যান-প্যানানি রাখ, শতখানেক টাকা ছাড়তো। পরশুদিন কোলসুরে পার্টির মিটিং। আমায় এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। পুরো এরিয়াটা সার্ভে করে আসতে হবে। ফুলট্যাঙ্কি লোড চাই বাইকটার। মদনদা আকাশ থেকে পড়ে। এত টাকা আমি পাব কোথায়। তুমি দেখছি আমাকে রাজা-উজীর বানিয়ে ফেললে। হীরাদা একটু নরম সুরে বলে, দেশের জন্য, পার্টির জন্য একটু ভাব দেখি। শুধু নিজের ভাবনায়ই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলি। কথা বলতে বলতে হীরা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মদনদাকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, তোর দোকানের ঐ ছোঁড়াটার সাথে কথা বলছে ঐ মেয়েটা কে রে?

মদন ঘুরে তাকিয়ে বলল, ও নিখিলের ছোট বোন।

কি করে?

করে না কিছুই। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এখানে আসে।

মদন লক্ষ্য করে হীরা ঐদিকে তাকিয়ে কেমন উসখুস করতে থাকে। মালতীর হেঁটে যাওয়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে হীরা আস্তে স্বগতোক্তি করল, খাসা মাল তো, ছোঁড়ার বোন বলে মনে হয় না।

মদন ফিসফিসিয়ে বলে, ডাকবো?

না না ঐ ছোঁড়াকে ডাক তো।

(নিখিলকে ইশারায় এদিকে আসতে বলে ঝোপ বুঝে দুটো দশ টাকার নোট হীরার হাতে গুঁজে দেয় মদন। হীরা কিছু না দেখেই টাকাটা পকেটে রেখে দিল।

নিখিল কাছে আসতেই হীরাদা প্রশ্ন করে, এখানে নতুন ঢুকেছিস্ বুঝি।

না একেবারে নতুন নয়, সাত-আট মাস হয়ে গেছে।

হীরা সিগারেটের টুকরোটা জুতোর তলায় পিষে দুম করে আসল কথায় এসে পড়ল।

মেয়েটি তোর বোন বুঝি ?

নিখিল আস্তে করে জবাব দেয়—হ্যাঁ।

তা তোদের এই টানাটানির সংসারে মেয়েটিকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিস্ কেন ?

কথাটা হীরা এমনভাবে চেলে দেয় যেন নিখিল একটা দারুণ অপরাধ করে ফেলেছে। নিখিল কোন উত্তর খুঁজে পায় না। কিংবা প্রবৃত্তি হয় না। সে তখন হীরাদার চকচকে চোখের তারায় সামাদের কুৎসিত লোভী মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। হীরাদার কথায় তার ক্ষণিক অন্যমনস্কতা কেটে যায়।

না না ওকে এভাবে ঘরে বসিয়ে রাখিস্ না আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্, ওকে আমি নার্সিংয়ে ঢুকিয়ে দেব'খন।

নিখিল তার নড়বড়ে ঘাড়টা কাত করল।

মদনদার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিখিল বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়ল। মালতীর জন্য হীরাদার দরদ ওর ভেতরটাকে নাড়িয়ে দেয়। একটা আশঙ্কায় মনে মনে কেঁপে যায় নিখিল। তার মনে হয় কারা যেন নিশ্চুপে ক্রুশ-কাঠে পেরেক ঠুকছে। সামাদের খপ্পর থেকে কোনরকমে জান-মান নিয়ে পালিয়ে বেঁচে এলেও এবার তারা পালাবে কোথায় ?

অন্যদিনের তুলনায় সকালে বাড়ী আসতে দেখে নিখিলের মা জিজ্ঞেস করে—এত তাড়াতাড়ি বাড়ী এলি যে !

নিখিল জবাব দেয় না। চুপচাপ জামা-কাপড় ছাড়তে থাকে। ভেতরের ভাবনায় ওর কোন কথাই কানে ঢোকে না। শুধু জবাব দেবার জন্যই বলে—এক্ষুণি আমায় অন্য আর এক জায়গায় যেতে হবে মা।

নিখিলের মা অবাক হয়। গলার স্বর আর এক ধাপ তুলে জিজ্ঞেস করে—এইতো এলি, আবার কোথায় যাবি ?

নিখিল পাম্প খোলা বলের মত দম আট্‌কা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে মালতীর বিয়ে ওখানেই হবে মা। পাকা কথাটা আজই দিয়ে আসব।

নিখিলের কথায় মার মুখের চেহারা পাল্টে যায়। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মার খুশীর উত্তাপ নিতে চেষ্টা করে নিখিল। কিন্তু পারে না। হীরাদার চকচকে লোভী চোখের ভেতর সামাদের হিংস্র কুৎসিত মুখটা বার বার ভেসে ওঠে।

বিবেক

বিভূতি এখন গ্রামের বাড়িতে, নিজের ঘরে একা। নিজের ঘর মানে, শোবার ঘর না। একটা ঘরের একই খড়ের চালের নীচে, মাটির দেওয়াল দিয়ে ভাগাভাগি করা। ঘরের তিন ভাগের দু' ভাগ অংশ ভিতর বাড়ির উঠোনের দিকে। বাকি এক ভাগ বাইরের দিকে। সেই হিসাবে এটাকে এ বাড়ির বাইরের ঘর বলা যায়। দেওয়ালের ওপাশের ঘরটা শোবার ঘর। ভিতরে আরো ঘর আছে। একটা মাটির দোতলা ঘর, খড়ের চাল। এককোণে চওড়া কাঠের মই বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা। চাল বেশ উঁচু, দোতলার মাটির মেঝেয় দাঁড়িয়ে মাথা ঠ্যাকে না। পাশেই রান্নার চালা, ঢেঁকি ঘর। উঠোনের কোণাকুণি, পাশাপাশি দুটো মরাই। মরাইয়ের গা ঘেঁষে আর একটি ছোট ঘর, যার চালার মাথায় একটি ত্রিশূল রয়েছে। ওটা ঠাকুর ঘর। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভূতির ঠাকুরদা। ও-ঘরে থাকবার মতো জায়গাও আছে।

বিভূতি যখন ছোট ছিল, তখন এই বাইরের ছোট ঘরটায় ওর বাবা তক্তাপোশের ওপর বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন। বর্গাদার, কৃষি মজুরদের সঙ্গে চাষ আবাদের বিষয়, দর কষাকষি, সবই এ ঘরে হতো। বিভূতির মনে আছে। যথার্থ অর্থে ওর বাবা সুদের কারবারি ছিলেন না, তবে নিতান্ত কেউ দায়ে পড়লে সোনা আর জমি বাঁধা রেখে টাকা দিতেন। জমি বাঁধা রাখতে বিক্রি কোবালা লিখে দিতে হতো, কারণ বিভূতির বাবার মহাজনী তেজারতি কারবারে কোনো লাইসেন্স ছিল না। তখন এক কাকাও ছিলেন। পরে আলাদা হয়ে পাশের জমিতে ঘর তুলে চলে গিয়েছেন। বিভূতি তখন ইস্কুলের ক্লাস সেভেনে পড়ে। বাবার সঙ্গে কাকার বিস্তর ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। এমনকি হাতাহাতি, লাঠিসোটা নিয়ে মারামারির উপক্রমও হয়েছিল। তারপরেই একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, জমি ভাগাভাগি। বাবা না কাকা, কার দোষ বেশি ছিল, বিভূতি তখন ঠিক মতো বুঝতে পারেনি। তবে ও মনে মনে বাবার সপক্ষেই ছিল। মারামারি লাগলে ও কাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক করেই রেখেছিল। পরে আরো বড় হয়ে ওর মনে হয়েছে বাবাই কাকাকে ঠকিয়েছিলেন। যে কারণ, বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও কাকার বাড়ি যাতায়াত করতো। বিভূতি তখন জেলা শহরের কলেজে পড়ে। বাবা মুখ

ফুটে কখনো কিছু বলেন নি। না-বলা-ভাব দিয়েই অনেক কিছু বোঝানো যায়। বাবাও বিভূতিকে সেই রকম বুঝিয়ে দিতেন। শক্ত চোয়াল, কঠোর মুখ, কথা বন্ধ, কিন্তু বিদ্বেষ ভরা চোখের কোণ দিয়ে বিভূতির দিকে দেখতেন।

বিভূতি বুঝতে পারতো বাবার দম্ভে আঘাত লাগে। তিনি যে ভাইয়ের মুখ দেখতেন না, তাঁর একমাত্র ছেলে—তাও যে-সে ছেলে না, শিক্ষিত ছেলে, গ্রামের নাম করা ছেলে, বাপের গৌরব, বংশের গৌরব, সে কী না তাঁর সেই ভাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করে? স্বভাবতই তিনি অপমানিত বোধ করতেন। এক দূর পল্লীর গণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে বিভূতিই একমাত্র ছেলে যে জেলা শহরে অনার্স নিয়ে কলেজে পড়তো, থাকতো জেলা শহরে। ওদের পরিবারের জমিজমা চাষবাস, কিছু সুদের কারবার ছাড়াও, বাবা কাকা পুরোহিতবৃত্তিও করতেন। জমিজমা বা মহাজনী কারবার এমন ছিল না, যা ঠিক জোতদারের পর্যায়ে পড়ে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বলা যায়। বিভূতির ভাষায় মাঝারি কুলাক। কিন্তু ব্রাহ্মণ, নানা যাগযজ্ঞে পূজাপাঠের পুরোহিত, অতএব সেই হিসাবে সম্মান এবং প্রতাপ কম না। বিভূতির বাবার এ সব বোধ খুব প্রবল ছিল। এতই প্রবল, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগীদার নিজের ছোট ভাইকেও নিকৃষ্ট ভাবতেন, আর সুযোগ পেলে হেনস্থা করতে ছাড়তেন না। অতঃপর তাঁর ছেলে, সেই ছোট ভাইয়ের বাড়ি যাতায়াত করলে অপমান অভিমান বোধ স্বাভাবিক।

বিভূতি বাবার মনের অবস্থা বুঝেও গায়ে মাখতো না। এমন ভাব করতো যেন বাবার মনের অবস্থা ও বুঝতে পারে না। ও জানতো, বাবার আচরণের মধ্যে বিভূতিকে প্ররোচিত করার একটা ভঙ্গি ছিল। বিভূতি প্ররোচিত উত্তেজিত হয়ে যদি বাবাকে কিছু বলে এই রকম একটা ভঙ্গি করতেন। অবিশ্যি বিভূতি উত্তেজিত বা প্ররোচিত হলেই যে তিনি ফোঁস করে উঠতেন, তা মনে হতো না। হয়তো তিনি ছেলের কাছে দুঃখে আর অভিমানে ভেঙে পড়তেন। বিভূতিকে ওর কাকার বাড়িতে না যেতে অনুরোধ করতেন। তা হলে সেটা হয়ে উঠতো একটা সঙ্কটের বিষয়। বিভূতির অবস্থা হয়ে উঠতো কুল রাখি না মান রাখি। সেই জন্যেই ও বিশেষ করে, এই একটি বিষয়ে বাবার মনের অবস্থা না বোঝার ভান করতো। ওর অন্তরে একটা শক্তি আর যুক্তিও ছিল। ও যে কাকার বাড়ি যেতো তাতে ওর মায়ের নীরব সায় ছিল, তিনি খুশি হতেন। এটা বোঝা যেতো তাঁর কথা-বার্তা থেকে যখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কাকা কাকীমার সঙ্গে ওর কী কথা হলো, ভাই বোনেরা কেমন আছে, ইত্যাদি এবং তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়তো। অথচ আশ্চর্য বিভূতির দুই বিবাহিতা দিদি বাপের বাড়িতে এলে কখনোই কাকার বাড়ি

যেতো না। দিদিয়া পুরোপুরি বাবার সমর্থক ছিল।

চরিত্রের দিক থেকে বাবা আর কাকার মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। তফাত একটাই, কাকা বিভূতিদের থেকে গরীব, আর তাঁর—অর্থাৎ বিভূতির খুড়তুতো ভাইবোনের সংখ্যাও অনেক বেশী। ভূমিনির্ভর গ্রামীণ নিম্নমধ্যবিত্ত। কাকার প্রতি বিভূতির সমবেদনা নিতান্ত মানবিক কারণে না। সমবেদনার অনেকটাই ছিল ওর শহুরে ছাত্রজীবনের রাজনীতি ভাবনার প্রতিফলন। জেলা শহরে বিভূতি সেই সময়ে রীতিমতো নাম করা ছাত্রনেতা। অবিশ্যি ওর মস্তিষ্কটা ছিল যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, লেখাপড়াটা মাটি হয় নি।

বিভূতির রাজনীতি করাটাও ওর বাবার আদৌ পছন্দ ছিল না। বরং একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কারণ তাঁর আর কোনো বংশধর ছিল না। তিনি মারা গেলে কী হবে। তাঁর জমি চাষ আবাদ ফসল পুকুর গোয়াল—তাঁর প্রাণ, কে সে সব রক্ষা করবে? ওসব ভেবে কোনো লাভ ছিল না। গলদ তো গোড়াতেই ছিল। ছেলে শহরে লেখাপড়া শিখে গ্রামে ফিরে মাঝারি কৃষকের জীবনযাপন করবে তা হয় না। হয়ও নি। বিভূতির জীবনধারণের কোনো বাধা বা পেছনটান ছিল না, বাবার উদ্বেগের বিষয় ওর চিন্তায়ও আসেনি। জেলা শহরের কলেজ থেকে ও যখন কলকাতার ইউনিভারসিটিতে পড়তে গিয়েছিল তখন ওর রাজনৈতিক জগৎ আরো বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু পার্টিতে তখন মরা গাঙের শুকো ভাঁটার টান। ও যখন কলকাতায় থেকে এম এ পড়ছিল, অখণ্ড পার্টি তখন আদর্শ আর নীতি দ্বন্দ্ব ভাঙনের মুখে।

বিভূতির মনেও দ্বন্দ্ব জেগেছিল। দক্ষিণপন্থী শাসকদল পর্যন্ত বিভূতিদের পার্টির ধিক্কারে আর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। পার্টির অনিবার্য ভাঙনের দুটো স্লোগানের মুখে তখন বিভূতি দাঁড়িয়ে—জনগণতন্ত্র আর জাতীয় গণতন্ত্র। পার্টির আদর্শ গ্রহণ করার আগে সকলেরই একজন গুরু থাকে। বিভূতিরও ছিল। ওর জেলা শহরের কলেজের এক অধ্যাপক গদাধর রায় ওকে প্রথম পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। বিভূতি ওর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানিয়ে গদাধর-বাবুকে চিঠি দিয়েছিল। জবাবে একটিই সঙ্কেত ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ছাড়া রাস্তা নেই। পত্রপাঠ বিভূতির দ্বন্দ্বের নিরসন হয়েছিল। ইউনিভারসিটিতে নিজের দলের সীমানায় গিয়ে দাঁড়াতে সময় নেয়নি।

দল ভাগাভাগির মধ্যেই বিভূতি এম এ পাশ করেছিল। কিছুকাল আগেও যাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলন করেছে, তখন তাদেরই অনেকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই চলছিল। ছাত্র ফ্রন্টে তো বটেই, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট থেকে

ক্রমে তা গ্রামের কৃষক ফ্রন্টের দিকেও এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু এর এ পাশ করে বিভূতি গ্রামে গিয়ে কৃষক আন্দোলনের কথা ভাবেনি। শহরে যুব ফ্রন্ট গঠনের দিকেই ওর ঝোঁক ছিল। কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি যাতায়াত চলছিল প্রায়ই। অঢেল না হলেও, টাকার টানাটানি তেমন ছিল না। বাড়ি থেকে চাইলেই কিছু না কিছু পাওয়া যেতো। বেকার জীবনের জ্বালাটা কখনোই তেমন করে ওকে বুঝতে হয়নি। বাবা মা বিয়ের তাগাদা দিচ্ছিলেন।

বিভূতির মনে কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না। ইউনিভারসিটির করিডোর থেকে কফি হাউস পর্যন্ত কোনো কোনো ছাত্রী বান্ধবীর পাশে চলতে চলতে মনে যে কখনোই কিছু কিঞ্চিৎ রঙ ধরেনি, তা ঠিক না। কিন্তু বিভূতির আজন্ম পরিবেশ আর গ্রামের কথাও ভাবতে হবে। বেশির ভাগ ট্রেন দাঁড়ায় না, এমন একটা নিঝুম খাঁ খাঁ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বাসে চেপে পাঁচ মাইলের স্টপ। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে গ্রাম। তার মধ্যে গ্রাম থেকে টানা তিন মাইল শালবন। ছেলেবেলায় সেই শালবন পেরিয়ে স্কুলে পড়তে যেতো। নতুন হাইওয়ে থেকে গ্রামের দূরত্ব দশ মাইল। যে-কোনো বাস স্টপ থেকেই সাইকেল রিক্সায় গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের জন্য। বছরের বেশির ভাগ সময়েই কাঁচা রাস্তায় সাইকেল রিকশা চলে না। চলাচলের প্রধান যান এখনো গরুর গাড়িই! নিতান্ত প্রয়োজন না হলে গ্রামের বাইরে কেউ বা যায়।

বিভূতি যতোই জেলা শহরের কলেজে পড়ুক আর কলকাতার হোস্টেলে থেকে ইউনিভারসিটিতে পড়ুক, কখনোই তেমন শহুরে হয়ে উঠতে পারেনি। কোনো মেয়েকে প্রেম নিবেদন করতে হলে শহুরে হতে হয় নাকি? হয়তো না। কিন্তু ওর যে বন্ধুরা প্রেম করতো ও তা কখনোই পারেনি। বন্ধুদের ঠাট্টার জবাবে ওর মতো শক্তপোক্ত একটা বলিষ্ঠ ছেলেকে হেসে বলতে হতো, 'ও ব্যাপারে আমি ডিসকোয়ালিফায়েড।' অথচ মনে মনে কোয়ালিফায়েড হবার ইচ্ছা ছিল। কারণ, বয়স আর মনের দিক থেকে ওর কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। আর সেটা প্রমাণ করতে পেরেছিল সাতষট্টি সালের নির্বাচনের পরে, প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। যে কংগ্রেস ওদের দু পক্ষকে সংশোধনবাদী আর নৈরাজ্যবাদী বিপথগামী বলে হেয় প্রতিপন্ন করছিল, ভাঙন ধরেছিল তাদের নিজেদের মধ্যেও। যার থেকে প্রসব হয়েছিল 'বাংলা কংগ্রেস'।

কংগ্রেসের পতন, বাম ফ্রন্টের মন্ত্রিত্ব, মরা গাঙে যে জোয়ার এনেছিল, তা বিভূতিকে প্রেমের সাহস যোগায়নি, কিন্তু বিয়েটা করে ফেলেছিল। বাবা মায়ের পছন্দ, ওর অপছন্দ লাগেনি। জ্যোতি—জ্যোতির্ময়ী জেলা শহরের স্কুল ফাইনাল পাশ করা মেয়ে। স্বাস্থ্য আর লাবণ্য মিশিয়ে ওর নামের মতোই একটা অকৃত্রিম

উজ্জ্বলতা ছিল। চোখের দ্যুতিতে বুদ্ধি ছিল, আর ছিল পরিবেশ, পরিবেশের মানুষদের ভাষা ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করার স্বাভাবিক অনুভূতি। সব মিলিয়ে বিভূতির ভালো লেগেছিল জ্যোতিকে। জ্যোতির যে বিষয়টা বিভূতিকে সব থেকে বেশি মুগ্ধ করেছিল তা হলো ওর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা! জ্যোতি খুব অনায়াসেই বিভূতির রাজনৈতিক ধারণাকে উপলব্ধি করেছিল আর বিভূতির সহধর্মিণী হয়ে ওঠার মতো একটা উৎসাহও ছিল।

সাতষট্টি সালের সেই সময়টা সব দিক থেকেই বিভূতির জীবনে একটা খুশির জোয়ার এনেছিল। গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের আন্দোলনের থেকে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে চাইছিল। তখন ওর রাজনৈতিক বিচরণ ক্ষেত্র জেলা শহর, কলকাতা আর নিজের গ্রামে। জ্যোতির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ও বিভূতির সঙ্গে ঘরের বাইরে আসতে পারেনি। বাবা মা থাকতে সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জ্যোতির সঙ্গে পার্টি আর অনেক কমরেডের সঙ্গে একটা মোটামুটি যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। •

কিন্তু রাজনীতি কি নানী আর পানীর প্রবাদের মতো? প্রবাদের আইডিয়াটা নিঃসন্দেহে রিঅ্যাকশনারি। নানী মানে মেয়ে—মেয়েদের মন আর 'মেঘের মতিগতি কিছুই বোঝা যায় না, কখন কোন্‌দিকে মোড় নেবে, ঢল নামবে। অন্ততঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটনাটা সেই রকমই ঘটেছিল। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছিল। বিভূতির মনে আবার দ্বিধা আর সংশয় জেগেছিল। তার চেয়ে যেটা খারাপ, হতাশা ওকে গ্রাস করছিল। সময়টা সব দিক থেকেই খারাপ চেহারা নিয়েছিল। বাবা সেই সময়েই মারা গিয়েছিলেন। অথচ তাঁর সাংসারিক এবং বৈষয়িক কর্তব্যের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা বিভূতির ছিল না। অবিশ্যি সে-দিকটা ও ভাবেওনি। তখন আবার সেই কলেজের অধ্যাপক কমরেড গদাধর রায়। তিনি নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আর সেই প্রথম বিভূতি চারুবাদের কথা শুনেছিল।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি বিভূতির আর কোনো মোহ ছিল না। তার আগেই ও চারুবাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, ধিক্কার দিচ্ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধুয়াকে। উত্তরের তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। গদাধর নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্রামে ফিরে যাও, শ্রেণীশত্রু খতমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পার্লামেন্টের আর এক নাম শুয়োরের খোঁয়াড়। নির্বাচন নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই।

বাম সরকার গঠনের মোহমুক্তি আর হতাশা থেকে এক নতুন উত্তরণ। চোখে আগুন জ্বলেছিল, বুকে রক্তের তৃষ্ণা। অনেককালের পুরনো ঘৃণা ধরা নীতির

পরিবর্তে, একটা তাজা টাটকা আর নিশ্চিত নীতির সন্ধান মিলেছিল। বিভূতি একলাই ওর গ্রামে ফিরে যায়নি। জেলা শহর আর কলকাতা থেকে কয়েকজন তাজা জোয়ান কমরেড ওদের সুদূর অরণ্যঘেরা গ্রামে এসে আস্তানা নিয়েছিল। গদাধর রায় রাতারাতি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। সকলেই তখন আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে। শক্তির একমাত্র উৎস রাইফেলের নল।

সেই সময়ে জ্যোতি কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। ও যেন যথার্থ নীতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। ওদের বাড়ি, গ্রাম আর গ্রামের চারপাশের চেহারাটাই আস্তে আস্তে বদলিয়ে যাচ্ছিল। বিভূতিও বদলিয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশের গ্রামের যতগুলো বাড়িতে বন্দুক ছিল, সবই ওরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। শুরু হয়েছিল খতম অ্যাক্‌শন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও তখন শ্রেণী শত্রুর পর্যায়ে।

অন্য দিকে কংগ্রেসের নবজাগরণ ঘটছিল। ওদের বিবদমান মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশে মেঘ কেটে, ধীরে ধীরে এশিয়ার মুক্তি সূর্যের উদয় হচ্ছিল। তাদের পোষা সশস্ত্র পুলিস বাহিনী নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। থাকতেও পারে না। বিভূতিদের খতমের পাল্টা আরো ভয়াবহ আর বিশাল সশস্ত্র খতমবাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল গোয়েন্দারা, নব জাগরিত মস্তানবাহিনী।

গ্রামের বাইরে তিন মাইলব্যাপী শালবনে বিভূতিদের আস্তানা ছিল। দেড় বছর পরে, জঙ্গল ঘিরে পুলিস ওদের আক্রমণ করেছিল, আর পুলিসের সঙ্গে মুখো-মুখি লড়াইয়ে, বিভূতি আহত অবস্থায় ধরা পড়েছিল

বিভূতি সাতদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়ে প্রথম বাড়ি এসেছিল। পরশু কলকাতা গিয়েছিল, পার্টি লিডার গদাধর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গতকাল রাত্রে আবার ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে ছ' বছরে রাজনীতির হাল আবার সেই নানী আর পানীর প্রবাদের মতো, ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। আর চারুবাদ নয়, খতম নয়, সশস্ত্র বিপ্লব নয়। জনগণের সমর্থনবিহীন ও-পথ ভুল। কমরেড গদাধর রায় প্রথম আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আত্মপ্রকাশ করে এ-কথা ঘোষণা করেছিলেন। বিভূতিকে জেলে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বিভূতি জেলের মধ্যে তখন একটা নৈরাজ্যে ভুগছিল। গদাধরের চিঠি পেয়ে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছিল জেল থেকে। তারপরেই পার্টির নির্দেশ, জেলের ভিতরে থেকেই বিভূতিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির খণ্ডনের জন্য আগে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর কেন্দ্রে জনতা সরকারকে সমর্থনের দরকার ছিল।

বিভূতিদের পার্টির মধ্যে আবার নতুন ফ্যাকশন। জেলের মধ্যেই দল ভাগা-

ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদল স্পষ্টই বলেছিল, 'শুয়োরের খোঁয়াড়ে তার কখনোই যাবো না।' কিন্তু বিভূতির চিন্তায় কমরেড গদাধরের সিদ্ধান্তই যথার্থ মনে হয়েছিল। 'আমরা জনসাধারণের দ্বারা পরিত্যক্ত। এ ভুল পথে আর নয়। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল অবলম্বন করে, দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট আর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে।'...অতএব বিভূতি জেলের ভিতর থেকেই নমিনেশন ফাইল করেছিল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অবিশ্যি হেরেছিল, কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। প্রায় সব পার্টি, এমন কি নির্দল প্রার্থীও ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ও খুব অল্প ভোটে হেরেছিল, ওর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সি পি এম-এর ক্যাণ্ডিডেট।

নির্বাচনে হেরে যাবার পরে বিভূতি কি মনে মনে আবার নৈরাজ্যের শিকার হয়েছিল? প্রথমতঃ জেলের থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অথচ যতগুলো পার্টি বন্দীমুক্তি আর বন্দীদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেবার জন্য বাইরে আন্দোলন করছিল তারা সবাই বিভূতির বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। ঐক্যের কোনো প্রশ্নই ছিল না, বা বামপন্থী নীতিগত কোনো আদর্শ? কেন্দ্রের জনতা সরকারের উদারতা আর রাজ্যে নিতান্ত নামেই মার্কসবাদী লেনিনবাদী এক আধটা-পার্টির সমর্থন।

বিভূতি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, জেলা শহরের আর গ্রামের আশেপাশের কিছু পরিচিতের এবং অপরিচিতের দেখা পেয়েছিল, যারা ওকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল বিভূতি যেন এতোটা আশা করেনি। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানিটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবু খুশি হয়েছিল। দু-একজন সংবাদিকও এসেছিল। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে, বিভূতির নতুন করে কিছু বলার ছিল না। ওর বলবার একটা কথাই ছিল, 'আমার নতুন করে বলার নেই। 'আমাদের পার্টি সেক্রেটারি কমরেড গদাধর রায় সব কিছুই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।'

একজন সাংবাদিক হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রায় ছ'বছর বাদে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়ে কেমন লাগছে?'

জিজ্ঞাসাটা ছিল এতই আচমকা, বিভূতি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু চোখের সামনে বাড়ির ছবিটা ভেসে উঠেছিল। মা আর জ্যোতির মুখও। ও জবাব দিয়েছিল, 'একটা নতুন জগতের স্বাদ পাচ্ছি।'

সাংবাদিক একটু অবাক হয়েছিল, 'নতুন জগত?'

বিভূতি বলেছিল 'মানে, নতুন করে আন্দোলনের পথে যাচ্ছি তো, সে-কথাই বলছি। এ বিষয়ে যা বলবার, তা তো জেলে থেকেই বলেছি।' বলে ও হেসেছিল।

আর এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন কোথায় যাবেন—মানে, আপনার কর্মসূচী জানতে চাইছি।'

'আগে বাড়ি যাবো।' বিভূতি জবাব দিয়েছিল, 'চারদির পরেই কলকাতায় হাজির হবো, কমরেড গদাধর রায় আমাদের রাজ্য কমিটির জরুরি সভা ডেকেছেন।' ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে করমর্দন করেছিল। কেউ কেউ ওকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল। অপরিচিতেরাও ছুটে এসে ওর সঙ্গে করমর্দন করেছিল। সকলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে, ক্রমেই ওকে ঘিরে আরো অনেক মানুষের ভিড় জমে উঠেছিল। অনেকের চোখেই অবাক কৌতূহল। জেলের একশো চুয়াল্লিশ ধারার সীমানা ছাড়িয়ে, হঠাৎ শ্লোগান দিয়ে উঠেছিল, 'কমরেড বিভূতি মুখারজী, জিন্দাবাদ'।

কমরেড বিভূতি মুখারজী জিন্দাবাদ। বিভূতি নিজেও মনে মনে উচ্চারণ করেছিল। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি, ভিতরের নৈরাজ্যে মেঘ কেটে গিয়ে, প্রাণে একটা আলোর ঝলক লেগেছিল কি? একটা আবেগ আর উচ্ছ্বাসের জোয়ার উথলিয়া উঠেছিল যেন? বন্ধু আর জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ওকে অভিভূত করেছিল। বিভূতি এতোটা আশা করেনি। বিরাট এক জনতা ওকে স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়েছিল, শ্লোগান দিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে, বিদায় জানিয়েছিল। সেই জনতা কি বিভূতিদের পার্টির সমর্থক। এদের নতুন পথ আর কৌশলকে কি তারা স্বাগত জানাচ্ছিল?

বিভূতির সঙ্গে অনেকে ট্রেনের যাত্রীও হয়েছিল, ওদের গ্রামে যাবার সেই নিঝুম স্টেশন অবধি অনেকে এসেছিল। তারপরেও একটা ছোটখাটো দল ওর সঙ্গে গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। ও বাড়ি পৌঁছতেই প্রতিবেশীরা অনেকেই বাড়ির সামনে এসে ভিড় করেছিল। বিভূতি বাড়ি ঢুকতেই, প্রথমে ওর মা ছুটে এসে ছিলেন, 'বিভু এসেছিস, আমার বিভু! আয় বিভু, আমার কাছে আয়।'

মা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে ছুটে এসে, দু হাত বাড়িয়ে কোন্ দিকে ছুটে যাবেন, যেন ঠিক করতে পারছিলেন না। কেবল ব্যাকুল স্বরে ডাকছিলেন, 'বিভু আমার বিভু!'

বিভূতির তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, মায়ের চোখে ছানি পড়েছে। মা দেখতে পান না। মনে পড়তেই ও মায়ের সামনে ছুটে গিয়েছিল, নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল, 'এই যে মা আমি, এই যে!'

মা বিভূতিকে জড়িয়ে ধরে, হা হা স্বরে কেঁদে উঠেছিলেন, 'সকলে বলতো তোকে আর কোনোদিন ফিরে পাব না। হা, ওরে বিভু, আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বিভূতির বুকের মধ্যে টলটলিয়ে উঠেছিল। এতোটা আবেগপ্রবণ ও ছিল না। ভয় পাচ্ছিল, চোখে জল এসে পড়বে। বলেছিল, 'দেখতে পাবে মা। আমি শীগগিরই তোমার ছানি কাটবার ব্যবস্থা করবো। তুমি সবই আবার দেখতে পাবে।'

'না না, বিভু, আমি সব দেখতে চাই না।' মার থানের ঘোমটা খোলা পাকা চুল মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'শুধু তোকেই একটু দেখতে চাই। এ জীবনে আমার আর কিছু দেখবার নেই, শুধু তোকে, তোকে একবারটি দেখতে চাই।' মা বিভূতির সারা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন।

পাশের বাড়ি থেকে কাকা-কাকিমা এসেছিলেন। ভাই-বোনেরা এসেছিল। প্রণাম করা আর প্রণাম নেবার জন্য যেন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। কাকা বিভূতির হাত ধরে, মাটির দোতলা ঘরের দাওয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন 'আয়, আগে একটু বোস।' মাকে ডেকে বলেছিলেন, 'বৌঠান এসো।'

মাকে উঠোনে তাঁর সমবয়সী প্রতিবেশিনীরা সান্তনা দিচ্ছিল, আর তোমার দুঃখ কী? তোমার মানিককে ফিরে পেয়েছো তো।'…

বিভূতি কাকার সঙ্গে দাওয়ায় উঠে পাশাপাশি একটা বেঞ্চিতে বসেছিল। জ্যোতি কোথায়? তাকে দেখা যাচ্ছিল না। লজ্জা পাচ্ছিল নাকি বিভূতির সামনে আসতে? কাকা স্বর তুলে বলেছিলেন, 'কই গো বউমা, বিভূতির জন্য একটু চা কর। চা জলখাবার খেয়ে একটু জিরোক, তারপরে নাইবে খাবে।'

বিভূতির একটি খুড়তুতো বোন রান্নাঘরের কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল 'বউদি চা জলখাবার করছে বাবা, হলেই আমি নিয়ে আসছি।'

জ্যোতি তাহলে বিভূতির চা জলখাবরের জন্য ব্যস্ত ছিল? উঠোনের ভিড় অনেকটাই পাতলা হয়ে গিয়েছিল। উঠোনের এক পাশে বড় একটা আতাগাছের ছায়ায় মা তাঁর প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বসে বকবক করছিলেন। একটু পরেই খুড়তুতো বোন চা আর জলখাবার নিয়ে এসেছিল। কাকাকেও চা দিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতি? বিভূতি মনে মনে ভেবেছিল, জ্যোতি কখন আসবে? এতক্ষণে ওর চেহারাটাও দেখা হলো না যে!

জ্যোতি এসেছিল অনেক পরে। কাকা-কাকিমা, বাইরের লোকজন প্রায় সবাই চলে যাবার পরে সামনে এসেছিল। বিভূতি এখন ঘরের মধ্যে গিয়ে, কাঁধের ব্যাগটা এক পাশের তক্তপোশের ওপর রেখে, সবে মাত্র সিগারেট ধরিয়েছিল। জ্যোতি ঘরে ঢুকে আগেই নিচু হয়ে বিভূতির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। বিভূতির অবাক চমকানোর মধ্যে খুশির ঝিলিক ছিল, আরে, এটা আবার কী হচ্ছে?' ও জ্যোতির একটা হাত ধরেছিল।

'ধর্ম'। জ্যোতি হেসে বলেছিল। ওর বেগুনি রঙের পাড়, বেগুনি ডোরা শাড়ির ঘোমটা খসে গিয়েছিল।

বিভূতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ধর্ম?'

'তা হলে কর্ম।' জ্যোতি আবার হেসেছিল, 'তুমি যেমন মাকে প্রণাম করলে, কাকা কাকিমাকে করলে। আর আমি স্বামীকে প্রণাম করবো না?'

বিভূতি কৌতূহলিত উৎসুক আবেগে জ্যোতির দিকে তাকিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ছ'বছর না। তারো অনেক কাল আগে থেকেই যেন জ্যোতিকে দেখা হয়নি। ভাবনাটা একেবারে মিথ্যা না। জঙ্গলের গভীরে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকাকালীন জ্যোতির সঙ্গে বার কয়েক মাত্র দেখা হয়েছিল। বাড়ি আসবার উপায় ছিল না। সব সময়েই নজর রাখা হতো। খুব সাবধানে, আগে থেকে খবর নিয়ে যে-কয়েক-বার বাড়িতে এসেছিল, সে সময়ে জ্যোতির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখা হয়নি। তাই মনে হয়েছিল, ছ' বছর না, 'তারো অনেক আগে থেকে জ্যোতিকে যেন দেখা হয়নি। তবু বিভূতির রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জ্যোতির এমন একটা সহজ আর অনায়াস যোগসূত্র ঘটেছিল, ওরকমভাবে স্বামীকে প্রণাম করা যেন ওকে মানাচ্ছিল না। অবিশ্যি বিভূতি মনে করতে পারছিল, সশস্ত্র বিপ্লব আর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সময়টায়, জ্যোতির চোখে মুখে সব সময়েই যেন একটা আকস্মিকতার ঘোর ছিল। দুজনের রাজনৈতিক যোগসূত্রের কোথায় যেন একটা অস্পষ্টতার ছায়া পড়েছিল। কিসের ছায়া সেটা? জ্যোতি বিভূতিকে সমর্থন করতে পারছিল না? না কি ভয়ে আর উদ্বেগে ওরকম মনে হতো?

'কী দেখছো অমন করে?' জ্যোতি হেসে উঠে, মাথায় আর একটু ঘোমটা টেনে দিয়েছিল।

বিভূতি বলেছিল, 'তোমাকে!' এবং বিভূতি সত্যি জ্যোতিকেই দেখছিল। জ্যোতি লাবণ্য হারিয়েছে, এমন মনে হয়নি, কিন্তু কিছুটা যেন শীর্ণ হয়েছে। যে শীর্ণতাকে যথার্থ স্বাস্থ্যহানি বলা যায় না, বরং অতি ব্যবহৃত, ক্ষয়প্রাপ্ত ধারালো কাস্তের মতো। হাসিটা ওর তেমনি ঝকঝকে আছে, তবু কেমন যেন একটু বদলিয়ে গিয়েছে। ওর চোখের কালো তারা দুটোয় বরাবরই একটা দীপ্তি ছিল। কিন্তু এখন যেন সেই কালো চোখের গভীরে কোথায় একটা রহস্যের অতলতা। অথচ ওকে আশ্চর্য আকর্ষণীয় লাগছিল।

জ্যোতি যেন লজ্জা পেয়ে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলেছিল 'ওরকম করে দেখো না লজ্জা করছে।'

'কিন্তু আমার ভালো লাগছে।' বিভূতি জ্যোতির হাতটা আর একটু জোরে

চেপে ধরেছিল।

জ্যোতি কেমন হাল্কাভাবে হেসেছিল, 'জেলে কেমন ছিলে, শুনি আগে?'

'কেমন আবার? প্রথমে কিছুদিন খুবই টর্চার করেছিল।' বিভূতি বলেছিল, 'কিন্তু জেলের কথা বলতে এখন ভাল্ লাগছে না। তোমাদের—তোমার কথা বলো। তোমাকে যে আমি লিখেছিলাম, শহুরে বাপের বাড়ি গিয়ে আবার লেখা-পড়া শুরু করো, তা তো করোনি। কোনো জবাবও দাওনি।'

জ্যোতি তেমনই হেসে বলেছিল, 'ও-কথার কী জবাব দেবো? আমার শাশুড়িকে এখানে ফেলে রেখে, আমি বাপের বাড়ি গিয়ে কলেজে ভর্তি হবো? তাই কখনো হয়?' একটু থেমে, একটু গম্ভীর হয়ে, আবার হেসে বলেছিল, 'তা ছাড়া, এসব লেখাপড়ার কী মূল্য আছে? চারপাশে তো অনেক লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে দেখছি। কী দাম আছে ওসবের?'

বিভূতির বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যেন হঠাৎ বিজলী হেনেছিল। জ্যোতি এমন একটা কথা বলেছিল, যার কোনো জবাব বিভূতির সেই মুহূর্তে জানা ছিল না। ও কিছু বলবার আগেই জ্যোতি বাইরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে, চলে যেতে যেতে বলেছিল, মা আসছেন, কথা বল।'

মা এসে ঘরে ঢুকেছিলেন।

কলকাতা যাবার আগে তিনদিন জ্যোতির সঙ্গে এইরকম টুকরো টুকরো কথা হয়েছিল। যে-সব কথার মধ্য থেকে অন্য এক জ্যোতিকে বিভূতি দেখতে পেয়েছিল। প্রথম দিনই বিকালে পুরনো একটি খবরের কাগজের একটি সংবাদের দিকে জ্যোতি আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যি একথা বলেছিলে নাকি?'

বিভূতি ছোট হেডিংটার দিকে তাকিয়েছিল: 'আমি আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করি না। —নকশাল নেতা বিভূতি মুখার্জী।

বিভূতির বুকের ভিতরে যেন একটা অন্ধকার পর্দা দুলে উঠেছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, জেল থেকে বলেছিলাম। আমাদের পার্টি তখন অলরেডি এই লাইন নিয়েছিল। কেন বলো তো?'

'এমনি'। জ্যোতি হেসেছিল, 'খবরের কাগজে তোমার নিজের কথা এইটাই প্রথম বেরিয়েছিল।' বলতে বলতে ও রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।

বিভূতি কাগজ ছোঁড়বার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তার মানে, তিন মাস রেখে দেওয়া খবরের কাগজটা জ্যোতি ছিঁড়ে ফেলেছিল। যেন বিশ্বাস করতে পারেনি বিভূতি ও-কথা বলেছে। তার মুখ থেকে শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই

কি ? তা না হলে জিজ্ঞেস করার অর্থ কী, ছিঁড়ে ফেলারই বা কারণ কী ?

বিভূতি পরে এক সময়ে জ্যোতিকে বলেছিল, 'আমরা ভুল পথে চলেছিলাম। জনসাধারণ আমাদের ত্যাগ করেছিল। হঠকারিতা বলতে পারো। আমাদের নতুন আন্দোলন কীভাবে শুরু হবে, কলকাতার রাজ্যকমিটিতে সেই আলোচনা হবে। মূলতঃ গ্রামে গ্রামে কৃষক আন্দোলনই আমরা সংগঠিত করবো।'

জ্যোতি বিভূতির চোখের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো শুনেছিল, আর কেবল একটি মাত্র শব্দ করেছিল, 'ও।' বিভূতি বুঝতে পেরেছিল, শব্দটার মধ্যে নির্লিপ্তির সামান্য সুরও ছিল না। জ্যোতি আবার হালকাভাবে হেসে যেন খুবই অ'লগোছে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল, আন্দোলন করলে জনতা সরকার কিছু বলবে না ?'

বিভূতির প্রথমে মনে হয়েছিল, জ্যোতি ঠাট্টা করছে কিন্তু ওর চোখে ঠাট্টার লেশ ছিল না। বিভূতি বলেছিল, 'বলতে পারে, তা বলে আমরা আন্দোলন থামাতে পারি না। আমরা জনতা সরকারকে কোনো মুচলেকা লিখে দিই নি।'

'তা বটে।' কথাটা বলে জ্যোতি সামনে থেকে চলে যাবার উপক্রম করেছিল।

বিভূতি তাড়াতাড়ি 'ডেকে বলেছিল, .জ্যোতি, এবার থেকে আমি গ্রামেই আন্দোলন শুরু করবো। এখন আমার সঙ্গে আন্দোলনে নামতে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।'

জ্যোতি হতচকিত বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, 'আমি ? আন্দোলনে নামবো।' হঠাৎ হেসে উঠে মাথা নেড়েছিল, 'না না, আমি ওসবে নেই। আমার সংসার আছে, শাশুড়ি আছেন, তুমি আছো। এসব ছাড়া আমি এখন আর কিছু ভাবতেই পারি না।'

বিভূতি আহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমাদের পার্টিতে আসতে চাও না ?

'আমি কোনো পার্টিতেই যেতে চাই না।' জ্যোতি আলগাভাবে হেসে বলেছিল, 'আমি একেবারে সাধারণের দলে। আমার বাপু কোনো পার্টির দরকার নেই। তোমার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি।' জ্যোতি সামনে থেকে চলে গিয়েছিল।

বিভূতির বুকে সেই অন্ধকার পর্দাটা দুলে উঠেছিল। জ্যোতির চলে যাওয়াটা অসামান্য মনে হয়েছিল। ওর হাসিটা কি সত্যি নেহাত আলগা ? বিভূতি তো চায়ের তৃষ্ণাবোধ করে নি।

কলকাতা যাবার আগের দিন বিকালে, জ্যোতি হঠাৎ হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করো না, কিন্তু যে নিরাপরাধ লোকগুলোকে

তোমরা খুন করেছো, তার কী হবে ?'

বিভূতি অবাক হয়ে বলেছিল, নিরপরাধ জেনে তো আমরা কারোকে মারি নি।

'তবু তো অনেকে নিরপরাধ ছিল।' জ্যোতির মুখে সেই আলগা হাসি লেগেছিল ; চোখের কালো তারায় কি কৌতুকের ছটা ?

বিভূতি বলেছিল, 'আমরা তো বলেছি, সেগুলো আমাদের ভুল হয়েছিল।'

'তা বটে।' যেন খুব তুচ্ছভাবে হেসে বলেছিল।

বিভূতি চুপ করে থাকতে অস্বস্তিবোধ করেছিল, 'আমরা ভুল করেছি, তাবার তো সংশোধন করবো। কিন্তু আমাদের থেকে পুলিস আরো অনেক বেশি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে।'

'পুলিস!' জ্যোতি যেন অবাক হেসে কথাটা উচ্চারণ করেছিল, 'ওদের সঙ্গে তোমাদের আমি মেলাতে পারি না। পুলিস তো পুলিসই। ইদানীং দেখছি, তারাও বাড়াবাড়ির ভুল স্বীকার করছে। অদ্ভুত, না ?' যেন নেহাত কৌতুকোচ্ছলে শব্দ করে হেসে উঠেছিল।

বিভূতির বুকের ভিতরের সেই অন্ধকার পর্দা দুলছিল, আর অস্বস্তি বাড়ছিল এবং কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারে নি। জ্যোতির হাসিটা অসাধারণ মনে হয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কিছু বলতে চাও জ্যোতি ?'

জ্যোতি ওর হাসির সরসতা হারায় নি, ওর অনায়াস ভঙ্গিতে বলেছিল, 'না। মাঝে মাঝে গোপালদার কথা আমার খুব মনে হয়।'

বিভূতি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'কে গোপালদা ?'

'একজন ফেরিওয়ালা।' জ্যোতির সরস হাসিতে একটু যেন ছায়া ঘনিয়েছিল, 'এই গ্রামের বাইরে তোমরা যাকে শেষবার খতম করেছিলে।'

বিভূতি অধিকতর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফেরিওয়ালা ? হ্যাঁ, কিন্তু সে গোপালদা কী করে হলো ?'

'গোপালদা শহরে আমার বাপের বাড়ির পেছনে তাঁতী পাড়ায় থাকতো। জ্যোতি মুখে হাসি বজায় রেখে কথাটা বলেছিল, 'পরে জেনেছিলাম আমার ভাইয়ের কাছে, সেই ফেরিওয়ালা আমাদের তাঁতী পাড়ার লোক। লোকটা খুব রগুড়ে ছিল, অনেক মজার মজার ছড়া কাটতে পারতো, কোমর ঘুরিয়ে নাচতো—লোক হাসবার জন্য—আসলে মাল বিক্রির ফিকিরে।' জ্যোতির মুখ রক্তের ছটায় যেন দপদপ করছিল, কিন্তু হাসছিল, 'আমাদের ছেলেবেলা থেকে গোপালদাকে চিনতাম, অনেক পুঁতির মালা আর কপালের টিপ্ তার কাছ থেকে কিনেছি। তার বউ আর তিন চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। বউটিকেও দেখেছি—ভারি মিষ্টি—কিন্তু

আশ্চর্য, গোপালদাকে এ গ্রামে কোনোদিন মাল ফেরি করতে আসতে দেখি নি। শহর থেকে অন্য একটা ফেরিওয়ালাই তো এ গ্রামে আসতো।

বিভূতির চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা ভাসছিল, গলা কাটা ফেরিওয়ালাটা শাল গাছের গোড়ায় ছিটকে পড়লো। রক্তাক্ত ছুরিটা ওর নিজের হাতে। মাথার বেতের গোল চুপড়িটা আর কাঁধে ঝোলানো, সেপ্টিপিন চুলের ফিতের ব্র্যাকেটটাও দু পাশে পড়েছিল। সিঁদুর, আলতা, সস্তা সাবান, স্নো, পাউডার, গোল চৌকো ছোট ছোট আয়না, লক্ষ্মীর পাঁচালী, বাঁধানো দেবদেবীর ছবি, এমন কি খান কয়েক সিনেমার চটি ম্যাগাজিনও। জ্যোতি বলছিল, আর সেই ছবিটা বিভূতির চোখের সামনে ভাসছিল, একটা খণ্ডের ছবি। কিন্তু ওর বুকের অন্ধকারে বিজলী হানাহানি করছিল। মনে হচ্ছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ঘেমে উঠেছিল। প্রায় ফ্যাসফেসে স্বরে বলেছিল, 'লোকটা আমাদের সাসপেকটের তালিকায় ছিল, আগের থেকেই খবর ছিল, ও একজন স্পাই। আসলে শহর থেকে আসা নতুন মুখ কী না, তাই—।' বিভূতি জ্যোতির দিকে চোখ তুলতে গিয়েছিল।

জ্যোতি তখন সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

পরেরদিন ভোরবেলার ট্রেনেই বিভূতি জেলা শহরে গিয়েছিল। আগে ঠিক ছিল, রিকশায় হাইওয়ে পর্যন্ত গিয়ে, টানা বাসে কলকাতায় যাবে। কিন্তু ও মতের পরিবর্তন করেছিল। শহর হয়ে কলকাতা যাওয়া স্থির করেছিল। শহরে গোপাল ফেরিওয়ালার বিধবার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। জ্যোতিকেও বলেছিল সে-কথা। জ্যোতি অবাক হয়ে বলেছিল গোপালদার বউকে তুমি কোথায় পাবে?'

'কেন, তাঁতীপাড়ার বাড়িতে।' বিভূতি বলেছিল।

জ্যোতি যেন জোর করে হেসেছিল, 'সে কি আর সেখানে আছে?'

'কোথায় যাবে?'

জ্যোতি ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'কী জানি।'

'তোমার ভাই হয় তো বলতে পারে।'

'তা হয় তো পারে।' জ্যোতি হেসেছিল, 'কেন কী হবে দেখা করে?'

'তা জানি না। একবার দেখতে ইচ্ছা করছে।' বিভূতি বলেছিল।

জ্যোতি হেসে বলেছিল 'ভুল তো ভুলই। সব ভুলের কি সংশোধন হয়?'

হয় তো হয় না, তবু বিভূতি গিয়েছিল। জ্যোতির হাসিটা খুব সহজ মনে হয় নি। শহরে পৌঁছে ওকে আগে জ্যোতির বাপেরবাড়ি যেতে হয়েছিল। জামাই আপ্যায়নকে সে মোটেই আমল দেয় নি। জ্যোতির ভাই টুপান, কলেজে পড়ে।

টুপানকে ও বলেছিল, 'আমাকে একবার গোপাল ফেরিওয়ালার বাড়ি নিয়ে যেতে পারো? আমি তার বিধবার সঙ্গে একবার দেখা করবো।'

টুপান হতচকিত বিস্ময়ে বলেছিল, 'সে তো আর তাঁতীপাড়ায় থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

বিভূতির কথার জবাব, টুপান হঠাৎ দিতে পারে নি, কেমন যেন থতিয়ে যাচ্ছিল। বিভূতি আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'দূরে কোথাও চলে গেছে?'

টুপান মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, এ শহরেই আছে।'

আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো না? বিভূতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিল।

টুপান বলেছিল, 'পারি।'

'তবে চলো।' বিভূতি বলেছিল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই কলকাতায় যেতে হবে।'

বিভূতিকে নিয়ে টুপান সাইকেল রিকশায় চেপে শহরের এক অংশে গিয়েছিল। যে-রাস্তায় রিকশাটা গিয়ে ঢুকেছিল, বিভূতি দেখেই চিনতে পেরেছিল, অঞ্চলটা শহরের বেশ্যাপল্লী। শহরের সব থেকে শ্রীহীন দুর্ভাগা অঞ্চল।' অধিকাংশই মাটির ঘর, মাথায় খড়ের চাল। দোকানপাট বলতে চা, তেলেভাজা, পান বিড়ি সিগারেট,—সবই বিবর্ণ। কাছে একটা পুকুরে পাড়ার মেয়েদের উদাস আর নির্লজ্জ অবগাহন, বাসন মাজা, কাপড় কাচার সঙ্গে উৎকট আলাপ। পাশাপাশি কয়েকটা ঘিঞ্জি ঘরের সামনে টুপান রিকশা দাঁড়াতে বলেছিল। বিভূতি যেন স্বগতোক্তি করেছিল, সে এখানে থাকে?

টুপান বলেছিল, 'হ্যাঁ।

বিভূতি এক মুহূর্ত ভেবেছিল, রিকশা থেকে আদৌ নামবে কী না। ওর চোখের সামনে, শাল গাছের গোড়ায় ছিটকে পড়া সেই রক্তাক্ত চেহারাটা ভেসে উঠেছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গোপাল ফেরিওয়ালার ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকে?'

'এখানেই।' টুপান নির্বিকারভাবে বলেছিল, 'কোথায় আর যাবে?'

বিভূতি রিকশা থেকে নেমেছিল। একটা কথা তার বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করার ছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল. 'তুমি ঠিক জানো, সে এ বাড়িতেই থাকে?'

'কুসুমদিকে এখানেই অনেকদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।' টুপান সহজভাবে বলেছিল।

কুসুমদি। বিভূতি মনে মনে উচ্চারণ করেছিল। ইতিমধ্যে কৌতূহলী দু একজন

ওদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। টুপান একটি ঘরের খোলা দরজার সামনে গিয়ে ডেকেছিল, 'কুসুমদি আছে নাকি?'

ভিতর থেকে গোঙানো স্বরে জবাব এসেছিল, 'কে?' তারপরে আলুথালু বেশে একটি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসেছিল। উসকো খুসকো চুল, গায়ে জামা নেই। গলায় আর গালে ধুলো। চোখ দুটো লাল। তার সারা গা থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বোধ হয় কাঁচা মাটির মেঝেয় শুয়েছিল গত রাত্রের খোয়ারি মেটেনি। লাবণ্য না থাক, সদ্য তাতানো বাসি বাগুনের মতো একটা ঝাঁজ ছিল শরীরে। চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, এক সময়ে সত্যি মিষ্টি দেখতে ছিল। বিভূতি ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

কুসুম অবাক চোখে টুপানের দিকে তাকিয়ে জড়ানো স্বরে বলেছিল, টুপান না কি? তুই হেথাকে ক্যানে?' বলে বিভূতির দিকে একবার তাকিয়ে, গায়ের কাপড় ঠিক করেছিল।

টুপান বিভূতির দিকে একবার তাকিয়েছিল, 'কুসুমদি, ইনি আমার জামাইবাবু, তোমার কাছে এসেছেন।'

'আমার কাছে?' কুসুম যেন অবাক আর শশব্যস্ত হয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দেবার চেষ্টা করেছিল, যদিও দিতে পারেনি, বরং নিজেকে আরোই অবিন্যস্ত করে তুলেছিল, 'জ্যোতনের বর আমার কাছে? ক্যানে রে টুপান?'

হ্যাঁ, জ্যোতিকে ওর বাপের বাড়িতে, পাড়ার প্রতিবেশীরা জ্যোতন বলেই ডাকে। টুপান তাকিয়েছিল বিভূতির দিকে। বিভূতির বুকের ভিতরে অন্ধকার পর্দাটা যেন বাতাসের ঝাপটায় বাড়ি খাচ্ছিল, ঘামে ভিজে উঠেছিল মুখ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলেছিল, 'আচ্ছা, একটা কথা, আপনার মনে আছে কি, আপনার—।'

কুসুম ফেসো গলায় হেসে উঠে, মুখে আঁচল চেপেছিল। লাল চোখে বিভূতিকে একবার দেখে, টুপানের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'অই মা' কোথা যাব গ। জ্যোতনের বর আমাকে আপনি আঁজ্ঞা করছে যে?'

বিভূতি একটু থতিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আপনি সম্বোধন করা ছাড়া, ওর কোনো উপায় ছিল না। ও খুব তাড়াতাড়ি ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার স্বামী তো কখনো সেই গ্রামে ফেরি করতে যেতো না। আমি তো সেই গ্রামের ছেলে, কখনো দেখি নি। অন্য একজন ফেরিওয়ালাকে দেখতাম।'

'হু' কেতু যেতো, উদিককার দূরের গাঁগুলোতে কেতু ফিরি করতে যেতো।' কুসুম যেন একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল, 'তা সে তো কপালের লিকন বাবা।

কেতুটা মাস ভর জ্বর জ্বালায় ভুগছিল। আমার সোয়ামীকে বলেছিল, 'নইলে আবার কোন্ নতুন লোক হোথাকে বাজার জমিয়ে বসত, তাই বলেছিল। মানুষের মন তো, দুদিন না দেখলে ভুলে যায়। তাই আমার লোক কেতুর সাথে নিয়ে গিছল। কপালের লিকন, আসলে যমে টেনেছিল যে বাবা!'

যমে টেনেছিল। বিভূতির চোখে ওর নিজের চেহারাটা ভেসে উঠেছিল। হাতে ছুরি, দাঁতে দাঁত পেষা। অন্যান্য কমরেডরা আশেপাশে গাছের আড়ালে। বিভূতি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেরিওয়ালার ওপর, আর বাঘের মতোই টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাছের গোড়ায়, আর ছুরির একটা নির্ঘাৎ ফাঁসাতেই টুঁটি দুই টুকরো। কুসুমের সামনে দাঁড়িয়ে বিভূতি ওর দুটো হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। টুঁটি কাটার অনুভূতিটা যেন হাতে স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল। হাত দুটো ঘেমে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল, আর বিকৃত গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল,'আর তারপরেই আপনি এ পথে চলে এলেন? এই জীবনে?'

কুসুম হেসেছিল, 'এমনি কি আর এইচি। ছেলেমেয়েগুলানকে নিয়ে ধান্দা তো মেলাই করেছিলাম—তা সে তোমাকে আর কী বলে বুঝাব গ, ভাতার মরা, কাঁড়ে রাঁড়ি, নুকব কোথা? পেটের শত্তুরগুলানকে বাঁচাই বা কী করে? তাই এক ভাতার হারিয়ে বারোভাতারি হইচি।'

বিভূতির চোখে সেই চোখ দুটো ভাসছিল, অবাক আর ভয়ার্ত চোখ। সেই একটিমাত্র অস্ফুট গোঙানি কানে বাজছিল, যে গোঙানির স্বরে আর্ত আর অবাক জিজ্ঞাসা ছিল।

কুসুমের লাল চোখে কৌতূহল ফুটেছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা হ্যাঁরে টুপান, জ্যোতনের বর জেলে ছিল না?'

টুপান বলেছিল, 'হ্যাঁ, কয়েকদিন হল ছাড়া পেয়েছেন।'

'অ।' কুসুম বিভূতির দিকে তাকিয়েছিল, 'তা, জামাই, তুমি আমাকে এসব কথা জিগেঁস করছ ক্যানে?'

কেন, কেন জিজ্ঞেস করছিল বিভূতি? তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারেনি। বলতেও পারেনি, সে-ই সেই কপালের লিখন, সে ই সেই যম। একটু পরে তার গলার স্বর যেন কোলা ব্যাঙের মতো শুনিয়েছিল, 'আমি বলতে এসেছিলাম, আপনার স্বামীকে ভুল করে মারা হয়েছিল।'

'অহ্, এই কথা!' কুসুম হেসে তুচ্ছভাবে বলেছিল 'তা হবে। ও-কথায় আর কী দরকার, সব তো চুকেবুকে গ্যাছে। খুনের খবর যখন পেথাম পেইছিলাম, তখন মনে মনে বলতাম, ওতো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা গ। দেশে গাঁয়ে এত যে

শত্রুর, সব লাট বেলাটি করে বেড়াচ্ছে, উয়াদের মুণ্ডুগুলাই কাটে ক্যানে নাই?' কুসুম টুপানের দিকে যেন লাল চোখে রেগে তাকিয়েছিল, ওই উয়াদের, জামাইকে যারা জেলে পুরেছিল, উয়াদের মুণ্ডুগুলান কাটা যায় ক্যানে নাই?' সে ঘাড়ে ঝটকা দিয়েছিল, দিয়ে হেসেছিল 'ত বুঝি।'

উয়াদের মুণ্ডুগুলান। বিভূতি মনে মনে উচ্চারণ করেছিল, আর জ্যোতির মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বুকের অন্ধকার পর্দাটা ঝাপটায় ঝাপটায় ফালা ফালা হচ্ছিল, আর আগুনের হল্‌ক ছিটকে আসছিল। রাগে না, ভিতরের একটা অবাধ্য আবর্তকে রোধ করার জন্যই যেন দাঁতে দাঁত চেপে বসছিল। ঘামে গায়ের জামাটা সপসপে হয়ে যাচ্ছিল। কুসুমের দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে উচ্চারণ করেছিল 'চলি।' বলেই রিকশায় উঠেছিল।

বাইরের ঘরে অন্ধকার নেমে আসছে। বিভূতি যেন নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এখনো দুএকটা পাখির ডাক শোনা যায়। ও কিছুক্ষণ আগেই কলকাতা থেকে ফিরেছে। ফিরে বাইরের ঘরে ঢুকেছে, ভিতরে যায়নি। রাজ্য কমিটির সভায় আলোচনার মোট বক্তব্য সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলোর ঐক্যসাধন, শহরে গ্রামে যুগপৎ তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে তোলা। এরকম একটা বক্তব্য বিভূতির জানাই ছিল, কিন্তু এই প্রথম পার্টির সভা ওর মনে তেমন দাগ কাটেনি, কারণ মস্তিষ্কের কোষে কোষে সমস্ত সীমান্ত জুড়ে কেবল কুসুমের কথাই বেজেছে। এখনো বাজছে।

জ্যোতি একটা ছোট চৌকো লণ্ঠনের আলো নিয়ে ঘরে ঢুকলো। না, বিভূতিকে দেখে সে অবাক হলো না, বরং সহজভাবেই বলল, 'কলকাতা থেকে ফিরে বাড়ি ঢোকেনি কেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছো।'

বিভূতি জ্যোতির দিকে ফিরে তাকালো, 'হ্যাঁ, অন্ধকার। তোমাকে ডাকব ভেবেছিলাম। জ্যোতি, আমি গোপালদার বউ কুসুমের সঙ্গে দেখা করেছি।'

জ্যোতি আলগাভাবে হাসলো, 'তাই নাকি? কুসুমদি তো শুনেছি—।'

'হ্যাঁ, উনি—।' বিভূতি জ্যোতিকে বাধা দিয়ে কুসুমের বেশ্যা জীবনযাপনের কথা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। ও দেখলো লণ্ঠন হাতে জ্যোতির চোখ দুটো প্রতিমার প্রদীপ্ত অপলক চোখের মতো আকর্ণ বিস্তৃত দেখাচ্ছে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ বিভূতির চোখের দিকে।

বিভূতির অতিকায় ছায়া মাটির দেওয়ালে। জ্যোতির ছায়া ঘরের মাটির মেঝের দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। বিভূতির স্বর যেন দৈববাণীর মতো শোনালো, 'কুসুমদি বললেন, দেশে গাঁয়ে এত যে সব শত্রু লাটবেলাটি করে

বেড়াচ্ছে, আমাদের যারা জেলে পুরেছে, তাদের মুণ্ডুগুলো কাটা হয় না কেন?,

জ্যোতির অপলক চোখ যেন আরো দীপ্ত দীর্ঘ হলো। প্রতিমার মুখে ঘাম তেল মাখানো। দৃষ্টি বিভূতির চোখের প্রতি। আলগা হাসিটা এখন আর নেই। ও লণ্ঠনটা রাখবার জন্য বিভূতির সামনে এগিয়ে গেল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা রাখলো। ওর ছায়াটা এখন বিভূতির পাশে মাটির দেওয়ালে উঠে এলো।

বিভূতি মুখ ফিরিয়ে জ্যোতির দিকে তাকালো। জ্যোতির মুখ নীচু। বিভূতির মনে হলো ওর গলার কাছে কিছু ঠেলে আসছে, কোনো কথা অথচ উচ্চারিত না হয়ে কেবল শক্ত আর ভারি হয়ে উঠছে।

জ্যোতি মুখ তুলে বিভূতির দিকে তাকালো। জ্যোতি হাসছে। অনেক দিনের পুরনো জ্যোতিকে যেন চেনা যাচ্ছে। এ হাসি আলগা না, এ হাসি জ্যোতির্ময়ী। জ্যোতি ওর আপন রূপে চেনা হয়ে উঠছে, চোখের দুই কোণে দুটি বিন্দুর কিরণে।

মুখোমুখি

সুতপেশ দাশ

সে দিনটা ছিল রবিবার।

হাতে কোন কাজ ছিল না। অফিসে যাবার তাড়া নেই। কাজেই স্নান খাওয়ারও তাড়া নেই। বিছানায় চিৎপাত হয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম।

'মেদিনীপুর ও বর্ধমানে, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি'—'খাদ্যে দাবীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সত্যাগ্রহ'—'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন—এম. এল. এ সহ বাইশজন গ্রেফতার—ইত্যাদি। তার পাশেই হয়তো রয়েছে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দূরীকরণে সরকারী প্রচেষ্টার বিবরণ, অমুক স্থানে এক হাজার ম. চাল ও গম সরবরাহ—অমুক স্থানে আংশিক রেশনিং প্রথা চালু—খাদ্যশস্যের জন্যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ।

তবু কাগজে বেরোয় খাদ্যাভাবের ভয়ংকর অবস্থার কাহিনী। গা সয়ে যাওয়া বর্ণনা। তবু বেরোয় দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের উপবাস-কাহিল কংকাল-সর্বস্ব দেহের বৈচিত্র্যহীন চিত্র। দাদের মলমের বিজ্ঞাপনটার মতোই অতি সাধারণ চেহারার ছবি—আকর্ষণহীন।

আমার বিছানায় শুয়ে থেকেই দেখা যায় রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথে একটি উপবাসক্লিষ্ট শীর্ণদেহ নারীমূর্তি। তিনটি বাচ্চা ওর গায়ে যেন এঁটুলির মতো লেগে রয়েছে। ওদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। মস্তবড পেটটার চারপাশ যেন চারটে কাঁকাটির মতোই আটকে দেওয়া হয়েছে চারটে হাত-পা। মাথাটা অস্বাভাবিক—অশোভন। অন্নদা ভবনের গেটের ঠিক বাইরেই বসে আছে এই ভিখিরি বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে, কেউ দয়া করে দুটো পয়সা বা খাবার জিনিষ কিছু ফেলে দেবে এই আশায়।

'অন্নদা ভবন' এ অঞ্চলের 'বড়বাড়ী'। বাড়ীর মালিক ভবতোষ চৌধুরী এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। পিতা ৺অন্নদাচরণ চৌধুরীর পুণ্য স্মৃতি বহন করছে এই বিশাল দ্বিতল অট্টালিকা। কাঠের ব্যবসায়ে 'ব্যাঙ্ক ব্যালান্স' করেছেন ভবতোষবাবু। তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে যেদিন পিতা অন্নদা চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করেন, সেদিন থেকেই ভবতোষ চৌধুরী নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে-

ছিলেন সংসারের দায়িত্ব। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বহুলোক তাঁর আশ্রয়ে মানুষ হয়েছে। বহু ছেলের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছে তাঁর অনুগ্রহলাভে। পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে বহু ছাত্র তাঁর বাড়িতে থেকে। এই অঞ্চলের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি তিনি আজ। সমস্ত জীবনটা যেন তাঁর সার্থকতায় একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ। কোথাও ফাঁক নেই এতটুকু। কোথাও অপচয় নেই এতটুকু। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। নষ্ট হয়ে যেতে দেননি নিজের সামান্যতম উদ্যম ও শক্তিকেও।

তবু সবাইর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাঁর সহোদর ভ্রাতা অনুতোষ কেন এই ব্যবসায় সামান্য অংশের অংশীদারও নন? কেন তিনি এই ব্যবসাতে একজন কর্মচারী হিসাবে জীবনধারণ করছেন আলাদা বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে? এই ব্যবসা দাঁড় করানোর মূলে অনুতোষের কি কোন অবদানই নেই? তিনি কি শুধুই একজন বেতনভোগী কর্মচারী?

এই কাঠের ব্যবসা চালু হয় ভবতোষের নিজস্ব টাকায়— অন্নদাচরণের মৃত্যুর পর। অন্ততঃ লোকে তাই জানে। অনুতোষ তখন বারো বছরের ছেলে। সেই ছোট্ট ব্যবসা আজ এতবড় হয়েছে। বহুলোকের অন্নসংস্থানের উপায় করে দিয়েছে। ভবতোষের নিজস্ব টাকা খাটিয়ে যে ব্যবসা দাঁড় করানো হয়েছে তাতে অন্য কারো কোন অংশ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তিনি যে অনুতোষকে এই প্রতিষ্ঠানে ভালো মাইনের একটা চাকরী দিয়েছেন, এটা তাঁর উদারতা ছাড়া আর কি? এই পর্যন্তই লোকে জানতো। এর পরেও যে সত্যটুকু ছিল তা ছিল কালের প্রাচীর দিয়ে আড়াল করা—মানুষের অবগতির বাইরে। অনুতোষও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন দাদার স্নেহলাভে। দাদার ব্যবসায়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন দিনরাত—সকাল সন্ধ্যা। আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছেন।

তারপর রাত্রির পর দিন আসে। রাতে যা থাকে চোখের আড়ালে, দিনের আলোয় তা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে সবাই জানতে পারলো গভীরতর ইতিবৃত্ত। জানতে পারলো কত টাকার গহনা আর নগদ কত টাকা বিপত্নীক অন্নদাচরণ রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অকাল-মৃত্যুর সময়। আরও জানতে পারলো কী ভাবে ভবতোষ চৌধুরী আত্মসাৎ করলেন সেই টাকা, বারো বছরের নাবালক ভাই অনুতোষকে ফাঁকি দিয়ে। তারপরে এই ব্যবসা। কিন্তু ভবতোষ অবিবেচক নন। তিনি অনুতোষকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। নিজের ব্যবসায়ে ভাল মাইনের চাকরী দিয়ে জীবিকার সংস্থান করে দিয়েছেন। অবশ্য তাকে আলাদা ভাড়াটে বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকতে হয়। অন্নদা-ভবন শুধুই ভবতোষের।

অনুতোষ যেদিন জানতে পারলেন সমস্ত কাহিনী সেদিন কিন্তু তাঁর মধ্যে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা যায়নি। অত্যন্ত সহজভাবেই তিনি ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং আজও সেই সহজভাবেই দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন নিজের ন্যায্য পাওনার দাবী ত্যাগ করে। কেন তা কে জানে! হয়তো এটা তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। শুধু নিজের অদৃষ্টকেই দায়ী করে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিলেন নির্বিবাদে।

এদিকে বাইরের লোকেদের কাছেও ভবতোষবাবুর সম্মান ক্ষুন্ন হয়নি এতটুকুও। সমাজের লোকেরা তাঁকে এতদিন জেনেছে অন্যভাবে। তাঁর জনহিতকর কার্যকলাপে, আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে; শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রেখেছে, তাঁকে। তাই আজ সমস্ত বিষয় জেনেও খানিকটা অবিশ্বাসের থেকেই হোক, আর খানিকটা সংস্কারের বশেই হোক, ভবতোষকে তাঁরা পূর্বের ন্যায় সম্মানের আসনেই বসিয়ে রাখলো। আজ আর তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে যেন তাদের নিজেদের মূল্যই কমে যাবে। সমাজের 'বনেদি ভিত' যেন নড়ে উঠবে। তাই তারা আজ অবিচলিত। বহুদিনের অর্জিত ও অভ্যস্ত বিশ্বাসে অটল।

আর ভবতোষ নিজে?

মানুষ যখন সম্মান ও প্রতিপত্তির উঁচু শিখরে উঠে যায়, জীবনের সমস্তটা যখন ভরাট হয়ে ওঠে শুধুই সাফল্যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্পদে—তখন বোধ হয় জীবনের বিশেষ কোন এক অংশ ফাঁকা হয়ে গেলেও সেটা আবার ভরাট হয়ে ওঠে সেই বাড়তি সাফল্যে ও সম্পদে যাতে করে মানুষ তখন লজ্জা, সংকোচ, বিবেকের শাসন সব কিছুই ভুলে যেতে সক্ষম হয়। ভবতোষেরও তাই হয়েছিল। তাই নিজের কার্যকলাপ যেদিন উদ্ঘাটিত হল সেদিনও তিনি রইলেন অবিচলিত, সংকোচশূন্য।

ভবতোষ চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছেন দোতালার বারান্দায়। রেলিং-এ ভর দিয়ে দেখলেন গেটের বাইরে অনাহারক্লিস্ট ক্ষুধার্ত ভিখিরি এবং তার সন্তানদের। ছেলেগুলি বোধহয় খিদের জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। মায়ের কঙ্কাল দেহটাকে আঁকড়ে ধরে আছে তিনটি প্রাণী। যেন প্রাণহীন দেহ তিনটি। তবু ঐ অবস্থাতেও আঁকড়ে ধরে আছে একান্ত নির্ভরস্থল এই মায়ের দেহকে। কেউ এদের শিখিয়ে দেয়নি। তবু এরা জানে সমস্ত দুঃখ বিপদের নিবৃত্তি, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি এই মায়ের কোলে।

ভবতোষবাবু আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন। দাঁড়ালেন এসে গেটের বাইরে। ভিখিরি কপালে হাত ঠেকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে কি যেন চাইল। ইংগিতে

খোরাক খেতে চাইছে—পেটে খিদে। চোখ কোঠরগত। ঠোঁটের চামড়া এ'টে গিয়ে দাঁত ও মাড়ি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লেগেছে সে।

এই দৃশ্য দেখে ভবতোষবাবু বিচলিত হলেন। তাঁর মনের মধ্যেকার কো[illegible] অংশে আঘাত লাগলো। বাড়ীর চাকর নন্দকে ডাকলেন। তাঁর নির্দেশে[illegible]ত এল এক থালা। সঙ্গে কিছু তরকারি ও ডাল। থালাটা নন্দ কাত করে ঢেলে দেয় ওর এলুমিনিয়ামের পাত্রে। দাঁড়িয়ে দেখে ওর ভাবান্তর। ভবতোষ চৌধুরীও দেখেন। দীর্ঘ উপোসের পর ভাত পেয়ে ক্ষুধার্তের মুখের যে ভাবান্তর হয় তা বুঝি মানুষের দেখবার বস্তু—উপভোগের বিষয়।

মুহূর্তে ঝিল্‌মিল্‌ করে ওঠে ভিখিরির কোঠরগত চোখ। দাঁতগুলো আরও ভীষণভাবে বেরিয়ে পড়ে নিমেষে। ওটা হাসি না অন্য কিছু বুঝতে কষ্ট হয়। চুপি চুপি দেখে নেয় ছেলেগুলো নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে কিনা! হ্যাঁ—নিশ্চিন্ত। তারপর। তারপর গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাতের এক একটি দলা। যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তাকে পেয়ে বসেছে। খাবে, সে আরো খাবে। খেয়ে নেবে সে আগে পেট পুরে। ক্ষুধার নিবৃত্তি চাই তার। পরে অন্য চিন্তা। খেতে খেতে একবার চোখ তুলে তাকায় ভবতোষ চৌধুরীর দিকে মিনতিভরা চোখে। যেন খাওয়ার ব্যাঘাত না ঘটান তিনি—ছেলেদের যেন জাগিয়ে না তোলেন।

ভবতোষবাবু নিশ্চল—পাথর। না অসম্ভব নয়' অন্যায় নয়। এ-তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের—প্রত্যেক জীবের। হয়তো এই কথাই ভাবছিলেন তিনি। বোধহয় তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল চব্বিশ বছরের যুবক ভবতোষকে। কী যেন একটা মিল রয়ে গেছে সেই ভবতোষ আর ক্ষুধার্ত ভিখিরিতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবতোষবাবু ফিরে চললেন নিজের ঘরে। আজ—আজই বুঝি প্রথম দেখা গেল ভবতোষের মুখ বিবেকের দংশনে অন্ধকারময়, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, পদক্ষেপ পরাজিতের মতো।

ভগীরথ

সমরেশ মজুমদার

চিৎ হয়ে শুয়েছিল শিবনাথ। পা থেকে চাদরটা কপাল অবধি টানটান করে টানা, একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকার আরামটা পাওয়া যায়। একটু আগে ঘুম ভেঙেছে কেলে পঞ্চাননেরে চিৎকারে। পাশে হরেকেষ্টর চায়ের দোকানে চা খেতে এসে এমনভাবে দাঁড়-কাকিয়ে ডাকে যে শান্তিতে ঘুমোবে তার জো নেই। আর হরেদারও হয়েছে এক ঢং, চারটে বাজতে না বাজতে দোকান খুলে বসে থাকে ঝিগুলোর জন্য। সাত বাড়িতে কাজ করতে যাওয়ার পথে হরেদার দোকানে চা গিলে যায়। চোখ বন্ধ করে আর একটু ঘুমতে চেষ্টা করল শিবনাথ। কিন্তু ভোরের ঘুম শালা যৌবনের মত, একবার গেলে ফেরাবে কার সাধ্যি। চোখ থেকে চাদরটা নামিয়ে পিটপিটিয়ে তাকাল সে। ওটা কি দেখা যায় একদম চোখের সামনে। ছ্যা ছ্যা ছ্যা করে চোখ বন্ধ করল শিবনাথ। দিনে দিনটাকে নষ্ট করে। এই শালা পাড়াটা হয়েছে ভাগাড়খানা। দিনভর পলিটিক্স, সন্ধ্যেবেলায় মালটানা আর ভোর রাতে লুঙ্গি কোমরের ওপর তুলে ফুটে শুয়ে থাকা—কারোর আর লাজ লজ্জা রইল না। এখন এই লুঙ্গি তোলা পাছা দেখে চোখ বন্ধ হবে আর ?

পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ আটকে গেল। আহা, দেহ নয় তো মর্তমান কলা। মাথা নিচু করে কলের তলায় ধরেছে, জল পড়ছে সারা গায়ে, পিঠ কোমর উদোম। কোমরের থেকে পাক খেয়ে আঁচলটা বুকের ওপর জড়ো—সেদিকটা অবশ্য শিবনাথ দেখতে পাচ্ছে না। রাস্তার ওপর এই কলটায় বস্তির কোন মেয়ে দিনদুপুরে স্নান করে না। আহা, ভোরবেলায় চোখ ফেললে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখা যায়। লোকজন নেই, অন্ধকার সরে গেল মাত্র, স্নানের সময় লজ্জাটাও তাই কম। ভোরবেলায় মানুষের মনমেজাজ নরম থাকে, সারা রাত বিশ্রামের পর জল পড়ে শরীরেরও চেকনাই বাড়ে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে বেশ রসালো হবার পরই শিবনাথ মনে মনে নিজের গালে চড় মারল। শালা কে বলে তার ঘুম গেছে। নইলে চোখ চেয়েও সাত বছর ঘর করা বউটাকে চিনতে পারে না। নিজের বউ কাক-ভোরে দেহ ভেজাচ্ছে আর সে ভাবছে মর্তমান কলা। হঠাৎ সব রস ভুস করে উবে গেল যেন, পাশ ফিরল সে। পর পর ফুটপাথ জুড়ে ঘুমন্ত আধ-ঘুমন্ত মানুষের ছাড়াছাড়ি। এই বস্তির ঘরগুলোর ফ্যামিলিকে জায়গা করে দিতে

খোলা আকাশের তলায় ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমটা বেশ হয়। শিবনাথ দেখলে খানিক খানিক দূরে কে একজন চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। মদন না? গোফ গজায় নি ভাল করে, এখন থেকে পরের বউ এর স্নানের শরীরে চোখ লেপ্টে বসে আছ চাঁদ! আবার চোখে আড়াল দেওয়া হয়েছে! ও গতরটাকেও তো দেখছ কিন্তু ওর ভিতরে যে মালটি আছে তাকে খেয়াল রেখো হে, মনে মনে বলল শিবনাথ, বাপ কেলে শ্বশুরটা ওর গলার ভিতরে এক ডজন তাড়কাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল জন্মাবার সময়। নইলে কোন বউ তার স্বামীকে হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা বলার সাহস পায়। আর তা ফিসফিস করে নয়, পাড়ার সবাইকে জানিয়ে। স্বামীকেই যখন এই কথা বলে তখন তুই মদনা সেদিনের পুঁচকে তোকে কি বাক্য দেবে একবার ভাব দিকিনি। মনে মনে নিজেই বাক্যটার তল্লাস করতে করতে আনন্দে চোখ বুজল শিবনাথ।

বস্তির অনেকটা ভিতরে একখানা ঘর, তবে সেটা বেশির ভাগ সময় বন্ধই থাকে। বৃষ্টিবাদল হলে রান্নাবান্না আর খুব ঝগড়াঝাঁটি হলে এক এক রাতে শোয়ার জন্য দরকার হয়। তাছাড়া এই ঘরটা আছে বলে এই ব্লকের বাথরুম ল্যাটিনের ওপর হক আছে গঙ্গার। সি এম ডি এ থেকে ঝকঝকে সিমেন্টের ল্যাটিন করে দিয়েছে। পায়খানা শোয়ার ঘরের মত চেহারা নিলে সাহেবরা ল্যাটিন বলে এই বস্তির সবাই শিখে নিয়েছে। ব্যাটাছেলেদের তো কোন বালাই নেই, রাস্তার পাশে বসে গেলেই হল শুধু ল্যাটিনটাই পারে না ওরা। শিবনাথ অনেকবার চেয়েছে ঘরটা ছেড়ে দিতে কুড়িটা টাকা নাকি ফালতু মাসে মাসে গলে যায়। গঙ্গার জন্য পারেনি। গঙ্গার জন্য অনেক কিছু পাবে না গেজেসটা, নইলে অ্যাদ্দিনে এই সংসার দোকান সব পগারপার হয়ে যেত।

ভেজা শাড়ি পরে দ্রুত দোকানে ফিরে এল গঙ্গা। দেরী হয়ে যাচ্ছে, ঠিক ছটার সময় যাবার কথা। ফুটপাথের ওপর একটা বড় পাথরে পা রেখে সামান্য লাফিয়ে দোকানের ওপর উঠতে হয়। ঝটপট দোকানে উঠে ভিতর দিকে চলে গেল ও। তিন তিনটে শরীর কাঠের মেজেতে শুয়ে আছে। ছোট দুটো উদোম, বড়টা শুধু ইজের পরা। গঙ্গা একদম দোকানের শেষপ্রান্তে চলে এসে দ্রুত হাতে কাপড় ছাড়তে লাগল। এই রাবণের গুষ্ঠি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, কারও ওঠবার নাম নেই। বিড় বিড় করে কথাগুলো উচ্চারণ করে কোমরে সায়ার গিঁট বাঁধতে বাঁধতে ওর খেয়াল হল গতবার রথের মেলা থেকে যে চারফুট বাই দুই ফুট আয়নাটা কেনা হয়েছিল সেটার দিকে রাস্তা থেকে যে কেউ তাকালে ওর সবকিছু দেখতে পাবে। কিন্তু গঙ্গা সরল না জায়গাটা থেকে জামা কাপড় পরা শেষ না হওয়া অবধি। এই

চরিত্তির কোন লোক তার শরীরের দিকে অন্য চোখে তাকাবার সাহস রাখে না, গরম বেশী পড়লে দোকানে বসে ছোটটাকে বুকের দুধ খাওয়াতো ও, সিগরেট বিড়ি কিনতে এসে ছোকরাগুলো সেদিকে ফিরেও তাকাতো না। গঙ্গার গলার জোর জানে না এমন কেউ নেই। হরেদা তো বলে, 'মাইরি শিবুর বউ, তোমার খিস্তির স্টক থেকে আমাকে কিছু দাও' বলে, আর ওর দিকে তাকায়। হ্যাঁ এই বস্তিতে ঐ হরেদাই যা একটু প্রশ্রয় পায় গঙ্গার কাছে, হাজার হোক বউ-মরা পুরুষ তো আর বয়সও হয়েছে বেশ।

সেজেগুজে একমাথা সিঁদুর পরে গঙ্গা প্রায় লাফিয়ে মাটিতে নেমে হন হন করে হরেদার দোকান পেরিয়ে চলে এল। হরেদার দোকানে এখন রস ফুটছে টগবগ করে। পদ্মবালা এসেছে চা খেতে। দুচক্ষে দেখতে পারে না গঙ্গা। যে বাড়িতে কাজ করে সেই বুড়োবাবু রোজ পাঁচটাকা করে দেয় পদ্মকে গিন্নিকে লুকিয়ে। হাত পা নেড়ে আবার বলে, 'কি করব ভাই, বুড়ো মানুষটা বুকে মুখ রেখে এমন ছেলে-মানুষের মত কাঁদে না! ঝাঁটা মার। ঝাঁটা মার। শরীর দেখিয়ে একটা ঘাটের মড়ার কাছে টাকা নিচ্ছে, জানে ভয়ের কিছু নেই, আর তাই খলবলিয়ে বলে বেড়ায়! স্বামীটা হল এক নম্বরের ম্যাদামারা। হরেদারও পদ্ম এলে চা বানানো শেষ হয় না, ব্যাটাছেলে জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল গঙ্গার। কারো চরিত্তির বলে কিছু নেই।

এক হ্যাঁচকা টানে চাদরটা মুখ থেকে টেনে সরিয়ে আনল গঙ্গা। টানের চোটে মুণ্ডুটা নড়ে উঠলো কিন্তু চোখ খুলল না। হাতের মুঠোয় ধরা চাদরের দিকে তাকিয়ে গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। কি নোংরা আর দুর্গন্ধ, বাপের জন্মে কাচা-কাচি হবে না গঙ্গা না করে দিলে। শরীরের দিকে চেয়ে দ্যাখ, এক ইঞ্চি ময়লা চামড়া কামড়ে বসে আছে কতদিন যে শরীরে জল ঠেকায় না, যেন সেটাও গঙ্গার দায়। এখন দ্যাখ, কেমন হারামজাদা লোক, চাদর ধরে এত যে টান দিল গঙ্গা, মরা মানুষও চিতায় উঠে বসে, এনার চোখ খুলল না। হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, ইচ্ছে করে চোখ এঁটে শুয়ে আছে, ভোরবেলা গঙ্গার মুখ দেখবে না! কথা চিন্তা করতেই গলতির বাঁট থেকে পাথরটা ছিটকে বেরিয়ে এল, কটা বাজে খেয়াল আছে? দুপুর গড়িয়ে এল এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুম মারছ? রাত্রে ফুটে শোয়ার নাম করে ফের গাঁজা টেনেছ-এ-এ-এ।' প্রথমটায় বেশ চোখ বন্ধ করেছিল শিবনাথ, কিন্তু শেষেরটা শুনে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারল না। পট করে চোখ খুলে খুব আস্তে অথচ গঙ্গা যাতে শুনতে পায় এমন গলায় বলল, 'মাইরি বলছি, খাইনি।'

'খাওনি ?' খেঁকিয়ে উঠল গঙ্গা, 'চেহারা, দেখেছ নিজের? এত দাম দিয়ে আয়নাটা কিনলাম সেদিকে একবার ভুলেও তাকায় না রে। এমন একটা গেঁজেল আমার কপালে ছিল !'

না, আর শোয়া যাবে না। এমন মেয়েছেলে যে কোন মায়ের গর্ভে পয়দা হয় কে জানে। চট করে ও মদনার দিকে তাকালো। ছোঁড়া এখন গঁদের আঠায় চোখ এঁটে ঘুমুচ্ছে। বউ-এর পায়ের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ যা বলল সেটা শুধু গঙ্গাই যেন শুনতে পেল।

'নিমতলায়।' প্রায় ভেংচে বলে উঠল গঙ্গা, এখন বাপের জমিদারি থেকে গতর তুলে দোকানে ঢোক। আমি বেরুচ্ছি।' কথাটা শেষ করে হাতের চাদর শিবনাথের দিকে ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গা দপদপিয়ে চলে গেল।

চাদরটা নাকের কাছে ধরল শিবনাথ, বোধ হয় একটু গন্ধ হয়েছে। তা পুরুষ-মানুষের শরীরে থাকলে গন্ধ হবে না ? সেই সেবার ঝগড়া হয়ে যাবার পর থেকে ও গঙ্গাকে বলে দিয়েছিল ওর জামাকাপড় যেন সে না কাচে। কিন্তু চাদরটা কি জামাকাপড়ের মধ্যে পড়ে ? স্বামীভক্তি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই আর। প্রথম বাচ্চা হবার আগে শরীর ছিল, বেড়ালের মত নরম ছিল মনটাও, দ্বিতীয়টা হবার পরও শরীরটা টিঁকে ছিল, মুখটার বাপ মা চলে গেল। আর তিন নম্বর বাঁশটা আসবার পর শিবনাথের ইহকাল পরকাল ঝরঝরে। গাঁজার অড্ডার কালীদা রেস খেলে। প্রায়ই সে শিবনাথকে বলে, 'ভাই শিবু পেডিগ্রী না দেখে বিয়ে করলে এমনটা তো হবেই। ঝগড়াঝাটি মেয়েদের এক জন্মে খেলে না, পেডিগ্রীতে সেটা থাকতে হয়।' শিবনাথ মনে মনে মাকে ডাকছিল, তুমি মাইরি মা, দেখে এসে বললে আর আমি বিয়ে করলাম। ঠিক হায়, কিন্তু তোমার সাত-তাড়াতাড়ি পটল তোলার দরকার ছিল কি ? তুমি থাকতে গঙ্গাটা যীশুখ্রীষ্ট হয়ে থাকত, নট নড়ন চড়ন—পেরেক পোঁতা। তোমার সঙ্গে পারতে হলে আরো তিনটে জন্ম নিয়ে আসতে হত। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় শিবনাথের, মা জেনেশুনেই এই মেয়েটাকে ঘরে এনেছে।

সারা শরীরে আলিস্যি নিয়ে শিবনাথ দোকানের সামনে এসে পুঁটুলি পাকানো চাদরগুলো ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে রাস্তার কলে মুখ ধুতে গেল। ইদানীং আর দাড়ি কামায় না ও, মাঝে মাঝে আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করে। স্নানটান সাজগোজ এসবের ইচ্ছেটাই আর করে না। মনে মনে ভাবে সে, ছেলেমেয়ে দোকান সব গঙ্গার, তার কাজ শুধু বিড়ি বেঁধে যাওয়া। দোকানের মুখটাতে বসে কুলোটাকে কোলের ওপর রেখে পাতা কাটা আর চুলে চুলে তামাক পুরে গোটা গোটা বিড়ি

তৈরি করা। মাঝে মধ্যে সিগারেট ধরায় ও, হাতে না ছুঁয়ে সেটাকে টানতে টানতে ছোট ছোট করে। এই সারাটা দিন একভাবে বসে কাজ করে যাওয়া, শিবনাথ কারো সঙ্গে বাক্য ব্যবহার করে না। হ্যাঁ, এ পাড়ার কেউ শিবনাথের মুখে কথা শোনেনি দুটো ছেড়ে তিনটে। কালীদা বলে, তুই মাইরি একদিন ঠিকই বোবা হয়ে যাবি। গ্যালপ না করালে ঘোড়া নষ্ট হয়ে যায়। তা বিড়ির হাত কিন্তু বেশ ভাল ওর। আগে মানিকতলায় বিপিন ঘোষের দোকানে বিড়ি বাধত ও। ঠিক মত টাকা পয়সা দিত না অথচ তাই নিয়ে খুব একটা ঝগড়া করত না সে। শেষ পর্যন্ত একদিন গঙ্গা ঝাঁটা মারি অমন চাকরির মুখে বলে ওকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের দোকানেই বসিয়ে দিল। দোকানটা এত ছোট, নড়তে চড়তে অসুবিধে হয়, তাছাড়া গঙ্গার সামনে সারাদিন বসে থাকা—আসতে চায়নি সে। কিন্তু দোকানে তাকে বসিয়ে গঙ্গা গোরা-পঙ্কজকে দিয়ে ছোট্ট সাইনবোর্ড লিখিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল, শিবনাথের নেশার বিড়ি। নেশা কথাটা আছে বলেই বোধ হয় বিক্রী ভাল হয় গঙ্গার, রাত্রে শুতে যাবার আগে দ্যাখে পড়ে নেই কিছু। সংসার টংসার টাকা পয়সা সব দায়িত্ব গঙ্গার, ওর শুধু মাঝে মাঝে সিগারেট আর খিদের সময় খাওয়া চাই, ব্যাস। শিবনাথ সাতও জানে না পাঁচও জানে না।

লুঙ্গিটাকে পেটের ওপর আলতো করে বেঁধে একটু লাফিয়ে দোকানে উঠে ও দেখল গঙ্গার তিন কন্যা কেলাটি হয়ে পড়ে আছে। ওদের দেখে এক এক সময় মনটা খারাপ হয়ে যায় শিবনাথের। ঘুম ভাঙ্গলেই নিচে ফুটপাথে নামে, রাত না হওয়া অবধি ফুটেই চরে বেড়ায়। বস্তির ভিতরের অন্ধকার ঘরটায় কেউ যেতে চায় না। বড়টাকে গঙ্গা এ বছর কর্পোরেশন স্কুলে ভর্তি করেছে। প্রত্যেক সকালে গঙ্গার মুখ আর হাত চলে মেয়েটার ওপর। বৃহৎ ধড়িবাজ মেয়ে। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে শিবনাথ লক্ষ্য করেছে দোকানের ক্যাশ থেকে মেয়েটা পাঁচ দশ পয়সা সরায় মাঝে মাঝে। কিছু বলেনি কখনো, ওর কি। স্কুল ফেরত শিবনাথের সামনেই মেয়েটাকে দোকানে বসায় গঙ্গা। দোকান বলতে বাইশ বয়াম কেক-বিস্কুট-লজেন্স, এক ঝুড়ি পুঁইশাক, কুমড়োর ফালি, ঝিঙে আলু আর কাঠের আসনের ওপর সিগারেটের স্তূপ। বিড়ির বাণ্ডিল। যেন শিবনাথ দোকান সামলাতে পারে না বলেই মেয়েটাকে এসব শেখাচ্ছে গঙ্গা।

বিড়ির কুলোটা টেনে নিয়ে বাবু হয়ে বসল শিবনাথ। এখন হাত মেশিন হয়ে গিয়েছে। কাঁচি দিয়ে পাতা কাটার সময় একটাও ছোট বড় হয় না, চোখ বেঁধে বিড়ি বাঁধতে পারে। মেয়েগুলোকে একবার ডাকবে কিনা ভাবল সে, তারপরই চিন্তাটা

ত্যাগ করল। শালা ঘুম থেকে উঠলেই ঘ্যান ঘ্যান শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এক কাপ চা পেলে হতো। মুখ বাড়িয়ে দেখল হরেদার দোকানের সামনে পুরো বস্তিটাই যেন গেলাস-মগ হাতে উঠে এসেছে। বড়টাকে ওঠালে ওর ফাঁক গলে এনে দিতে পারত। দারুণ সেয়ানা মেয়ে। মা না থাকলে মুখ খারাপ করে বেশ। বাপ যে বসে আছে খেয়াল করে না, যেন শিবনাথ আর একটা বয়াম। মনে মনে মজা পায় শিবনাথ, দেখে যাওয়ার মত আরাম আর কি আছে, পৃথিবীতে যারা ঝুট ঝামেলায় জড়ায় তাদের মধ্যে সে নেই।

ঢুলতে ঢুলতে কুঁজো হয়ে বসে শিবনাথ বিড়ি বাঁধছিল এমন সময় চিৎকারটা শুনতে পেল। বাবুদা রাস্তার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে কি একটা বলতে বলতে এদিকে আসছে। বাবুদা যখন রাস্তায় হাঁটে তখন সব সময় তিন চারজন চামচে সঙ্গে রাখে। এপাড়ার সবরকম ভালমন্দের ভার বাবুদার ওপর। বয়সে ওব চেয়ে অনেক ছোট, সুন্দর চেহারার বাবুদা যখন টাই ফাই পরে অফিসে বেরোয় তখন সাহেব সাহেব দেখায়। তা এ পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা ওকে বাবুদা বলেই ডাকে। আজ অবধি ওকে মারপিট করতে দ্যাখেনি শিবনাথ কিন্তু ওর চামচেরা এক একজন গব্বর সিং। এক একটা ডায়ালগ রকে পা তুলে এমনভাবে বলে যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। চামচেগুলোর নাম রেখেছে গঙ্গা। শিবনাথ সিনেমা দ্যাখেনি অনেকদিন।

বাবুদা এসে ওর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফিলটার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে সেদিক থেকে চট করে চোখ সরিয়ে নিল শিবনাথ। কিন্তু পেছনের আয়নায় চোখ পড়তে দেখল বাবুদার মুখ খুব গম্ভীর, নখ দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুলছে। এ পাড়ার উঠতি ছোকরারা এসে প্যাকেট খুলে নিজের হাতে সিগারেট বের করে পয়সা রেখে চলে যায়। গঙ্গা থাকলেও এটা চলে তবে গঙ্গা লক্ষ্য রাখে যাতে পয়সাটা ঠিকঠাক পড়ে। তা শিবনাথের বাবার কটা পাঁজর আছে যে বাবুদা নিজে না দিলে সিগারেটের দাম চাইবে। তবে ব্যাপার সুবিধের নয়। বাবুদার মুখ গম্ভীর, আমজাদগুলো পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ শিবনাথের কাল রাত্রের ঘটনা মনে পড়ল, সেই কেলোটা নয় তো?

সিগারেট ধরিয়ে বাবুদা হাঁক দিল, কেষ্টদা!

হরেকেষ্টর চায়ের দোকানে তখন খদ্দের থিকথিক করছে কিন্তু ডাকটা সবার মাথা টপকে ঠিক আসল জায়গায় পৌঁছে গেল। অন্য কেউ হলে যা কখনোই হতো না, হরেকেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাবুদাকে দেখতে

‘পয়ে সুড়সুড় করে নিচে নেমে এল। ওকে দেখতে পেয়েই বাবুদার গলা বাজখাই হয়ে গেল, ‘কাল রাত্রে কে উড়ীছিল ?’

হরেকেষ্ট ঘাড় নাড়ল, ‘আমি জানি না, মাইরি বলছি।’

সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বাবুদা চিৎকার করল, এটা কি ভদ্রলোকের পাড়া না বেশ্যাপাড়া ? আমাদের মান ইজ্জত বলে কিছু নেই ?’

হরেকেষ্ট বলল, ‘আমি তখন দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিলাম।’

বাবুদা বলল, ‘কিন্তু আমি কোন কথা শুনব না। নেহাৎ আমার পাড়া বলে পুলিস আসে নি, এই আমার মুখ চেয়ে, বুঝলেন ? সে মাল কোথায় ?’

হরেকেষ্ট বলল, ‘কে ?’

সঙ্গে সঙ্গে বাবুদার একনম্বর গব্বর বলে উঠল, ‘গুরু, একে স্লাইট মেরামত করা দরকার, কেমন নেকু হয়ে আছে দেখছ ?’

ঘাড় নাড়ল বাবুদা, তারপর তিনচার পা পায়চারি করে গলা তুলে বলল, ‘কাল রাত্রে যা হয়েছে তার সাক্ষী কে আছে, কে দেখেছে ? এতক্ষণে আরো ভীড় জমেছে। পিল পিল করে বস্তি থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। শিবনাথের দোকানের সামনে একটু লোক কম, কারণ সেখানে স্বয়ং বাবুদা দাঁড়িয়ে।

কাউকে উত্তর দিতে না দেখে বাবুদা আবার চিৎকার করে উঠলেন, মাল খেয়ে একজন মেয়েছেলের হাত ধরে টানছে আর তোমরা সব ভেড়ুয়া তা হজম করছো— পুরো বস্তি জ্বালিয়ে দেব বলে দিলাম, একটাকেও এখানে থাকতে দেব না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবুদা বলল, ‘এই শিবুদা, তুমি কাল রাত্রে গাঁজা খেয়েছ ?’

বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে ঘাড় নাড়ল সে, না। এত লোকের সামনে আবার এসব কথা কেন ? খিঁচিয়ে উঠল বাবুদা, ‘তা তখন কি চোখের মধ্যে কল্কে ঢুকিয়ে বসেছিলে, নাইট শো ভাঙার আগে কোন শ লা ফুটে ঘুমোয় ?’

হঠাৎ কি হল শিবনাথের কুলোটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই ঝুকুকে পাওয়া যাচ্ছে না, সকাল থেকে তাহলে ওরা এখানে আসত না ? ঝুকু ছেলেটা খারাপ নয় কিন্তু বাবুদা যেরকম গরম হয়ে আছে তাতে মনে হয় ওর অর্ডার হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথাটা যদি বলে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ঝুকু বেঁচে যেতে পারে। শিবনাথকে ওইভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে বাবুদা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিড়ি বাঁধা ছাড়া অন্য কোন ভঙ্গীতে একে সে দ্যাখেনি, মুখে বাক্যি শোনেনি। নিশ্চয়ই অরিজিনাল কিছু পাওয়া যাবে।

দোকান থেকে নেমে শিবনাথ চারপাশে তাকাল। সমস্ত ভীড়টা ওর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে এখন। নিজেকে বেশ অন্যরকম মনে হচ্ছে। এতক্ষণে

খেয়াল হল ওর গায়ে গেঞ্জি অবধি নেই আর লুঙ্গির পিছনে বেশ কিছুটা ফেঁসে গেছে। আর এই প্রথম মনে হল ওর শরীরটা খুব ছোট বাবুদার পাশে খুব অসহায় লাগে।

এক নম্বর গব্বর শিবনাথের কাছে এগিয়ে এল 'কেসটা কি?' অনেকদিন পর নিজের কণ্ঠস্বর শুনল শিবনাথ, 'হরেদার দোকানের ওপাশে আমি বিছানা করে শুয়েছিলাম এমন সময় নাইটশো ভাঙল আর রিকশা লোকজন যেতে লাগল। তারপর ঝুকু এল, এসে বলল সিগারেট দাও। ও খুব মাল খেয়েছিল, টলছিল, কিন্তু আমি যখন বললাম দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন বুঝদারের মত ঘাড় নেড়ে বলল, আমার জন্যে কিছু খোলা নেই।'

এক নম্বর বলল, 'অ্যাই সর্টকার্ট কর।'

শিবনাথ, বলল, সর্টকার্ট করতে গিয়েই তো গণ্ডগোল হল। আমি বললাম, ঝুকু তুই বাড়ি যা। ঝুকু বলল, তাই যাই। বলে এদিক দিয়ে না গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে সর্টকার্ট করতে গেল। তা নেশার জন্যে পা ঠিক ছিল না, এদিক ওদিক হচ্ছিল দেহ, ঠিক সেই সময় দুটো মারোয়াড়ী বউ সিনেমা দেখে গল্প করতে করতে আসছিল। আমি দেখলাম একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজনের গায়ে এট্টুকখানি টাচ লেগে গেল ঝুকুর। সঙ্গে সঙ্গে বউ দুটো চেঁচিয়ে উঠতে ঝুকু সর্টকার্ট করে কেটে পড়ল। হাঁপিয়ে পড়েছিল শিবনাথ, বলা শেষ হওয়া মাত্র দোকানে উঠে পড়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এক নম্বর গব্বর বলল, 'শালা ফরে কথা বলছে। হাত ধরে টানা আর টাচ লাগা এক হল?' বলে শিবনাথের বুকের খাঁচায় আলতো করে ধাক্কা দিল। টাল সামলাতে পারল না শিবনাথ, ঘুরে গিয়ে ছিটকে ফুটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। পড়ার সময় চাপ লেগে লুঙ্গিটা আরো ফেটে গেল শব্দ করে। বুকে হাঁটুতে একটা ব্যথা তুবড়ির মত ছিটকে উঠল। আর সেই সময় একটা কচি গলায় কান ফাটা চিৎকার উঠল, 'বাবাকে মেরে ফেলল, ও মা বাবাকে মারছে।' শোয়া অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে দেখল শিবনাথ বড় মেয়ের মুখটা হাঁ হয়ে আছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে মায়ের গলায়। কখন ঘুম ভেঙেছে টের পায়নি শিবনাথ। দুই নম্বর গব্বর ধমকে উঠতে চুপ করে গেল মেয়েটা। খুব আস্তে যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে শিবনাথ উঠে তাকাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে মন না দিয়ে ও বাবুদার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে পাশে দাঁড়াল।

বাবুদা জনগণকে বলল, 'আজ আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম, এই বস্তির কেউ যদি মেয়েমানুষের ইজ্জত নষ্ট করে তাহলে আমি পাশে দাঁড়ব না। কাল

অথচ যাঁদের ঝুকু বেইজ্জত করেছে তারা আমাদের ওয়েল উইশার তাই ঝুকুর কপালে ভোগ হয়ে গেছে। আপনারা সবাই মনে রাখবেন আগে মা বোনের ইজ্জত তারপর অন্য কিছু। ঝুকু শালা দোষ না করলে পালাল কেন? আপনি আমি তো পালাইনি—হা হা হা।'

অনেকটা শাসিয়ে ওরা চলে গেল। শিবনাথ দেখল সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হরেদা এগিয়ে এল, 'আমি মাইরি তাজ্জব হয়ে গিয়েছি, আমাদের শিবু কথা বলছে তাও আবার ঝুকুকে সাপোর্ট করে বাবুদার সামনে। তুমি দেখালে শিবু।'

শিবনাথ মাথা নিচু করে লাফিয়ে দোকানে উঠে পড়ল। বসতে গিয়ে টের পেল, তার পাছা একদম কাঠের ওপর ঠেকছে। মাঝখানে কাপড়ের আড়ালটা নেই। ছোট-মেয়ে দুটো উঠে বসে পিটির পিটির করে তার দিকে দেখছে, বড়টা খ্যানখেনিয়ে বলল, 'তোমাকে মারল তুমি কিছু বললে না শালাদের।' সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে গেল শিবনাথের, ঐটুকুনি পুঁচকে মেয়ে মায়ের প্রশ্রয়ে কোথায় উঠেছে। গম্ভীর হয়ে ইঙ্গিত করে কাছে ডাকল ওকে শিবনাথ। বাপ কোনদিন এভাবে ডাকে না, কিছু একটা গোলমাল আঁচ করে মেয়েটা কাছে এল না, দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি বলছ?' রাগটা শিবনাথের দাঁত গলে বেরিয়ে এল, 'ফের মুখ খারাপ করলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। হারামজাদী। সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ অবাক হয়ে শুনল দুটো কচি গলা তোতাপাখির মত আওড়াচ্ছে, 'হারামজাদী, হারামজাদী।'

চিৎকারটা হঠাৎই শুরু হয়ে গেল। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে সময়টা খেয়াল ছিল না শিবনাথের কিন্তু গঙ্গার গলাটা কানে যেতেই সোজা হয়ে বসল। দ্রুত চিৎকারটা দোকানের দিকে আসছে, কি মতিচ্ছন্ন রে, আমাকে সাত তাড়াতাড়ি বিধবা করানোর মতলব রয়েছে, হারামজাদার। আবার কুঁজো হল শিবনাথ, হাত চালাতে চালাতে বুঝতে পারল বড় মেয়েটা শালা আগবাড়িয়ে মাকে রিপোর্ট করেছে। তারপরই গঙ্গার থমথমে মুখ আয়নায় দেখতে পেল সে। সরাসরি দেখার চেয়ে আয়নায় দেখা অনেক ভাল। সুন্দর দেখায়।

'তুমি ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিলে, খুব রস হয়েছে না? দুদণ্ড দোকানে নেই আর আমার পিণ্ডি চটকাবার মতলব গো। কি দরকার ছিল তোমার বলতে যাবার, সবাই চুলি পরে ছিল আর তুমি কোথাকার মাতব্বর এলে অ্যাঁ। মেরে ফেলে দিল মাটিতে, লজ্জা করল না?' প্রায় হামলে পড়ে গঙ্গা গায়ের ওপর। কোনরকমে পাশ ফিরে শিবনাথ গম্ভীর গলায় বলল, মারেনি।'

'ও বাবা এ যে দেখছি বুলি ফুটেছে গো, মারেনি—প্রেম করেছে।'

'অ্যাকটিং করছিলাম।' শিবনাথ না তাকিয়ে বলে।

'কি করছিলেন?' হা হয়ে যায় গঙ্গা।

'অ্যাকটিং।' কিভাবে ঝুকু পড়ে গিয়েছিল, সেটা দেখালাম।

'ওমা! কি মিথ্যেবাদী গো। গায়ে এক বিন্দু ক্ষ্যামতা নেই আবার মিথ্যে কথা বলে। হারামজাদা মিনসে আমার ঠিক সর্বনাশ করবে একদিন। বাপ মা কেন এই গেজেলটার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল রে।' চিৎকারটা কতক্ষণ চলত ঠিক নেই কিন্তু হরেকেষ্ট গঙ্গাকে এই সময় ডাকল, 'ও শিবুর বউ, অত রাগ করে না।'

'কি বল হরেদা আমার কপাল পুড়বে আমি দেখব বসে বসে, অ্যাঁ?'

'কিন্তু এসব কথা এত জোরে জোরে কেউ বলে? নাও, সকাল থেকে চা খাওনি, এই গেলাসটা ধর।'

গজগজ করতে লাগল গঙ্গা, 'এত করে বলেছি, কারোর সঙ্গে কথা বলবে না হাড় জ্বালিয়ে খেল। চা খেয়েছ?'

ঘাড় নাড়ল শিবনাথ। গঙ্গা বলল, 'তাতেই এত। হরেদা দুটো চা দাও।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল শিবনাথ, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে নেই। শালা কোন ব্যাটাচ্ছেলে সংসার করে।' স্তূপ করে রাখা চাদর দুটো টেনে বগলে নিয়ে শিবনাথ দোকান ছেড়ে দুপ দুপ করে নেমে এল। শ্যাম পার্কে সারাদিন এখানে ওখানে ছায়া থাকে। এক ছিলিম খেয়ে যদি শুয়ে পড়া যায় ব্যাস দিনটা কেটে যাবে।

গঙ্গা ওর চলে যাওয়া শরীরের পিছনটা দেখে খানিকক্ষণ চোখ বড় করে থেকে বলল 'বয়েই গেল।'

গাঁজার আড্ডায় পুলিশ হামলা করে তিনজনকে তুলে নিয়ে গেল। বাত্রে শ্যাম পার্ক থেকে উঠে সেখানে গিয়ে খবরটা পেল শিবনাথ। সকালে যখন খেয়ে গেল তখন এসবের আঁচ পায়নি। সারাদিন না খেয়ে এখন গাঁজা না পেয়ে শালা পেটের ভেতরটা প্রাইভেট বাস হয়ে গেছে। এই প্রচণ্ড খিদের সময় ট্যাঁকে একটা পয়সাও নেই। শিবনাথের হঠাৎ খেয়াল হল যে দোকানটা তার। গঙ্গা পরের বাড়ির মেয়ে। দোকান থেকে কয়েকটা টাকা যদি সে গিয়ে নিয়ে আসে কারোর চোদ্দ পুরুষের তাতে কিছু বলার নেই।

কাছাকাছি হতে শিবনাথ থমকে দাঁড়াল 'কোথায় গেলি রে তোরা, নিমতলায় না ক্যাওড়াতলায়?' না তাকে নয়, মেয়েগুলোকে খেতে ডাকছে গঙ্গা। সে যে সারাদিন নেই তাতে কিছু এসে যায় না। দূর থেকে মেয়ে তিনটেকে দেখতে

গেল, দোকানের ভিতর পাট হয়ে ঘুমুচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়ে গঙ্গা দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াল, তারপর বলল, 'ভাত আর পোস্ত আছে, গিলবে তো গেল।'

দোকানের তলায় গঙ্গার রান্নাঘর। সেদিকে তাকিয়ে শিবনাথ কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় হাউমাউ করে একটা কান্না শুরু হল। এখন রাত বেশ হয়েছে তবে নাইট শো ভাঙেনি। আশেপাশের দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় আলো কম। শুধু তাদের দোকানের আলোটাই চোখে পড়ে। শিবনাথ দেখল ঝুকু টলতে টলতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ওর শরীরের চাপে আর কান্নার দমকে দম বন্ধ হবার যোগাড়। সেইরকম গলায় ঝুকু বলল, 'তুমি মাইরি আমার গুরু। এই বস্তির সব শালা মাইরি হিজড়ে, কারোর হিম্মত নেই, সত্যি কথা বলার। তুমি মাইরি, শিবুদা, দেখিয়ে দিলে মরদ কাকে বলে।'

কোনরকমে শিবনাথ বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'না মাইরি, ঠিক নেই। তোমাকে প্রণাম করতে আমি লাইফ রিস্ক করে ছুটে এসেছি। শালা বাবুদা আমাকে খতম করতে চায়, আমিও শাল্যা সঙ্গে মাল রেখেছি তাই, বদলা হয়ে যাবে।' শিবনাথ দেখল ঝুকুর হাতে একটা বড় ছোরা চকচক করছে। গঙ্গা এতক্ষণ কথা বলেনি, শিবনাথ আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল গঙ্গা তাকে ইঙ্গিতে চুপ করে থাকতে বলছে। ঝুকু বলল, 'কই গুরু তোমার পা কোথায়, প্রণাম করব। মানুষের বাচ্চা তুমি, পা-টা দাও। ঝুঁকে তার পা ছুঁতে গিয়ে কাণ্ডটা হয়ে গেল। টাল রাখতে না পেরে ঝুকু উল্টে পড়তে পড়তে গঙ্গার সঙ্গে ধাক্কা খেল। গঙ্গা আঁতকে উঠে চিৎকার করতেই ঝুকু দাঁড়াতে গিয়ে একটা কিছু অবলম্বন ধরতে চেয়ে গঙ্গার শাড়ি ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠে গেল শিবনাথের। গঙ্গা কাপড় খিঁচিয়ে চেঁচাচ্ছে সমানে। দৌড়ে গিয়ে দুমদাম লাথি মারল শিবনাথ ঝুকুর পিঠে। ঝুকু কোনরকমে মুখ তুলে কে মারছে দেখতে চেষ্টা করলে ও হেঁচকা টানে ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সমস্ত শক্তি দিয়ে শিবনাথ ঝুকুর গালে একটা চড় মেরে ফিসফিস করে বলল, 'যা পালা।'

ঝুকুর এক হাতে তখনও ছোরাটা ধরা। সেদিকে একবার তাকিয়ে সে মাথা ঝাঁকিয়ে থু থু করে থুতু ফেলে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাক, প্রণামটা হয়ে গেল।' বলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল টলতে টলতে।

এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল একটা লোকও কাছে এল না। হরেদার দোকান বন্ধ কিন্তু ফুটপাত জুড়ে সবাই ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। শিনাথের শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। পেটের ভিতর ব্যথা ব্যথা লাগছিল। উত্তেজিত

হলেই এটা হয়। লুঙ্গিটা ভাঁজ করে হাঁটু থেকে কোমরে এনেছে তবু ঝুকুটা পা খুঁজে পেল না, আশ্চর্য।

দোকানের ওপর জিনিসপত্র সরিয়ে খাওয়া-দাওয়া হল। খিদের জ্বালায়, অনেকটা ভাত সাঁটিয়ে কিছুটা তৃপ্ত হল শিবনাথের। ঝুকুটাকে মারা ঠিক হয়নি। আজ অবধি কাউকে মারেনি ও, আয়নায় একটা রোগা পাঁজর বের করা খোঁচা দাড়ি আর না ধোয়া জটা চুলের একটা মানুষের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল সে।

মেয়েদের মুখে প্রায় ঠেসে খাবার পুরে গঙ্গা খাওয়াচ্ছিল। শিবনাথকে বালিশ চাদর বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'দাঁড়াও, দরকার আছে।' শিবনাথ কি করবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু গঙ্গাকে একটু অন্যরকম লাগছে এখন। ঝুকু চলে যাওয়ার পর একটি বাক্য মুখ থেকে বের হয়নি। এখন এই বলাটার মধ্যে চিৎকার নেই। আজ শালা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। খাওয়া শেষ করে গঙ্গা যখন মেঝে মুছছিল তখন শিবনাথের সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেয়ে তিনটে ঘামে জবজব করছে, গরমে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে গায়ে তবু ঘুমের কোন ব্যাঘাত নেই এদের।

নাইটশো ভাঙল। রিকশার ভিড় হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। খানিক বাদেই চারধার আবার নিঝুম হয়ে যাবে। এই ক্যাচব্যাচ না থেমে গেলে ফুটে শুয়ে ঘুম আসবে না কিছুতেই।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ হঠাৎ কনুইয়ের ওপরে হাতে কিছু একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল। ও দেখল গঙ্গা ওর হাতে একটা লাল সুতো বাঁধছে, সুতোর মাঝখানে একটা ছোট্ট কিছু বাঁধা।

'এটা কি?' খিঁচিয়ে উঠল শিবনাথ।

'মায়ের তাগা।'

'কি হবে?'

'সেই সকালবেলায় গেলাম না স্নান করে, নিয়ে এসেছি। ভীষণ জাগ্রত।' আদুরে আদুরে ভঙ্গী নিয়ে বলল গঙ্গা।

হারামজাদা, জানোয়ার, শুয়োরের বাচ্চা। গালাগালগুলো স্মরণ করে গঙ্গার মুখের দিকে তাকাল শিবনাথ। ঝুকুর ওপর হাত পা চালানোর পর থেকে মনে বেশ আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছে। একটু ওলটপালট করেছ কি আজ ছেড়ে কথা নেই বোলে-গা। গঙ্গার বাঁধা শেষ হলে ঝট করে উঠে দাঁড়াল শিবনাথ। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা বলল, 'থাক আজকে আর ফুটে শুতে হবে না।'

'কেন? মেঘ নেই আকাশে, শোব না কেন?' গঙ্গা সরে না গেলে দোকান

। থেকে, নামতে পারছে না শিবনাথ।

'মায়ের এই তাগাটা যে রাত্রে বাঁধে সে রাত্রে আলাদা শুতে নেই। আজ দিনটাও ভাল।' বেড়ালের মত ভঙ্গী গঙ্গার।

'কি পিণ্ড হবে এতে?' ঠিক বুঝতে পারছিল না শিবনাথ।

'পুত্র হবে।' গঙ্গা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, 'আমার কি এই তিনটে নিয়ে হাড়ভাজা হয়ে গেছি! তবু বাপের পিণ্ড দেবার জন্য, একটা ছেলেও থাকবে না—তাই সাত সকালে স্নান করে নিয়ে এলাম তাগাটা।'

পা দুটো হঠাৎ ভারী হয়ে গেল শিবনাথের। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে খুব ধীরে ধীরে সে উচ্চারণ করল, 'সেটাও তো জানোয়ার, হারামজাদা হবে।'

গঙ্গা বলল, 'জানিই তো।'

এই ঘর এই বাড়ী

সুদর্শন সেনশর্মা

একমনে কুকুরের লেজ সোজা করছিল ছেলেটা। এই অসম্ভব ব্যাপারটি দেখতে পরমানন্দ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আসলে হাঁপও ধরেছিল। ডান ফুসফুসের সেই 'প্যাচ'-এর দু'বছর বাদে এই এখনই একবার খোঁজ নেবার প্রয়োজন অনুভব করলেন পরমানন্দ। আর বুকের ছবি! পরমানন্দ বুকে কি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন এক্সরের কি সাধ্য তা ধরে।

মোটামুটি পরমানন্দ দুঃখী মানুষ। তার মেজাজের রাস তাই প্রদেশের বিদ্যুৎ শিল্পের মতই অনিয়ন্ত্রিত। সকাল থেকে সন্ধ্যে, জাগরণ থেকে নিদ্রা অব্দি কখনও তিনি কোলের শিশুর ন্যায় অভিমানী কখনও বাল্য উত্তীর্ণ সদ্য কিশোরের মত জেদী বা সদ্য যৌবনার মত বেহিসেবি। পরমানন্দ চাইছিলেন আজকের দিনটা একটু অন্যরকম হোক। একটু অন্যরকম। বাচ্চু দিল্লী থেকে এসেছে সম্বর্ধনা''সভায় বক্তৃতা দিতে। বিভেদপন্থীরা ওৎপেতে আছে প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না— কথাটা মনে আসতেই পরমানন্দর শত দুঃখের মধ্যেও মুখে হাসির রেখা ফুটলো।

সকালের কাগজে রাশিফল ও সভাসমিতিতে চোখ বুলিয়ে পরমানন্দ যখন ভাববাচ্যে হাঁকলেন—শুনলে, বাচ্চু আজ বক্তৃতা দেবে একবার যেতে হয়—অশ্রুকণা চায়ের কাপ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন: তোমরা ভাইরা তো বক্তৃতাটা ভালই দাও!

প্ররোচনা! পরমানন্দ ফাঁদে পা দেবেন না। আজ সকালটা বোধহয় অন্যরকম। আজকের দিনটা একটু ভাল কাটুক। ঘরের হতশ্রী দেওয়ালের প্লাস্টার চটা নোনা ধরা হাঁ-মুখ এসময়ে পরমানন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। একদিন বড় পরিপূর্ণ ছিল ঘর বাড়ী। পরমানন্দ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসেন। অশ্রুকণার কথায় খোঁচা ছিল। ফাঁদে পা দেবেন না। চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে স্ত্রীকে বল্লেন: চিনি দাওনি!

'দিয়েছি' অশ্রুকণার মুখে তির্যক রেখা ফুটলো: আসলে তোমার মুখটাই তেতো হয়ে গেছে। ছেলেরা খেল তো।

অতএব সঙ্গে সঙ্গেই পরমানন্দর মুখব্যাদন। এই যে ফাঁদে পা দেওয়া না প্ররোচনায় কথা হচ্ছিল সেকথা পরমানন্দ বেমালুম ভুলে গেলেন। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়ার মুখে মেজ ছেলে সিঁড়িতে অনেকটা দমকলের আওয়াজ করে নেমে এল:

সকালবেলাতেই সর্ট সার্কিট। বাবা তুমি যেন কি। মা এসে চা দিল কোথায় অসীম তৃপ্তিতে বলবে কতদিন এমন চা খাইনি তা না চিনি দাওনি, তো। বড্ড বেরসিক হচ্ছ দিনকে দিন।

ঝগড়াটা থেমে গেল। পুরুষ মানুষের জোর হবে মুখের ভাষায় বাক্যবিন্যাসে আর মেয়েদের জোর চোখের জলে, 'তুমি এমন কথা বলতে পারলে'—বর্ষায় আন্দোলিত লতার মত দুলে দুলে স্ত্রী কাঁদবেন, পুরুষ দেবে বক্তৃতা। পরমানন্দর বেলায় ব্যাপারটা হল কি অন্যরকম, একদম উল্টো। সব ভঙ্গি অশ্রুকণার : তোমরা ভাইরা বক্তৃতা তো ভালই দাও কিম্বা তোমার মুখটাই, তেতো হয়ে গেছে। পরমানন্দর চোখের জল, অভিমান। অবশ্য অশ্রুকণার কোন দোষ নেই। জ্যেষ্ঠ পরমানন্দ ঐক্য নামক এক ঠুনকো আদর্শের কাঁটাগাছে সারা জীবন জল ঢেলে আজ নিজেকে নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব বানিয়ে স্বভাবতই সন্তান এবং স্ত্রীর বিরাগভাজন হয়েছেন।

কাগজে আজকাল কত কি মজার খবর পড়েন পরমানন্দ। আসল খবর ছাপিয়ে চুটকি প্রধান হয়ে উঠেছে তাবড় দৈনিকগুলো। সেদিন পড়লেন সাড়ে সতেরো ঘন্টা একনাগাড়ে চুম্বনের খবরটা। এতো বিদেশ বিভূঁই এখানকার ছেলেমেয়ে-গুলোও যা নির্লজ্জ হচ্ছে দিন দিন। তার বড় ছেলের বান্ধবী বা প্রেমিকাও তো বোধহয় হাতবদল হয়ে গেল সেদিন তিনি দেখলেন …।

যা বলছিলেন কাগজের সেই খবর পড়ে ছোট ছেলে তার মাকে বল্ল—তোমার আর বাবার আর একটা রেকর্ড হয়ে যাক। অশ্রুকণা বল্লেন : মারব থাপ্পড—'আঃ শোনই না' ছোট ছেলে বলছে শুনলেন : তোমরা একটা অবিরাম ঝগড়ার রেকর্ড করে ফেল্ল। বড় ছেলে তাকে শুধরে বল্ল : বাবার রেকর্ড তো হয়েই আছে 'জীবনভর অবিরাম ভুলের বিশ্ব-রেকর্ড'। এ ঘরের নোনা ধরা দেওয়াল, জীর্ণ শিক বের হওয়া সিলিং এ সময়ে পরমানন্দকে দাঁত দেখিয়ে হাসে। ছোটভাই সুনীল-এর কথায় এ বাড়ী এসেছিলেন, কলকাতার চাকুরেরা এক জায়গায় থাকবেন বলে। পরমানন্দ এখন একা, বড় একা। অশ্রুকণার খুব বেশী দোষ নেই। পরমানন্দ বড় ছেলের কথায় অশ্রুপাত করলেন বিরলে, নেবুতলা পার্কের বেঞ্চে বসে বন্ধু যাদবকেও সে কথা বললেন। যাদব বলে : রাখুন দাদা আজ-কালকার ছেলেদের কথা। আমার একমাত্র ছেলে তার মাকে কি বলেছে শুনবেন। সে ফ্ল্যাটও খুঁজছে আলাদা হবে বলে। এখন একসঙ্গে থেকেও পরবাসী হয়ে আছি। 'আমি তোর মা, তোকে গর্ভে ধরেছি তুই আমার কথা শুনবি না, পরের কথায়……' এইসব পেটেন্ট কিছু কথা মূর্খের মত বোধহয় ওর মা বলে থাকবে।

ওই ছেলে উত্তর করেছিল : অত গর্ভে ধরার খোঁটা দিও না তো। নামিয়ে এলেই পারতে। চাও তো তোমাকে দশ মাসের ঘর ভাড়া দিয়ে দি। সেলামীও নেবে নাকি ?

যাদব প্রেম করে বিয়ে করেছিল। যাদবই বলে পঁচিশ বছরের দাম্পত্যে সেই প্রেম কবে শুকিয়ে আমড়া আঠি হয়ে গেছে।

পরমানন্দ আর যাদব নেবুতলা পার্কে বসে থাকেন ঘন হয়ে একাত্ম হয়ে। দুই প্রায় বৃদ্ধ দুঃখের কথা বলেন, অশান্তির কথা বলেন, করেন স্মৃতিচারণ আর চলতি কালকে দুয়ো দেবেন দুজনেই। ফুচকাওয়ালা আলুর খোসা ছাড়ায়। নেবুতলার গণকবি পাগলা দাশুর ব্ল্যাকবোর্ড স্টেশনে ছড়ার ট্রেন এসে দাঁড়ায়। এক বিশাল বপু ভদ্রলোক বকলেস বাঁধা নেড়ী কুত্তাকে হাগাচ্ছেন মাঝরাস্তায়, তার চোখ পাগলা দাশুর ছড়ার দিকে—এইসব মোটামুটি দৈনন্দিন ছবি পরমানন্দর চোখে ভাসছে এখন। ছেলেটা কুকুরের বাঁকা লেজ...... এরকমই সংকীর্ণতার অনৈক্যের বাঁকা পথ কি পরমানন্দ সারাজীবন বিফলতায়, সরলতার উদারতার ঐক্যের সরলরেখা পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। জীবনভোর ভুলের বিশ্ব-রেকর্ড ? হয়তো বা তাই। পরমানন্দ একটা উপমা পেয়ে গেলেন।

বুক পকেট থেকে নীল খাম উঁকি দিচ্ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই চিঠিটা একটু ঠেলে ঠিক করে রাখলেন। বাচ্চুকে একবার বলবেন ভাবছিলেন। তার নিজের তো কিছু চাওয়ার নেই। কান্তিদা, বৌদি প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে লিখেছে। বহুকাল একসঙ্গে ছিলেন পরমানন্দ। সুনীলের স্ত্রী, মানু, বেশ ভাল মেয়েটি—বলছিল দাদা, কান্তিদা যা চিঠি লেখেন চোখের জল বেরিয়ে আসবে। পরমানন্দ জানেন সুনীলই মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠায়। এই বৌদি পরমানন্দর বাবার সংঘাতিক বাধ্য ছিলেন। উপোস করছে এখন অথচ পরমানন্দর সাধ্য নেই, যতদিন ছিল কিছু কিছু পাঠিয়েছেন।

আড়াইটার থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন পরমানন্দ। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক খুব দূরে নয়। পরমানন্দ আগে যাবেন, সামনের দিকে থাকবেন। বাচ্চুকে একটু ভাল করে দেখবেন। দিল্লীতে তিনি শুনেছেন এখন বেল ফাটানো গরম চলছে। ছোটবেলায় বাচ্চুর গরম একদম সহ্য হত না।

বাচ্চুর ভাল নাম বিমলানন্দ। বিমলানন্দ নামটা নাকি তেমন যুৎসই নয়। বিমলানন্দদা তুমি এগিয়ে যাও আমরা তোমার সঙ্গে আছি নাকি জমবে না। বাচ্চু বিমলানন্দ নামটা বর্জন করেছে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে কাল লেখাও দেখেন যুবনেতা বাদলদার সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিন। বাচ্চু শ্রমিক নেতাও। আমহার্স্ট স্ট্রীটে

মিছিল। মিছিলের লেজের দিকটায় নিজেকে বেঁধে নিলেন। যাদবকে পেলেন না; পরমানন্দ আসবে বলেছিল। পরমানন্দ কি খুব বাড়াবাড়ি করছেন। অশ্রুকণার চোখ মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল। বাদুর সঙ্গে বহুদিনের যোগাযোগ নেই। ওই রাখেনি। বাদুরা এখন বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। পিছন ফেরার সময় কোথায়। বাদুর কাছে পরমানন্দ বহুবার অপমানিত হয়ে পৈতৃক ভিটেও প্রায় ছেড়েছেন। সোদপুর প্রায় দু'বছর যান না। বাড়ীটা ভাঙা হচ্ছে শুনেছিলেন, বাদুর জমকালো মহল্লায় পরমানন্দ বুঝে গেছেন স্থান নেই। আগল তৈরী হয়েছে চারধারে। বিষণ্ণ পরমানন্দ বড় একা। অশ্রুকণা বলেন, মানুষটা চিরকাল একরকম রয়ে গেল জীবনটা যেখানে শুরু করেছিলেন আজও কি সেখানেই পড়ে আছেন। পরমানন্দকে ছেড়ে সবাই তো যে যার পছন্দমত জায়গায় চলে গেছে।

মিছিলটা বলছিল বাদলদা যুগ যুগ জীয়ো। পরমানন্দও একবার বাদলদা দিচ্ছে ডাক বলে ফেলে জিভ কাটলেন। জনগণের বাদল দাদা হলেও তার তো আর দাদা নয়। বাদলকে ছোটবেলায় কোলেও নিয়েছেন। দীর্ঘশ্বাসটা ঢাকলে, গর্ববোধটা মাথাচাড়া দিচ্ছে কি। বাদু তার সহোদর আজ বক্তৃতা দেবে। বাদুই তো সাঁকোর থেকে জলে পড়ে গেল। একবার পরমানন্দর কান্না শুনে নবীন ধোপা জলে ঝাঁপিয়ে বাদুকে তুলেছিল। এখন সেই বাদু সকালে কলকাতায় একরকম বলে, দিল্লী গিয়ে বিকেলেই কথা ঘুরিয়ে নেয়—দুটো বিবৃতিই একদিনের কাগজে ছাপা হয়।

(বন্ধুগণ!) বাদল বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। পরমানন্দ ঘন হয়ে বসলেন। আরও দু'একবার তিনি বাদুর বক্তৃতা শুনেছেন। ভালই বলে বাদু। ছোটবেলা থেকেই।

'আপনাদের দায়িত্ব শিরোধার্য করে নিয়েছি। আপনারা যে সম্মান আমাকে প্রদর্শন করছেন তাতে আমি অভিভূত। আমি দিল্লীতে আপনাদের কারণেই গেছি। আপনারাই পাঠিয়েছেন। আজ সবাইকে পেয়ে আমি ধন্য'। হাততালি। ব্রেভো বাদু। তুই বেশ খেয়ালী। কখন কি বলতে হয়, কি করতে হয় তুই ভাল জানিস।

'আপনারা আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান শুনেছি, বেশ আমি আমার জীবন সম্পর্কে কিছু বলছি।'

'বন্ধুগণ আমার জীবনের ইতিহাস কঠিন সংগ্রামের, আত্মত্যাগের ইতিহাস' পরমানন্দ হাসলেন তাও যদি আমি না থাকতাম মিটিংএ। 'আমি জীবনভর স্বনির্ভর এবং আত্মকেন্দ্রিক উদ্যম আত্মসচেতন, পরমানন্দর চোখের সামনে অন্য একটা ছবি ভাসছিল, সোদপুরের বাসায় বাদু তাকে বলছে—এ বাড়ীতে তোমার

আর থাকা চলবে না। বাড়ীটা বাবা তোকে লিখে দিয়েগেছেন? যাহ্ বাচ্চুর মুখ ফস্কে সত্যি কথা বেরিয়ে গেল।

'অনেক বাধা ছিল জীবনে, অপদার্থ সাহাদরকুলে বড় হয়ে ওঠা বড় কষ্টের...'

পরমানন্দ চরম ক্ষোভে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বাচ্চুর উচ্চশিক্ষার পেছনে জীবনপাত করেছেন। বাচ্চুর ফাইনাল পরীক্ষার সময় অঞ্জকণা গয়না বাঁধা দিয়েছিলেন।

বাচ্চু বলে চলেছে, 'আমার পিতৃদেবও মোটামুটি মিসগাইডেড ছিলেন। ছেলেদের কোন দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি। গ্রামের পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার হয়ে পোস্ট কার্ডের পেছনেকালো ছাপ দিতে দিতে নিজের অমূল্য জীবনটা খরচা কবেছেন আমার সাফল্য স্ব-প্রণোদিত নিজের অধ্যবসায়, পরিশ্রম, মেধার বৃত্তিতে আপনাদের আশীর্বাদে...'

পরমানন্দ অপমানে টলছিলেন। ভাবছিলেন ফিরে যাবেন। কান্তিদার চিঠির কথাটা মনে পড়ল। সেই জেঠতুতো দাদা বৌদি উপোস করছে। বাচ্চু যদি দুটো টাকা পাঠায়। বাচ্চু বলছে আমি যখন কাউকে সাহায্য করি কখনোই দানের মনোভাবে নয় আমি জানি সমাজের প্রতি আমার ও দায়িত্ব আছে সমাজের কাছে আমি তো ঋণী ·

বক্তৃতার পরে বাচ্চু পাশেই একটা বাড়ীতে গিয়ে একটা ছোট দল নিয়ে উঠলো। পরমানন্দ সেখানে এসে দাঁড়াতেই কালো শিরিঙে একটা ছেলে বল্ল দাদু আপনার কি চাই। পরমানন্দ বাচ্চুর সঙ্গে দেখা করতে চান বলতেই আরও দুটি ছেলে বল্ল এখন ওসব হবে না। উনি আমার খুব নিকট আত্মীয়। নেতা দেখলেই আপনাদের আত্মীয়তা বেড়িয়ে পড়ে না? এই তপা এই গুড্যা কি বলছে শোন।

অবাঙালী এক ছোকরা বলে উঠেছিল ও লোক তো ভিখ্ মাংতা। অপমানে জ্বলছিলেন পরমানন্দ। একটি ছেলে বেরিয়ে এসে বল্ল উনি এখন খুব ব্যস্ত। কাল দেখা করবেন।

পরমানন্দর চোখের সামনেই, বাচ্চু, ভ্রুক্ষেপহীন বাচ্চু—সেই দলটা নিয়েই একটা গাড়ীর সামনে দাঁড়াল। একবার চেঁচিয়ে ডাকবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু গলার সে জোরটিও হারিয়ে ফেল্লেন নাকি?

বছরাতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে ওঠেন পরমানন্দ।

চোর এসে পরমানন্দর ধুতি পাঞ্জাবী খুলে নিচ্ছিল। চোর শেষে বল্ল আণ্ডার ওয়্যারটাও দিয়ে দে, ওটা ছাড়াই তোকে ভাল মানাবে। ঘুম ভেঙে পরমানন্দ, বিহ্বল পরমানন্দ কঁকিয়ে উঠলেন: চোর চোর চো·· ও-ও···

অশ্রুকণা ধড়মড় করে উঠে বসে মুখ করেন রাতে চেঁচাচ্ছ কেন ? কোথায় চোর ! বোবায় ধরেছে ; জল খাও। আশ্চর্য হয়েছ সত্যি।

লজ্জায় অপমানে অনড় পরমানন্দ, নিরন্তর দহনে দগ্ধ বিহ্বল পরমানন্দ উঠে বসলেন। সারারাত আর ঘুমুতে পারলেন না। অশ্রুকণার দুই ছেলেও উঠে এসে বাবাকে দেখে হেসে ফের আবার শুতে চলে গেল।

এখন সকাল। দশটা বাজে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ীটা সামনের রাস্তায় ভোঁ বাজিয়ে একটু আগে চলে গেছে। অশ্রুকণা একটু আগে ধুন্ধুমার ঝগড়া করেছেন পরমানন্দর সঙ্গে। মাছ মুখে করে বেড়াল পালাচ্ছিল, রাগে বেড়ালকে লাথাতে গিয়ে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দেওয়ালে থেতো করেছেন অশ্রুকণা। বাবা মায়ের ঝগড়ার মাঝে মেজ এসে আগল তুলল। বলল মা তুমি বাবাকে ডিভোর্স করে দাও। পরমানন্দ ধুতি পাঞ্জাবী গলিয়ে বাইরে বেরুচ্ছেন। স্বামীর সংগে দুর্দান্ত ঝগড়া শেষে অশ্রুকণা রেডিয়ো খুলে তুলসীদাসের ভজন শুনছেন এখন। বড় ছেলে এই তৃতীয়বার আবার বাংলায় এম. এ.-র জন্য চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ামুখস্থ করছে।

নেবুতলা পার্কে যাদব বসেছিল। পরমানন্দকে দেখে যাদব লাফিয়ে উঠল, দাদা আপনি অসময়ে, অনেক দিন বাঁচবেন, আপনার কথা-ই ভাবছিলাম।

'তোমার আশীর্বাদে পেচ্ছাপ করি।' সকাল বেলায় দাদা মুখ খারাপ করছেন। আমার একদম বাঁচার ইচ্ছে নেই, পরমানন্দ বললেন। তাই বলে দাদা মুখ খারাপ। বৌদির সংগে ঝগড়া করেছেন। নতুন কি হ'ল ? আমিও করেছি এই সকালে। আপনার কি চিন্তা দিল্লীতে নিজের লোক রয়েছে···যাদব হাসল। কি যে বল যাদব, বাচ্চু কত বড় হয়েছে বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে এখন লড়াই করবে না কি তোমার আমার সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহৎ কর্ম জলাঞ্জলি দেবে। ও কথা মুখে এন না। যাদব বিস্মিতভাবে পরমানন্দকে দেখছিল। বলল আপনার কি হয়েছে ? পার্কের বেঞ্চ তো আছে। এই ঘর এই বাড়ী। যাদব দু'হাতে টেনে নিয়ে পরমানন্দকে পাশে বসালে।

সামনে নেবুতলা পার্কের খোলা মাঠ। এই সকালে কারা বল খেলছে। অফিস যাত্রীরা পার্কের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ধরা হাঁটা হাঁটছে। মুচিপাড়া থানায় জীপ দাঁড়ানোর শব্দ। পরমানন্দর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল যাদবের গায়ে পড়তে যাদব আকাশের দিকে তাকায়। সামনের ছেলেটা কুকুরের লেজ সোজা করছে। সেইদিকে তাকিয়ে পরমানন্দ বল্লেন কাল বাসে হাতল থেকে হাত ফস্কে একটা ছেলের পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বাসে ভীড় ছিল সাংঘাতিক। এক মহিলা তার গায়ে একটু ছোঁয়া লাগায় কাকে ধমকাচ্ছিলও। ছেলেটা কি বল্ল জান যাদব আমাকে, বাচ্চা ছেলে গোফের রেখাও ভাল করে ওঠেনি : লাশ চিরে ফেলব !

যাদব ম্লান হেসে বল্ল : কেন সে ব্যাটা ডোম নাকি।

চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা

স্বাস্থ্যবান বাঁধা কপি, সবুজ মটর শুঁটি ও অবিকল টোমাটো রঙের টোমাটোর পাশে বসে থাকে একটি পাংশু মুখ। থুতনিতে রুখু দাড়ি, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, হাতের আঙুলগুলো ভূতের আঙুলের মতন লম্বা। কী তার নাম কে জানে। নারকোল বিক্রি করে স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকেরা। এ পর্যন্ত সুপ্রকাশ বাড়ি বদলের কারণে তিন চারটি বাজার বেশ ভালোই চেনে, সব বাজারেই দেখেছে, মেয়েরাই বিক্রি করে নারকোল, পুরুষরা নয়। এর কোনো আল দা কারণ আছে কি?

সুপ্রকাশ বাজার করতে যায় দুটি পলিথিনের ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে। একটিতে মাছ, অন্যটিতে তরকারি। একবার বাজার প্রায় শেষ করার মুহূর্তে, তরকারির ব্যাগে জায়গা ছিল না বলে নারকোল কিনে মাছের ওপরেই রাখতে গিয়েছিল। তাতে নারকোল-স্ত্রীলোকটি হা হা করে হাঁটু মুড়ে এগিয়ে বলেছিল, না, না, না, ওতে রাখবেন না, অমন রাখতে নেই, বরং হাতে করে নিয়ে যান।

বাজার থেকে আনবার পর সব জিনিসই ধুয়ে নিতে হয়। মাছের ওপর আস্তো নারকোল রাখায় কী দোষ, তা সুপ্রকাশ আজও জানে না।

তিনজন কাঁকড়াওয়ালার মধ্যে একজন সব সময় গুনগুনিয়ে গান করে। শুধু একজন লোকই বিক্রি করে পমফ্রেট মাছ, তার মুখখানি হামফ্রে বোগার্টের মতন। এ রকম মুখ আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। একজন কইমাগুরওয়ালা একদিন তিনটাকা বারো আনা ফেরৎ দেবার বদলে সুপ্রকাশকে দিয়েছিল তের টাকা বারো আনা, খানিকবাদে সুপ্রকাশ তা বুঝতে পারে। ঘুরে এসে দশটাকা ফেরৎ দেবার পর লোকটি এমনভাবে তাকিয়েছিল, যেন সে চোখের সামনে তার বাল্যকালে হারানো মাকে দেখতে পেয়েছে। তখন সুপ্রকাশের মনে হয়েছিল, তা হলে তো এ লোকগুলো খুব বেশী লাভ করে না। দশটাকার জন্য এত? তারপর থেকে সুপ্রকাশ লোকটির কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্য দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেও এই লোকটি তাকে জোর করে ডেকে আনে। একদিন সুপ্রকাশ তার কাছে মাগুর মাছ কিনতে চাইলে লোকটি বলেছিল, আজ অন্য লোকের থেকে অন্য মাছ নিয়ে যান বাবু, এই শীতের শেষটায় কই-মাগুর খাওয়া ভালো নয়। বাড়িতে সুপ্রকাশ শ্রীমতীকে বলে, জানো, গুড পিপল আলওয়েজ অ্যাট্রাক্ট গুড পিপল। তোমরা

জানবো, বাজারের সবাই ঠকাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে। আমায় কেউ ঠকায় না। আমি জিনিসপত্র বাছিনা, মানুষ বাছি।

মাত্র দু'তিন বছর হলো সুপ্রকাশ হঠাৎ একজন ছোকরা থেকে মধ্যবয়স্ক বাবা-কাকা শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে গেছে। এক ইংরেজ কবি লিখেছে, 'মাই সান্ মাই এক্সিকিউশনার' লাইনটা প্রায়ই আওড়ায়। ছেলে মেয়েরাই পিতার আসল জল্লাদ। সুপ্রকাশের মেয়ের বয়স উনিশ, এর মধ্যেই তার দুটি ব্যর্থ প্রেম এবং একটি নিষিদ্ধ প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ছেলের বয়েস সতেরো, উচ্চতায় সে সুপ্রকাশকে প্রায় ছাড়িয়ে যায় আর কি। তা বলে যে সুপ্রকাশ সত্যিকারের বাবা কাকাদের মতন লুঙ্গি পরে বাজারে যেতে শুরু করেছে তা নয়, প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট ছাড়া সে বাড়ি থেকে বেরোয় না, তার স্বাস্থ্যটি এখনো যুবকের মতন, পথে ঘাটে অচেনা মেয়েরা তার দিকে দু'বার তাকায়। তবু সুপ্রকাশ মাঝে মাঝে বলে ফেলে, আমাদের সময়ে⋯।

ছেলে বাজার করা একদম পছন্দ করে না। তাকে জোর করে বাজারে পাঠিয়েও লাভ নেই, সে বক ফুল চেনে না, আড় মাছ আর চিতল মাছের তফাৎ বোঝে না, থোড় কাকে বলে তা সে জানেই না, জানতে চায়ও না। বাড়ির কাজের লোকটিকে পাঠিয়ে বড় জোর আলু-পেঁয়াজ আর মুর্গী আনা যায়, কিন্তু প্রতিদিনের খাবারের জিনিস যদি নিজের পছন্দ মত না হয়, তা হলে তো রোজ হোটেলে খেলেই হয়, এই সুপ্রকাশের অভিমত।

তা ছাড়া, নিজে পছন্দ মতন কোনো মাছ বা তরিতরকারি কিনলে, সেগুলির সঙ্গে খানিকটা ইচ্ছাশক্তি মিশে যায়, তার ফলে সেই সব জিনিসের রান্না হজমও হয় খুব সহজে, রিডার্স ডাইজেস্ট বা ঐ ধরনের পত্রিকায় এইসব চুটকি জ্ঞানের কথা থাকে, সুপ্রকাশ জেনেছে। বাজার করতে সুপ্রকাশের খারাপ লাগে না। এটাকে সুপ্রকাশ সোসাল সায়েন্স হিসাবেও নিয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর চলতি বাজার দর না জানলে দেশটাকেও চেনা যায় না। খবরের কাগজ পড়ে এসব জানলেও তেমন লাভ নেই, দশটাকার সর্ষের তেল আঠারো টাকা কেজিতে কেনবার সময় পকেট থেকে টাকা বার করতে কেমন লাগে, সেটাই আসল অনুভূতি। পলিটিশিয়ানদের বাস্তবজ্ঞান⋯, সুপ্রকাশের এটা প্রিয় আলোচ্য বিষয়।

একদিনে চার পাঁচ দিনের বাজার সেরে নেয় সুপ্রকাশ। কোন রকমের তাড়া-হুড়োতে বাজার করাও তার পছন্দ নয়। সারা বাজারটা এক চক্কর ঘোরে, পরিবেশটা বুঝে নেয়। প্রত্যেক দিনের পরিবেশ এক নয়। আজ যে মাছ ওয়ালাটি অচেল মাছকে বড় বড় পার্শে নিয়ে বসে থাকে, পরের দিন এসে দেখা যাবে, তার সামনে

পড়ে আছে কয়েকটি মাত্র করুণ রংচুলা বেলেমাছ। আজকের ফুলকপিওয়ালা পরের দিনের কুমড়োওয়ালা।

সারা বাজার ঘুরলেও নির্দিষ্ট কয়েকজনের কাছ থেকেই প্রধানত জিনিসপত্র কেনে সুপ্রকাশ। মুখ বা ব্যবহারের বিশেষত্ব দেখে সে এদের পছন্দ করেছে। নাম না জানলেও এদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার বেশ চেনা। অফিসের কাজে বাইরে কোথাও যেতে হলে, ফেরার পর বাজারের এই সব পুরুষ নারীরা তাকে জিজ্ঞেস করে, অনেকদিন আসেন নি' বাবু, কলকেতায় ছিলেন না বুঝি ? এই আত্মীয়তাটুকু সুপ্রকাশের ভালো লাগে।

যে তরকারিওয়ালাটির হাতের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা, তাকে দেখে সুপ্রকাশের মনে হয়েছিল, এই লোকটি সেতার বাজানো শিখলে জীবনে উন্নতি করতে পারতো। এর রুক্ষ দাড়িওয়ালা বিষণ্ণ মুখটির ছবি খবরের কাগজে ছাপিয়ে তলায় যদি লিখে দেওয়া যায়, বিখ্যাত সেতারী ওস্তাদ বন্দে আলী খান, কেউ অবিশ্বাস করবে না। সেইজন্যই, সুপ্রকাশ এই তরকারিওয়ালার নাম দিয়েছে সেতারী। প্রত্যেক নারী-পুরুষ বিক্রেতার নামই সে আলাদা করে রেখেছে মনে মনে। কখনো প্রকাশ্যে এই-সব নামে ডাকবার প্রশ্নই ওঠে না অবশ্য। এসবই সুপ্রকাশের মনুষ্যচরিত্র পর্যবেক্ষণ নামে একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটি।

দু' তিন রকম সব্জী-তরকারি কেনার পর সুপ্রকাশ একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছে। আগে মাছ কিনলে টাকা ভাঙানো যেত, কিন্তু এর দুটি মাত্র বাঁধা কপিই আজকের বাজারের সবচেয়ে টাটকা মনে হওয়ায় সুপ্রকাশ আগে নিয়ে নিতে চায়।

সুপ্রকাশ অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, লোকটি বাকি টাকা পয়সা দিতে দেরি করছে দেখে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো ?

বাবু, একটা কথা বলবো ?

সেতারীর রুক্ষ দাড়িওয়ালা মুখটিতে আজ যেন কেমন অন্য রকমের হাসি ॥ বালকের মতন আদুরে।

—কত হয়েছে ?

কোনো দিন দরাদরি করে না সুপ্রকাশ। এটাও তার একটা কায়দা। মোটা-মুটি বাজার দর তার জানা। দোকানীর চোখে চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করে, ঠিক বলছো তো ? নিজের হাতে সে কোনো দিন বাঁধা কপির দৃঢ়ত্ব কিংবা পটলের পাকামি টিপে দেখে নি, সে বলে, তুমি নিজের হাতে বেছে দাও। সে দেখেছে, একথা শুনলে দোকানীরা খুশী হয়, কখনো নিজের হাতে খারাপটা দেয় না।

—বাবু একটা কথা বলবো ?

—কী ব্যাপার ?

—আপনার টাকাটা আজ জমা রাখবেন ?

দু'তিনদিন পরেই শোধ করে দেবো।

সুপ্রকাশ আরো কিছু শোনার জন্য তাকিয়ে রইলো। এরকম অভিজ্ঞতা তার নতুন।

—মহাজনের টাকাটা গচ্চা গেছে কাল, সকাল থেকে বসে বসে ভাবছি, কিছু টাকা জোগাড় করতে না পারলে·· কাল থেকে আর···।

ঘরেরও কিছু খরচাপাতি আছে···

—মহাজন ?

সুপ্রকাশের ধারণা ছিল না যে এইসব আনাজ-তরকারিওয়ালাও কোনো এক অদৃশ্য মহাজনের ওপর নির্ভরশীল। মহাজনের টাকায় মালপত্র কিনে আবার সুদ সমেত ফেরৎ দেবার পর যা বাঁচে, সেটাই ওদের একদিনের রোজগার।

শৌখিন সমাজ বিজ্ঞানী সুপ্রকাশ আগ্রহের সঙ্গে ব্যাপারটা শোনে।

লোকটি খুব একটা করুণ গল্প ফাঁদে না। প্রায় হাসতে হাসতেই জানায় যে গতকাল ট্রেনে তার পঞ্চাশটি টাকা গচ্চা গেছে। নিশ্চয়ই তার চেয়েও গরিব কোনো শালা জোচ্চোর পকেটমারি করেছে টাকাটা। এদিকে যে আমার ঘরে—শালার ইয়ে, মানে পোয়াতী বৌ···।

—বাবু, সকাল থেকে বসে বসে ভাবছি, আর কারুর কাছে চাইতে ভরসা হয়নি · এই আপনাকেই প্রথম বলে ফেললুম, যদি রাগ করেন তো··।

বাজারের এত লোকের মধ্যে শুধু সুপ্রকাশকেই ধার চাইবার জন্য নির্বাচন করেছে লোকটি, এটা একটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার নিশ্চিত। এইজন্য, এবং লোকটির মুখের হাসি দেখে সুপ্রকাশ উদার হয়ে গেল।

—তোমাকে সব টাকা দিলে আমি বাজার করবো কী করে ?

—আপনি ইচ্ছে করলে পারেন, আপনাকে কে না ধার দেবে।

আসলে সুপ্রকাশের কাছে আর একটি পঞ্চাশ টাকার নোট আছে এবং আজ সকালে তার মেজাজ বেশ ভালো আছে।

—আপনার চুয়াল্লিশ টাক বারো আনা রইলো, বাবু এরপর যে দিন আসবেন···।

বাড়ি ফেরার পথে একটা বেশ হাল্কা মতন গর্ব সুখ খেলা করে সুপ্রকাশের বুকের মধ্যে। সে কি অন্যদের তুলনায় একটু বেশী মহৎ নয় ? লোকটি হয়তো

আরো অনেকের কাছে ধার চেয়েও পায়নি, কিংবা শুধু যে তার কাছেই চেয়েছে… ।

অন্তত একজনের কাছে আত্মশ্লাঘা করতে না পারলে পুরো ব্যাপারটার কোনো মানেই থাকে না।

—তুমি দিয়ে দিলে? পঞ্চাশ টাকা এক কথায়?

—তার মধ্যে এই এক জোড়া বাঁধা কপির দাম পাঁচ টাকা চার আনা বাদ। কেমন, ভালো নয় বাঁধা কপি? শীত শেষ হয়ে এসেছে, তবু এরকম স্বাদ ··

—তুমি যে বলো, তুমি মানুষ চেনো। আসলে, তোমাকেই ওরা চিনে ফেলেছে।

—ঠিক তাই।

—ওরা চিনে ফেলেছে, কাকে ঠকানো যায়।

—হা-হা-হা! শ্রীমতী, তুমি কিছুই জানো না। জানো, আজকাল ফুটপাথের হকারদেরও ব্যাঙ্ক টাকা লোন দেয়? লোকটা বাজারে রোজ বসে, পালিয়ে তো যাবে না!

—নিপুদা যে সেই তিনশো টাকা নিয়ে গেল, তখনও তুমি বলেছিলে… ।

মেয়েরা পুরনো প্রসঙ্গ টেনে আনতে ভালোবাসে। 'এক সপ্তাহ বাদে দিয়ে যাচ্ছি' বলে নিপুদা তিনশো টাকা সুপ্রকাশের কাছ থেকে নিয়ে ব স্ত সমস্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর দেড় মাস আর এলেন না। পরে যখন দেখা হলো, নিপুদা একবারও তুললেন না টাকাটার কথা। ওঁর মনে নেই। গত ছ'মাসের জন্য নিপুদা চার পাঁচবার এসেছেন, সাবলীল হাসি-ঠাট্টা ও গল্প করে গেছেন, সুপ্রকাশ ও শ্রীমতী পরস্পর চোখাচোখি করেছে কয়েকবার।

নিপুদা এমনিতে এত ভালো লোক, অথচ সুপ্রকাশ আর শ্রীমতীর মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা কাঁটা। নিপুদা ভুলে গেছেন, এমন আর অস্বাভাবিক কী ব্যাপার। যে দিয়েছে, তার পক্ষে এ রকম মনে করে রাখা কি একটা নীচতার লক্ষণ নয়?

একদিন সুপ্রকাশ মনস্থির করে বলেছিল, শোনো, শ্রীমতী, মনে করো, টাকাটা আমার হারিয়ে গেছে। কলকাতা শহরে পথে ঘাটে এমন তো যায়, যায় না? হারিয়ে গেলে আর কী করতে পারতে? সুতরাং ভুলে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। তবু ছেলেমেয়ের পোশাক কেনার বাজেট থেকে সুপ্রকাশ কখনো একটু কমাতে চাইলেই শ্রীমতী বলে ওঠে, তুমি তো যাকে তাকে তিনশো টাকা দানছত্র করতে পারো, আর আমার…। শ্রীমতী আর তার মেয়ে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে গেলে অনেকেই দু' বোন বলে ভুল করে। মেয়েদের জীবনে কোনো একটা সময়ে যৌবনকে আটকে রাখাই একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে, তার জন্য কিছু বেশী টাকা খরচ হয়।

পুরুষরা প্রায় নিঃশব্দে প্রৌঢ় হয়ে যায়। সুপ্রকাশ প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলে, খবরদার, কক্ষনো টাকার চিন্তা করবে না, তাহলে কপালে ভাঁজ পড়বে। ওটা আমাকেই একমাত্র ভাবতে দাও। পাঁচদিন পর বাজারে গিয়ে সুপ্রকাশের মনে হলো, বাজারের দৃশ্যে কী যেন একটা গরমিল আছে, কোথায় যেন একটু রঙের তফাৎ আছে। সেতারী অর্থাৎ সেই লম্বা-আঙুলে তরকারিওয়ালা নেই।

সুপ্রকাশের অবস্থা তত সচ্ছল নয়, যাতে সে চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনাকে অতি তুচ্ছ, ধুলো জ্ঞান করতে পারে। আবার তত অসচ্ছলও নয় যাতে ঐ টাকাটার জন্য তার দারুণ টানাটানি পড়ে যাবে। মাসের শেষে বাজারে এসে তাকে একটু হাত গোটাতে হয়, ইলিশ বা পোনার দিকে সে ঘেঁষে না।

সেতারীর পাশেই বসে আলু পেঁয়াজওয়ালা, সুপ্রকাশের মনে তার নাম বিদ্যাসাগর। লোকটির কপাল মাথার মাঝখান পর্যন্ত এবং বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, সম্ভবত বাঙাল বলেই। এত বড় চওড়া কপাল নিয়েও লোকটি জীবনে বেশি দূর যেতে পারে নি।

বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করবে? একটু ইতস্তত করে সুপ্রকাশ অন্যদিকে চলে যায়। এরকম ভাবে খোঁজ খবর করা তার পক্ষে মানায় না। হামফ্রে বোগার্টের চোখে চোখ রেখে সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, টাটকা?

সে বললো, আমি পচা মাছ ছাড়া বেচি না। আমার কাছ থেকে কিনতে হলে পচা পমফ্রেট পাবেন, ওজনে কম নিতে হবে, আর যদি বড় টাকা ভাঙান, তা হলে ময়লা নোট দেবো। এবার বুঝে নিন।

—আচ্ছা, তোমরা কি রোজ আসো?

—কেন?

—প্রত্যেক দোকানদার রোজ বাজারে বসে? আমি তো রোজ আসি না, তাই জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের ছুটি নেই?

—আমি ঘুমের মধ্যেও মাছ বেচি।

এর কাছ থেকে সোজা উত্তর আশা করা যায় না। এর ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশের সঙ্গে টক্কর দেয়। যে-গেট দিয়ে ঢোকে, সেই গেট দিয়েই রোজ বেরোয় সুপ্রকাশ। আজ ব্যতিক্রম হলো, কারণ শ্রীমতী জল-জিরার প্যাকেট নিয়ে যেতে বলেছে। সুপ্রকাশ সেদিকে যেতেই দেখলো, কেউ একজন সামনের বাঁক দিয়ে সাঁ করে ছুটে মিলিয়ে গেল। ঠেঙো ধুতি, ছেঁড়া ফতুয়া, কোমরে সবুজ গামছা বাঁধা। যে-কোনো ব্যাপারীরই এরকম চেহারা হতে পারে, কিন্তু মুখটা না দেখতে পেলেও সুপ্রকাশ জানে, ও সেই সেতারী।

একটা কঠিন জিনিস আটকে গেল সুপ্রকাশের গলায়। রাগ আর দুঃখ এক সঙ্গে মিশে গেলে তার এরকম হয়।

সেতারী তাকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল কেন? ও তার দোকান নিয়ে বাজারের অন্য কোথাও বসেছে? সুপ্রকাশের জন্য?

সুপ্রকাশের রাগ ও দুঃখ হলো এই জন্য নয় যে, লোকটি তাকে ঠকাতে চাইছে। লোকটি কেন ভাবলো যে, সুপ্রকাশ কেন ঠকতে রাজি নয়? একজন মানুষকে বিশ্বাস করে সপ্রকাশ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা গচ্চা দিতে রাজি আছে। তবু সে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবে না।

এরা কি ভাবে সুপ্রকাশের মতন লোকেরা লেখা পড়া শেখে ঘাস-মাটি খেয়ে। শিক্ষিত লোকদের বুদ্ধি অনেক বেশী হয়, সুপ্রকাশ ইচ্ছে করলেই লোকটিকে এক্ষুনি ধরে ফেলতে পারে. এমন কি এই বাজার থেকে ওর দোকান পাট একদম তুলে দিতে পারে। দু'বার গরম নিশ্বাস ফেলে এই কথা ভেবেও সুপ্রকাশ কিছুই করলো না, বাড়ির পথ ধরলো।

শ্রীমতীকে এই ঘটনাটা জানানো চলবে না। তা হলেই শ্রীমতী আবার নিপুদার প্রসঙ্গ তুলবে। এখানে হারিয়ে যাবার ব্যাখ্যাটা ঠিক মনকে মানানো যায় না। নিপুদার কাছে কোনো দিন মুখ ফুটে চাইতে পারলেই উনি নিশ্চয়ই ঝকঝকে তিনশো টাকা ফেরৎ দেবেন, তার সঙ্গে উপহার দেবেন একটি অদ্ভুত, বিস্মিত দৃষ্টি।

এই লোকটা ধার না চেয়ে একেবারে দানের জন্য অনুরোধ করলে কি সুপ্রকাশ দিত? সুপ্রকাশ আত্ম-সমালোচনা করতে সব সময়ই প্রস্তুত। পাঁচ-দশ টাকা পর্যন্ত সাধারণ সাহায্য, বন্যাত্রাণে পঁচিশ, একবার মাদার টেরেজার নামে এক শো, সেটা অবশ্য অফিসের অন্য সকলের সঙ্গে।

চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা…লোকটি চায়নি পর্যন্ত, খুচরো ফেরৎ না দিয়ে… যেন জবরদস্তি। অথচ রুগ্ন দাড়িওয়ালা সেতারীকে বেশ পছন্দই করতো সুপ্রকাশ।

—তুমি আজ টকের আম আনোনি?

—অ্যাঁ?

—আজ নিমপাতা কিংবা উচ্ছেও আনোনি। এরকম ভুল তো তোমার হয় না।

মুখ তুলে শ্রীমতীকে পরস্ত্রীর মতন সুন্দর মনে হলো সুপ্রকাশের। সে যেন অন্য বাড়িতে অতিথি।

পরমুহূর্তে তার ইচ্ছে হলো, ভাতের প্লেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে সদর্পে উঠে দাঁড়াতে।

এরকম ইচ্ছে মানুষের প্রায়ই নানা রকম হয়, মনেই থেকে যায়। সুপ্রকাশ তার বদলে হাসলো।

আজ সকালবেলাতেই এত সাজগোজ, কোথাও যাবে বুঝি?

—কাল নীতার বিয়ে, একটা শাড়ি-টাড়ি কিনতে হবে না? কত'র মধ্যে কেনা যায় বলো তো?

—মাসের শেষ।

—তা বলে নীতার বিয়েতে শাড়ি দেবে না? তা তো দিতেই হবে।

—একশো দশ পনেরো?

—একশো'র মধ্যে হলে হয় না?

—কী রকম দাম বেড়েছে তুমি জানো? যে-গুলো আশী পঁচাশী ছিল·· ··· চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনার চিন্তাটা সুপ্রকাশকে আর একবার কামড় দেয়।

···সিনেমায় যেমন প্রথমে পায়ের জুতো, তারপর পা, হাঁটু, বুক ইত্যাদির পর পুরো মানুষটি দেখায়, প্রায় সেই ভঙ্গিতে সেতারী দেখালো সুপ্রকাশকে। একটুও চমকালো না, মুখে কোনো অপরাধী ভাব নেই, চোখ দুটি স্থির। বাজারের পেছন দিকটায়* এসে বসেছে সে। আজ তার সামনে শুধু কাঁচা লঙ্কা আর শিম। কোমরের গেঁজেতে হাত দিয়ে টাকা বার করলো সেতারী। বেশ গম্ভীরভাবে বললো, পুরো টাকাটা দিতে পাচ্ছি না, বাবু, আজ সুদটা নিয়ে যান।

—সুদ?

—টাকায় দশ পয়সা দিই, আপনি বাবু পাঁচ পয়সা হিসেবে নিন্। তা হলে কত হয়?

সুপ্রকাশের মুখে যেন কেউ চাবুক মেরেছে। এ রকম তাকে কেউ কখনো করেনি।

মধ্যবিত্ত বাঙালীদের কাছে সুদ জিনিসটা মুসলমানদের মতনই হারাম। সুদর্শন কথা বলতে পারেন না।

—কত হয়, বাবু?

—তুমি এর মধ্যে একদিন আমায় দেখে পালিয়েছিলে?

—কবে? আপানাকে দেখে পালাবো কেন? অ্যাঁ? হে হে!

এইটাই সুপ্রকাশের বেশী করে মনে লাগছে যে, তার মানুষ চিনতে এত ভুল হলো? লোকটির উপকার করতে চেয়েছিল সুপ্রকাশ এখন সে তার সঙ্গে অবজ্ঞার সুরে কথা বলছে।

গলায় যথা সম্ভব ব্যক্তিত্ব এনে সুপ্রকাশ বললো, তুমি আমায় সুদ দিতে

চাইছো ?

—তা হলে এক কাজ করুন, বাবু। আমার জিনিস নিয়ে যান কিছুটা তা হলেই ক্রমে ক্রমে আপনার টাকা শোধ হয়ে যাবে।

এই লোকটার স্পর্ধা কতখানি ? কোনো মাছওয়ালা এই কথা বললে তবু মানতো। চার আনার কাঁচা লঙ্কায় চার পাঁচদিন চলে যায়। আর শিম কেউ খায় না সুপ্রকাশের সংসারে।

এইভাবে ধার শোধ হবে ?

লোকটা যা কাঁচালঙ্কা আর শিম নিয়ে বসেছে, তার সবটার দামই পনেরো-কুড়ি টাকার বেশী না। বাকি টাকা নিয়ে ও কী করলো ? বাঁধাকপি থেকে কাঁচা লঙ্কায় নেমে যেতে ওর লজ্জা করলো না ?

খানিকটা অভিমান নিয়েই বাজার থেকে ফিরল সুপ্রকাশ। এইসব অভিমান যে ঠিক কার বিরুদ্ধে তা ঠিক করা শক্ত। তবু হয়। একটা লোককে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল, একজন মানুষকেও যদি হাত ধরে তুলে দাঁড় করানো যায়·· কিন্তু এরা যদি নিজেই না চায়···।

সেই অভিমানবশেই এর পরদিন সুপ্রকাশ আর বাজারের সেই দিকটায় গেলই না। সেতারীর মুখ আর সে দেখতে চায় না। তা বলে যে চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনার কথা সে ভুলতে পেরেছে, তাও না, কাঁটা হয়ে ফুটছে। আর একটা ব্যাপার এই যে, এ'ব্যাপার নিয়ে সে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারছে না পর্যন্ত শ্রীমতীর কাছে উল্লেখ করা মাত্রই···। অন্য যে-কেউ শুনলেই তাকে বোকা বলবে।

হয়তো এটা কল্পনাও হতে পারে যে, কেউ যেন দূর থেকে বাবু, বাবু বলে ডাকছে সুপ্রকাশকে। সেতারী নিশ্চয়ই। কিন্তু সুপ্রকাশ ফিরে তাকাবে না। লোকটা দৌড়ে পালাতে পারে, আর দৌড়ে তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না ? ভারী ভারী পা ফেলে বাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সুপ্রকাশ প্রতি মুহূর্তে ভাবছে, সে এসে তার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে। কেউ এলো না।

···বাজারের বাইরে রাস্তার ওপর বসেছে সেতারী, তার ঝুড়িতে শুধু উচ্ছে। সব মিলিয়ে দশ টাকার মাল। সুপ্রকাশ চোখ সোজা রেখে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে, সে তাকাবে না। সেতারী তাকে দেখতে পেয়েছে, নিশ্চিত, তবু ডাকলো না তো। সুপ্রকাশ এক লাথি দিয়ে লোকটার ঝুড়ি উলটে দিতে পারে এক্ষুনি, ও জানে না ? সুপ্রকাশ নিতান্ত ভদ্রলোক, ও তার সুযোগ নিচ্ছে। টিয়াদি অবশ্য ঠিক। দশটাকার উচ্ছে বেচে, ক'টাকা লাভ হয় ? তা দিয়ে সংসার চলে ? লোকটা জুয়া-জুয়া খেলে নিশ্চয়ই। যা খুশী করুক।

—ইরা সিদ্ধার্থর ছেলের পৈতে সামনের সোমবার। কিছু একটা তো দিতে হয়।

—আমি পৈতের নেমন্তন্নতে যাই না তোমা'র তো সেদিন অন্য জায়গায়।

—তাহলেও কিছু একটা দিতে হবে তো।

—না গেলেও দিতে হবে?

—কিছু যদি না দাও, তাহলে সবাই ভাববে, কিছু দিতে হবে বলেই তুমি গেলে না! ওরা একবার সুমির জন্মদিনে শাড়ি দিয়েছিল।

—কেন দিয়েছিল?

—কী আবোল তাবোল বকছো? ওরা দিয়েছিল, ফেরৎ দেবো নাকি? সুমিকে ওরা দিয়েছে—কত? পৈতের জন্য কত?

…বাজারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেতারী। হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। একটু দূর থেকে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল সুপ্রকাশ। ও হতচ্ছাড়াটার মুখ দেখতে আর ইচ্ছে করে না। সুপ্রকাশ কি অন্য গেট দিয়ে যাবে? কিন্তু সামান্য একটা দোকানীর জন্য সুপ্রকাশ চক্রবর্তী রাস্তা বদলাতে যাবে কেন? থাক না দাঁড়িয়ে ও।

—বাবু!

এটা কল্পনা নয়, সত্যিই ডাকছে সেতারী। সুপ্রকাশকেই। উদাসীন বাঘের মতন মুখ করে তাকালো সুপ্রকাশ। ভালো করে চেয়ে দেখলো। হঠাৎ যেন বেশী রোগা হয়ে গেছে লোকটা। চোখ দুটো বেশী জ্বলজ্বলে, রুখু দাড়িওয়ালা মুখখানা অন্য রকমের ছুঁচোলো।

বিড়ি টানতে টানতে নির্লজ্জের মতন হাসছে লোকটা।

আবার টাকা চাইবে? থাপ্পড় কষাবে সুপ্রকাশ। যতই নাটকীয় হোক। এ রকম একটা কিছু সে করবেই।

—বাবু কাল থেকে আপনাকে খুঁজছি।

—কেন?

—আমি সব বেচে দিইছি, বাবু সব বেচে দিইছি। হে হে।

—কী বেচে দিয়েছো?

—সব।

—বেশ করেছো।

ফতুয়ার পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট বার করলো সে। আবার বললো, সব বেচে দিইছি, হে হে। এই নিন্।

সুপ্রকাশের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে তার মধ্যে সে বেশ কয়েকখানা নোট গুঁজে দেয়। সুপ্রকাশ আঁতকে উঠে বলে, একী করছো? অ্যাঁ? কী হচ্ছে।

—আপনার টাকা।

—তুমি···সব টাকা এক সঙ্গে···তোমার কাছে কি আমি চেয়েছি? কোনোদিন চেয়েছি? তোমার যদি অসুবিধে হয়।

না, বাবু, আপনি ভালো মনে করে দিয়েছিলেন, আমি শালা অমন নিমক হারাম নয়।

—তুমি।

—তুমি, এখন রাখো, তোমার দোকান কোথায়? তুমি বরং আবার

—সব বেচে দিইছি···

লোকটি হঠাৎ হন হন করে হেঁটে মিশে যায় বাজারের ভিড়ে। সুপ্রকাশ প্রথমে একটু হতবুদ্ধি বোধ করে। অন্যান্য দোকানদাররা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুপ্রকাশ বাজারে ঢুকে পড়ে। এখন সে লোকটাকে কোথায় খুঁজে পাবে? লোকটা হাতের লম্বা আঙুল নাড়তে নাড়তে চলে গেল কোথায়? এখন সুপ্রকাশ ওর জন্য ··।

হাতের টাকাটা কেমন যেন অপবিত্র, ময়লা মনে হচ্ছে সুপ্রকাশের। পকেটে ভরতে ইচ্ছে করছে না। তার নিজেরই প্রাপ্য টাকা, অথচ, এটা যেন, ঠিক কী রকম যে···। টাকাটা সুপ্রকাশ ফেলে দেবে? অন্য কেউ যদি চায়, এক্ষুনি দিয়ে দিতে পারে···।

নতুন ইলিশ উঠেছে, তিরিশ টাকা দর, সুপ্রকাশ ঝট্ করে দেড় কেজির একটা বেশ চ্যাপটা মাছ কিনে ফেললো। নোংরা টাকাগুলো মাছওয়ালাকে দিয়ে তার বেশ স্বস্তি হয়। তার ছেলে খুব ইলিশ ভালোবাসে। আজ খুব খুশী হবে।

অগস্ত্যের গ্রাস

বলরামের কথায় কেউ কোনদিনই কর্ণপাত করে না, আজও করলো না। কেন না, ও পাগল। বলরামের পাগল হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। সংসারে যেমন আর দশটা কাজের কার্যকারণ থাকে তেমনি বলরামের পাগল হওয়ারও একটা কার্যকারণ ছিল। আজ সেই ইতিহাস হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এখন একমাত্র সত্য —বলরাম পাল একজন পাগল।

পুকুর পাড়ে এসেই সে সোরগোল তুলে দিল। সোরগোল অবশ্য বলরাম আসার আগে থাকতেই হচ্ছিল। সেই কাক ডাকা ভোর থেকেই লোক জমায়েত শুরু হয়েছে। বেলা যত বাড়ছে লোকের ভীড়ও ততই বাড়ছে। ভাবতে গেলে, এরাও বলরামের মত পুরো পাগল না হলেও আধাপাগল।

পাগল বলরাম চ্যাঁচাতে লাগলো—সে কি হে ডাক্তার, তোমরা দেখি দু'দুটো অগস্ত্য নামায়ে দেছো?

কলোনীর মাঝখানে একটা বেশ মাঝারি সাইজের পুকুর আছে। বছর দশেক আগে কলোনীর ঘরবাড়ি তৈরীর জন্যে মাটি কাটা হয়েছিল একটা সাইজ করা জায়গা থেকে, সেই থেকে পুকুরটা গজিয়ে উঠেছিল। বহুদিন অনাদৃতভাবেই ছিল। বছর চারেকও হয়নি জনার্দন ডাক্তার ওই পুকুরটা 'লীজ' নিয়ে মাছের চাষ শুরু করেছিল। এ ব্যাপারে সরকারী মৎস্য বিভাগের উৎসাহ আর সহায়তা পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল কারবারটা। আর ঠিক তখনই পাঁচজনার কুনজর লাগল পুকুরটার ওপর।

জনার্দন ডাক্তার নামেই ডাক্তার। ডাক্তারী ছাড়া আর সব কিছুতেই তার পসার। আগে দুচারটে রোগীকে সুঁইয়া' ফোটাবার 'সুযোগ ছিল। ইদানীং সরকারী হাস-পাতাল হওয়াতে সে গুড়ে বালি পড়েছে। বাজারে ছোটমত একটা ওষুধের দোকান আছে, সেখানে কিছু সস্তার ওষুধ সাজানো আছে। ওষুধের শিশিতে যে হারে ধুলো পড়ে আছে তা দেখে বেশ বোঝা যায় ওষুধ তো বিক্রী হয়ই না—ঝাড়া পোছা যে কস্মিনকালে হয় তা-ও মনে হয় না। জনার্দন নিজে বড় একটা দোকানে বসে না, একটা অল্পবয়েসী ছোকরা বসে বসে মশা তাড়ায়, আর সন্ধ্যেবেলায় খুব ঘটা করে ধূপ ধুনো দেয়। দোকানের এই দৈন্যদশা, তা বলে জনার্দন ডাক্তারের নিজের দশা

এমন কিছু দৈন্যের নয়। বরং বেশ বাড়বাড়ন্ত। আরো পাঁচরকম কারবার আছে। রাখী কারবার—শীতের সময় আলু, সুপুরি, লংকা ধান গুদামজাত করে রাখে, পরে মওকা বুঝে আস্তে আস্তে বাজারে ছেড়ে দু'পয়সা ঘরে তোলে। বিনা লাইসেন্সের বন্ধকী কারবারও সামান্য আছে। মাইল দশেক দূরে সলসলা-বাড়িতে কিছু ধানী জমি আছে, একটা খামার বাড়ি আছে, কিছু গোরু মোষও আছে। এর উপর উপরি এই পুকুরটা। কিন্তু কারো ভালো তো কলোনীর লোকের সহ্য হবে না—তাদের চোখ টাটায়। তারা পিছু লাগলো। তারা জিগীর তুললো সমবায় প্রথায় মাছের চাষ হবে। এটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। একজনই মুনাফা লুটবে—এসব গণতন্ত্র বিরোধী ব্যাপার চলতে দেওয়া যায় না। অতএব চললো অপর পক্ষের আপীল আদালত, গ্রাম-পঞ্চায়েত, আর বি ডি ও-র বাছে দরবার। শেষ-মেশ রফা হলো—এ বছর লীজের মেয়াদ শেষ হলে, জনার্দনের লাইসেন্স আর রি-নিউ করা হবে না। মাথায় বাজ পড়লো জনার্দনের। লীজের মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা বাকি। শীতের প্রথমে নতুন মাছের পোনা আর মাছের খাবার যা পুকুরে ঢেলেছে, তা কম করে এক হাজার টাকার আর আগের বড় মাছ যা পুকুরে পড়ে রয়েছে তোলার অপেক্ষায় তা-ও না হোক করে হাজার তিনেক টাকার। লীজের মেয়াদ শেষ হলে পুকুরে জাল ফেলা তো দূরের কথা, আঙুল দিয়ে জল ছুঁতে দেবে নাকি শকুনের দল? এতদিন পড়েছিল ভাগাড় হয়ে কচুরিপানা আর মশার আড়ৎ হয়ে, তখন কোনো শালার মাথায় মাছের চাষের বুদ্ধি খেলেনি। আর যেই দেখেছে সাফ সুফ্ করে দুটো পয়সা ওঠাচ্ছি—ব্যস ওমনি হয়ে গেল। কিন্তু এখন শাপমণ্যি করার সময় নয়।

স্থির হলো, পুকুরের জলে পাম্প দিতে হবে। পুকুরের জল শুষে নিয়ে সব মাছ তুলে ফেলবে। একটা পাম্পও জোগাড় করে ফেললো জনার্দন ডাক্তার। কাজের লোকতো বসে বসে হা-হুতাস করার মানুষ নয়। "গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে।" কলোনীর লোক জনে জনে জানলো—জনার্দন ডাক্তার পুকুর শোষণ করবে। খবরটা বলরাম পাগলও শুনলো। শুনে কিছু সময় গম্ভীর হয়ে থাকলো, মনে মনে মতলব ঠাওরাল। এ নিয়ে মস্করা ঠাট্টা করলো না। কিছু লোক অবশ্য এ নিয়ে মস্করা ফক্কুরি করলো—"বল কি, একেবারে পুকুর শোষণ, ওর নাম দিয়ে পুকুর চুরি নয়তো? এমন পুকুর চুরি তো জনার্দন এর আগে বহু করেছে। আমার মনে হয়, সমুদ্র শোষণ করবে জনার্দন বুঝলে? অগস্ত্য মুনিকে জলে নামিয়ে দেবে। একেবারে চোঁ চোঁ করে সব জল খেয়ে ফেলবে।

কথাটা মনে ধরলো বলরামের, সমুদ্র শোষণই দরকার, সমুদ্র মন্থনের চেয়ে সমুদ্র

শোষণ সেরা ভালো। সমুদ্র মন্থনে অনেক গরল ওঠে। অত গরল পান করবে কে? বলরাম আর বিষ পান করতে পারবে না। তার সংসার সমুদ্র মন্থন করে অনেক বিষ উঠেছে সেসব সে আকণ্ঠ পান করে বসে আছে। সুতরাং আর সে পান করতে পারবে না। তার চেয়ে সমুদ্র শোষণই ভাল, তা'তে ভেতরের অনেক জারিজুরি বেরিয়ে পড়ে। জনার্দন নিজে পুকুর চুরি করে কিনা জানে না, তবে পুকুরটা যে তার বৌকে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে—এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস।

আর সেই বিশ্বাস নিয়েই ভোর রাতে উঠে এসেছে পুকুরের জল পাম্প করা দেখতে। 'অগস্ত্য' কথাটা তার খুব ভাল লেগেছিল। পাম্প করে ক্ষেতে খামারে জল সেচ করতে যে সে ছাখেনি এমন নয় তবু আজকের উৎসাহ অন্য-রকম। যখন একফোঁটা জলও আর থাকবে না তখন কোথায় লুকিয়ে থাকবে হারামজাদী, ঘেটি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব ঘরে। আবাগী পুকুর কতলোকের কত কিছু গিলে বসে আছে। দীনু সরকারের মেয়ের কানের মাকড়ি, নন্দ ঘোষের নতুন বৌয়ের নাকের নোলক। মানুষ জন-ও দু' একটা খেয়েছে। যেগুলো খেতে অরুচি লেগেছে সেগুলো উগরিয়ে ফেলেছে। পরাণ সাহার ছ'বছরের ছেলেটা জলে নেমেছিল, কলমীদামে পা আটকে মরে পড়েছিল। কুমারী মা হবার যন্ত্রণা নিয়ে ঐ মেয়েটা জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, পুকুর তাকেও খায়নি। 'গর্ভ্যোবতী' মেয়ে বলে অরুচি ধরেছিল বোধহয়, তাই সেই মেয়েটির মরা দেহ ভেসে উঠেছিল। কিন্তু বলরামের বৌ অত সহজে মুক্তি পায়নি। বলরামের সুন্দরী বৌ-এর ওপরে অনেকেরই নজর। 'হুঁ হুঁ' বাবা, লোকে তাকে যতই পাগল ভাবুক সে সব টের পেত। অমন লোভী পুকুরটা যখন তাকে বাগে পেয়েছে সেকি অত সহজেই ছেড়ে দেবে? কিন্তু এইবার, এইবার কোথায় যাবে চাঁদ'? দু-দুটো অগস্ত্যের পাল্লায় পড়েছ? কাল ওরা যখন 'অগস্ত্য' বলে মস্করা করছিল তখন ও বলেছিল—বুঝলে, একটা অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করতে পারে, পুকুর তো সামান্য ব্যাপার। ছাখো না পনের জন অগস্ত্য মিলে গোটা ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসন শুষে নিইছিল। তাই থেকেই তো ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। ওর এই কথায় সকলে হেসে উঠলো। ওর এই রকম কথাবার্তার জন্তেই লোকে ওকে পাগল বলে ক্ষ্যাপায়।

জল যত কমে আসছে মাছের খলবলানি তত বাড়ছে। ক্রমে ক্রমে বলরামের কেমন যেন মনে হলো, এই পাম্প দুটো অগস্ত্য, সমুদ্রের নীচে লুকিয়ে থাকা দুটো ছদ্মবেশী দৈত্য। ইল্বল আর বাতাপি। এটা জনার্দনের একটা চক্রান্ত—গভীর চক্রান্ত। আজকাল চারিদিকে শুধু চক্রান্ত আর চক্রান্ত। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে জনার্দন চীৎকার করবে—বাতাপী—বাতাপী, আর অমনি কার পেট চিরে, কার

সর্বনাশ করে বেরিয়ে আসবে বাতাপী। হাঃ হাঃ হাঃ। অট্টহাসি যেন উঠলো চারিদিক থেকে। ……বাতাসী—বাতাসী, বাতা—সী ই-কতদিন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ফিরেছে বলরাম। কিন্তু না, পুকুরের জল চিরে বাতাসী বেরিয়ে আসেনি। বাতাসী তার বৌ।

……একদিন দৈত্য বাতাপী আর পেট চিরে বেরিয়ে আসতে পারলো না। অগস্ত্য মুনি বললেন, আমি তাকে হজম করে ফেলেছি সে আর আসবে না। সেই পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন বৌ এর শোকে হুঁ হুঁ করে কেঁদেছিল। জনার্দন এসে পিঠে হাত রেখে বলেছিল—বাড়ি যা দিনু ও আর ফিরবে না।

তিন দিন তিন রাত ধরে চললো পাম্পিং। তিন দিন মুহূর্তের জন্যেও পুকুরপাড ছেড়ে কোথাও যায়নি। খাওয়া নেই, ঘুম নেই অবসন্ন ক্লান্ত দেহ নিয়ে পড়ে রইল পুকুর পাড়ে। কেউ দয়া করে কিছু দিলে খেয়েছে নতুবা অভুক্তই রয়ে গেছে। এই তিন দিন যেন পুকুর পাড়ে মেলার উৎসবের মত হয়ে থাকলো।

এক একটা মাছ লাফ দিয়ে উঠছে আবার জলে পড়ছে। মাছের ঘাই দেখে আনন্দে 'তাই' দিয়ে উঠছে ছেলের দল। জেলেরা মাছ ধরার লম্বা জাল এ প্রান্ত বিস্তৃত করে রেখেছে। জায়গায় জায়গায় জল সরে গিয়ে কাদামাটি বেরিয়ে পড়েছে। হাঁড়িতে ফুটন্ত চালের মত মাছ টগ্‌ বগ্‌ করছে। লোকজনের উত্তেজনা চরমে উঠেছে। উৎসাহের আতিশয্যে ছেলের দল জলে নেমে পড়তে চাইছে। জনার্দনের লোকজন হৈ হৈ করে উঠে বাধা দিচ্ছে।

শকুনের মত দৃষ্টি মেলে ধরেছে—কোথায় তার বাতাসী। বা—তা—সী বলে, ডাক দিয়ে উঠবে কিনা চিন্তা করলো। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরলো না। জল সরে গিয়েছে অনেকটা, পাড়ের দিকে একেবারে কাদার মধ্যে এসে বসে পড়লো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটু দূরে কাদার মধ্যে কী যেন চক্‌চক্‌ করছে। কীরকম সন্দেহ হলো, একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো। টুং করে একটা শব্দ হলো। চীৎকার করে উঠলো বলরাম—পাইছি, আমার বাতাসীর কলস উডা। উঠে আনতে গেল। কিন্তু তার আগেই কেউ চোখের নিমিষে ওকে সরিয়ে দিয়ে বোঁ করে ছুটে কাদার মধ্যে নেমে তুলে নিল পিতলের একটা কলস। বলরাম তখন কাদায় পাঁকে একাকার। চোখ মুখ থেকে কাদা সরিয়ে নিয়ে বললো—এ কলস আমার, তুই নিলি ক্যান, দিয়ে দে।

জনার্দনের লোকজন ওদিকে তখন তিন কিলো চার কিলোর এক একটা মাছ জাপটিয়ে ধরে তীরে এনে তুলছে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এদিকে এদের বচসায় তাই কেউ নজর দিল না।

বলরামের যেন ঘোর কাটলো সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো, কলস হাতে সামনে দাঁড়িয়ে বাতাসী। বলরাম অভিভূতের মতো বলে উঠলো—বাতাসী তুই! বাতাসী, তুই ছিলি কনে? তোরে আমি—

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো বাতাসী—থাক্, আর সুহাগ দেখাতি হবে না। খাবার দেবার মুরোদ নেই আবার সুহাগ দেখাতি আইছ। আমি লোকের বাড়ি ভিক্যে কইরে দাসী গিরি কইরে মরদের খাওয়াব আর উনি পায়ের পরে পা দিয়ে রাজা উজীর মাইরবেন, বিটলেমী কইরে বেড়াবেন। একবার খোঁজ করিছ কেমন ক'রে দিন চলে?

বলরাম কাতর হলো—তুই বাড়ি ফিরে চল, এবার আমি কাজের জুগাড় কইরে নেব।

—থাক, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই—বাতাসী কথায় কষাঘাত করলো। আমি যেখানে যেয়ে উঠিছি সেখানে সুখে রইছি। পায়ের উপর পা দিয়ে শুয়ে বইসে আমার দিন কাটে। দুটো পাঁচটা দাসী বাদী আমার ফাইফরমায়েস খাটে।

—কুথায় উঠিছিস তুই?

—সলসলাবাড়ী, জনার্দনের খামারবাড়িতে।

বলরাম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর দুর্বল কলিজায় যত ক্রোধ ছিল তাই নিয়ে ফুঁসতে লাগলো। ওর ইচ্ছে হলো, চল্লিশ হর্স পাওয়ারের পাম্প দুটোর সাক্সন পাইপ দুটো জনার্দনের ফুসফুসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। জনার্দনের বুকে যত অক্সিজেন জমা হয়ে আছে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু পারে না, তাই আনত হয় বাতাসীর কাছে।

সেদিন জলেডুবেই মরতে এসেছিল বাতাসী। পুকুরপারে জনার্দন এসে উদ্ধার না করলে হয়তো ওর লাসও পুকুরের জলে ভাসতো।

—তা, মরতি এখেনে আলি ক্যান—বলরাম কৌতূহলী হয়। বাতাসী লাস্যভরে বললো, সেদিন পালিয়ে যাবার সুমায় কলসডারে পুষ্করিণীর মধ্যে ডুবোয়ে থুইছিলাম। পুষ্করিণী ছ্যাচা হচ্ছে শুইনে ছুটে আলাম কলসডা নিতি।

আর কিছুই করার নেই বলরামের। উত্থান শক্তি রহিত হয়ে পড়ে থাকলো জলকাদার মধ্যে। অমৃতের কলস কাঁধে করে ধীরে ধীরে উপরে গেল বাতাসী। না-না বাতাসী নয়, স্বয়ং লক্ষ্মী। শেষবারের মত ক্ষীণ কণ্ঠে আওয়াজ তুললো—'বাতাসী, কলসডা আমারে দিয়ে যা।' বাতাসী ওখান থেকেই হেঁকেবললো—ক্যান তোমারে দেব ক্যান? এ আমার বাপের বাড়িরতে দেছে।

বলরাম বললো—আমি বিয়ে না করলি এ কলস পাতিস ক'নে।

বাতাসী অহঙ্কারে ভর করে কোমর বাঁকিয়ে বললো। —আমি তোরেও মানিনে; তোর কন্যা বিয়েও আমি মানিনে। সামনে রাস্তাটা পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়েছে, গরবিনী সেই বাঁকে অশ্বত্থগাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

বলরাম বুঝলো, এই তিনদিন ধরে সমুদ্রে শোষণ হয়নি হয়েছে সমুদ্র মন্থন। আর উঠেছে রাশি রাশি গরল আর তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকণ্ঠ পান করতে হয়েছে তাকে। 'আর ঐ দ্যাখ, চায়ে দ্যাখ সমুদ্দরেরতে উঠে আ'লো স্বয়ং লক্ষ্মী। ঐ লক্ষ্মী তো তার ভোগেই লাগবে। আর আমি, ইল্বল বা বাতাপির মত দৈত্য হয়ে অগস্ত্যের গ্রাস হবো। এই আমার অদৃষ্ট।'

মরুরমণীরা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ক্যারলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অ্যারিজোনা ক্রনিকলের অফিসে। মিষ্টি চেহারার তন্বাঙ্গী এই মেমসায়েবদের বয়স আঁচ করা সহজ নয়। কিন্তু সুযোগমতো কথাটা তুললে মোটেও অভদ্রতা হয় না। শিল্পকলা বিষয়ে সপ্তায় এককলম জায়গা ক্যারলের বরাদ্দ। পাতাটা সম্পাদনা করে জর্জ সিভার। রাগী চেহারার এই যুবকটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে নিখুঁত আমেরিকান। জঙ্গী উদ্দীপনায় সে আমাকে নিয়ে পড়েছিল। আমার জন্মসাল টুকতে গিয়ে সে মুখের দিকে তাকাল। একটা কিছু খুঁটিয়ে দেখার পর ফের কাগজের ওপর ঝুঁকে বলল, তোমাকে বয়সের তুলনায় তরুণ দেখায়। নিশ্চয় যোগ-টোগ করো।

ওপাশ থেকে ক্যারল বলে উঠল, বিশ্বাস করো না জর্জের কথায়। নতুনদের হাতে ফিডিং বোতল ধরিয়ে দেওয়া ওর অভ্যাস।

রাগী চেহারার জর্জ ফিক করে হেসে বলল, তোমাকে নিশ্চয় দিইনি।

দিয়েছিলে। ভুলে গেছ। ক্যারল শক্ত মুখে বলল। গত বছর ল ইজি স্টিভেন সনের ভাস্কর্য নিয়ে একটা ফিচার লিখেছিলাম। তোমার কাছে নিয়ে এলাম এবং তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, এত কম বয়সে ভারি-ভারি শব্দ ঘাঁটা বিপজ্জনক। মনে আছে, আমি কী বলেছিলাম?

জর্জ মুখ না তুলে বলল, ক্যারল দয়া করে তুমি থামলে আমি এই ভারতীয় লেখকের লেখার থিম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারব।

ক্যারল দমল না। গ্রাহ্যও করল না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বয়স আন্দাজ করতে পারো?

ঝটপট জবাব দিলাম, পারি। যোগবলে।

ক্যারল হাসল না। বলল, তুমি যোগী নও। স্যানফ্রান্সিসকোতে আমি যোগী দেখেছি। ওসব ছাড়ো।

জর্জের মুখের রাগী ভাবটা চলে গেছে। আমার দিকে করুণ চোখে তাকাল। ক্যারলকে বললাম, তোমার বয়স আর কত হতে পারে? চব্বিশ পঁচিশ।

ক্যারল তুমুল চ্যাচামেচি করে বলল, কখনো না। আমি বত্রিশ। পরিষ্কার তিনের পাশে দুই।

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, জর্জ ঠিক কথা বলেছিল। তোমাকে আরও কমবয়সী দেখায়।

তার মানে, এখনও তোমার দ্বিধা ঘোচেনি। ক্যারল জেদী গলায় বলল। ঠিক আছে। কাল থ্যাংক-গিভিং ডে-তে আমার বাপের বাড়ি তোমার ডিনারের নেমন্তন্ন রইল। সেখানেই প্রমাণ পাবে আমি বত্রিশ কিনা।

এই ধরনের বেমাক্কা নেমন্তন্নে ভড়কে গিয়ে বললাম, কিন্তু কাল তো আমি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখতে যাচ্ছি।

বেশ তো। বিকেলে তোমাকে এয়ারপোর্টে তুলে নেব। এক মিনিট, বাবাকে জানিয়ে দিই।...বলে সে ফোন তুলে বোতাম টিপতে থাকল।

জর্জের মুখে রাগী ভাবটা ফিরে এল। বলল, এস! আমার কাজটা সেরে নেই। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে এখন? মানুষ এবং প্রকৃতির দূরত্ব। দারুণ! বলো।

জর্জের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আড়চোখে দেখছিলাম, ক্যারল ফোনে হাত মুখ নেড়ে অনর্গল কী বলে যাচ্ছে। তার একটা শব্দও আমার বোধগম্য নয়। মিনিট তিনেক পরে শব্দ করে ফোন রেখে সে বলে উঠল, সব ঠিকঠাক। বাবা ভীষণ খুশি। বললেন কী জানো? তুমি যে লাসভেগাস হয়ে গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন না গিয়ে ফিনিক্স থেকে যাচ্ছ, এতে বোঝা যায় তুমি দারুণ ভালমানুষ। ভারতীয়দের এজন্যই বাবার পছন্দ।

অবাক হয়ে বললাম, লাসভেগাস হয়ে গেল কী হত?

ক্যারল মিটিমিটি হাসল। জর্জ হতাশ হয়ে বলল, আগে ক্যারলপর্ব চুকে

যাক্। তোমার নিশ্চয় তাড়া নেই। তা ছাড়া রাস্তা পেরুলেই তোমার সরাইখানা। তদুপরি ফিনিক্স খুব নিরাপদ শহর। অ্যারিজোনার হৃদয়বতী মরুরমণীদের বিচরণক্ষেত্র।

আমার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারও ক্যারল মিটিমিটি হাসতে থাকল। জর্জ ওর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আমাকে বলল, লাসভেগাসে থাকার মতো স্মার্ট তুমি নও। অ্যারিজোনার চেয়ে নেভাডা কর্কশ। বিশেষ করে জুয়া আর প্রমোদবালিকাদের আখড়া ওখানে। তার চেয়ে বড় কথা, তোমার বয়স যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তা হলে লাসভেগাসে আত্মসংবরণ করে থাকা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হত। বিশেষ করে তুমি একজন বিবাহিত লোক। অনেকদিন ধরে একা কাটাচ্ছ। কী বলছি, বুঝতে পারছ তো?

গম্ভীর ক্যারল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা হলে সেই কথা রইল। কাল বিকেলে কখন মিনিক এয়ারলাইনসের প্লেন যিরছে, জেনে নেব খন। ওদের অ্যারাইভ্যাল টার্মিনাল আমার চেনা রেড কনকোর্সে। তাই না জর্জ?

জর্জ শুধু বলল, ইয়া।

ক্যারল বলল, তোমাকে দুটো ফোন নম্বর দিচ্ছি। একটা আমার, অন্যটা বাবার। নম্বর টুকে দিয়ে সে চলে গেল। জর্জ উঠে গিয়ে হিটারে রাখা কফির পাত্র থেকে কফি ঢালল কাগজের কাপে। বলল, তোমাকে শুধু একটা ব্যাপারে সতর্ক করতে চাই। ক্যারলের সঙ্গে ওর স্বামী বিনের যদি ঝগড়াঝাটি বাধে, তুমি মুখটি বুজে থাকবে। কক্ষণো নাক গলাতে যেও না।

অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। বললাম, ওদের বনিবনা হয় না বুঝি?

অত আমি বলতে পারব না। জর্জের মুখে রাগী ভাবটা তীব্র হল। কফির পাত্র এগিয়ে দিয়ে বলল, ওসব ওদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি কথাটা। পার্টি-ফার্টিতে দেখেছি, রাত যত বাড়ে ওরা তত পরস্পরের ওপর খাপ্পা হতে থাকে। তবে তোমার উদ্বেগের কিছু নেই। কাল থ্যাংকস-গিভিং-ডের পরব ওর বাপের বাড়িতে। ভদ্রলোক অতি সজ্জন। মেয়ে-জামাইকে সামলে নেবেন দেখবে। আসলে আমার কী ধারণা জানো? রোগাটে চেহারার মেয়েরা ভীষণ রগচটা হয়। হুঁ নিজের চরকায় তেল দেওয়া যাক। ইন্টারভিউটা সেরে তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। লাসভেগাসের চেয়েও রোমান্স পাবে, কিন্তু নিরাপদে। সেখানে প্রেমের দর ডলারে নয়, স্রেফ মুখের কথা।...

অ্যারিজোনার এক রুক্ষ মরুসদৃশ প্রান্তরে লাল পাহাড়ে ঘেরা ফিনিক্স যেন রূপকথার নিঝুমপুরী। র‍্যামাডা ইন নামে প্রখ্যাত সরাইখানা সারা মার্কিন মুলুকে

ছড়িয়ে আছে। ফিনিক্সের ডাউন টাউনে অবস্থিত র‍্যামাডা ইন আর সব সরাইখানার মতো বেপরোয়া প্রমোদাগার নয়। লাজুক, শিষ্ট, শান্ত। রাতে জর্জের সঙ্গে এক জায়গায় গিয়ে নগ্ননৃত্য দেখতে দেখতে উসখুস করছিলাম। জর্জ টের পেয়ে বলেছিল, একঘেয়ে লাগছে বুঝি? আমারও। কিন্তু এটা তো পয়লা দফা। থ্রিল আছে দ্বিতীয় দফায়। সুতরাং প্রস্তুতি দরকার। সুন্দর সুন্দর সংলাপ তৈরি রাখো মরুরমণীরা আসছে।

তারপর জর্জ যে অপকম্ম করল, তাতে আমার অবস্থা আরও করুণ হল। মার্টিনির সঙ্গে জিন মিশিয়ে যে পানীয় টেবিলে এল, তার পরিণাম সম্পর্কে পরিবেশিকা নিগ্রো মেয়েটি কানে কানে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু তাথাকে তখন জর্জ নামক দানোয় পেয়েছে। কীসব অদ্ভুত, কোমল, কঠিন অথবা বাষ্পীয় ব্যাপার ঘটতে থাকল। বর্ণময় অন্ধকারে ঢুকে মরুরমণীদের খুঁজছিলাম। যখন জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে এল, তখন দেখি র‍্যামাডা ইনে আমার ঘরেই শুয়ে আছি। পায়ে জুতো। পাশে ফোনটা বেজে চলেছে। তুলে নিতেই কানে এল: রিসেপসন থেকে বলছি স্যার। আপনার লিমোজিন এসে গেছে।

ধন্যবাদ দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়লাম। কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করছে। থলি শূন্য। সাড়ে দশটায় প্লেন উড়বে। এয়ারপোর্ট পৌঁছুতে আধঘণ্টা লেগে যাবে। এখন বাজে নটা পঞ্চান্ন। ঝটপট সেজে বেরিয়ে রিসেপসনের সামনে আসতেই সহাস্য গুড মর্নিং পেলাম গতকালকের উদাসীনা সুন্দরীর কাছে। কিন্তু হঠাৎ আজ এত খাতির কিসের রে বাবা! লিমোজিনের ড্রাইভার বাও করে সবিনয়ে জানাল, আসুন স্যার। সুন্দরীটি কলকলিয়ে বলল, হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ স্যার। পথে যেতে যেতে হদিশ মিলল এই আকস্মিক খাতিরের। ড্রাইভার একগাল হেসে অ্যারিজোনা ক্রনিকলের ভেতরকার পাতাটা এগিয়ে দিল। দেখি, আমারই সচিত্র ইন্টারভিউ। জর্জের কীর্তি।

কাল বিকেলে দৈবাৎ কী খেয়ালে রাস্তা পেরিয়ে ওদের অফিসে ঢুকে এবং আত্মপরিচয় দিয়ে দেখছি, ভালই করেছি। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার ন্যাজারেথ আমাকে পইপই করে শিখিয়েছিলেন, এদেশে নিজের ঢাক নিজে পিটোবার রীতি আছে। সচরাচর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা (এবং তার সঙ্গে কোনো বই ফ্লাভি হলো তো কথাই নেই) দিয়ে লেখকের মাপজোক করা হয়। মার্কিন রীতি অনুসারে তুমি একজন সাকসেসফুল লেখক। অতএব কথাটা মনে রেখো।

মিনিক এয়ারলাইনসের প্লেনটা ছোট্ট। পাইলটকে নিয়েজনা দশের বসার জায়গা আছে। এক ঘণ্টা পরে যখন রহস্যময় গভীর পাহাড়ী খাতের ভেতর সে এগোচ্ছে,

ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। নিচে সুতোর মতো কলরডো নদী। দুধারে রঙবেরঙের পুরনো দুর্গের মতো ক্ষয়াটে পাহাড। কোনোটা মন্দিরের মতো দেখতে। পরে দেখলাম, ওগুলোর নাম দিয়েছে গ্রিক, সুমের আর হিন্দু দেবদেবীদের নাম।

লক্ষ বছর আগে কবে কুমারী পৃথিবী কী দুঃখে হৃদয় চিরে দেখাতে চেয়েছিল কিছু, তারই চিহ্ন এই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন। ট্যুরিস্ট বাস ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রান্ত দেখাল। এক ছড়া রেড ইণ্ডিয়ান মালা কিনে ফেললাম ঝোঁকের বশে। ঠাণ্ডা হিম কনকনে হাওয়া বইছিল। তিনটেয় ফের প্লেন উড়ল ফিনিক্সের দিকে। ফের এক ঘণ্টা বুকের ধুকধুক শব্দ বাড়ল। রেড কনকোর্সের রানওয়েতে নেমে জীবন ফিরে পেলাম।

বেরিয়ে খোলামেলা চত্বরে গিয়ে ক্যারলকে খুঁজছিলাম। কোথায় ক্যারল? সামনে অস্তগামী সূর্য। এখনই হাওয়ায় ঠাণ্ডাটা হুহু করে বাড়ছে। বাইরে তিষ্ঠোনো কঠিন। ক্যারল যেন না আসে, তা হলে সোজা চলে যাব জর্জের কাছে। ক্যাকটাস পার্কের সেই কাফেটেরিয়ায় গিয়ে কাল রাতের মরুবালিকাদের সত্যমিথ্যা যাচাই করব। স্রেফ কফি ছাড়া কিছু ছোঁব না।

কিন্তু তক্ষুণি একটা ক্রিমরঙা গাড়ি এসে থামল। তারপর ছিটকে বেরিয়ে এসে ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, হাই! আমার কি দেরি হয়েছে? নিশ্চয় হয়নি। যদি বলো হয়েছে, ত হলে নিশ্চয় জেনো ওদের ঘড়ির সময় ভুল। এস, বিনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

বিন গাড়ি চালিয়ে এনেছে। তার চেহারা দেখে ভড়কে গেলাম। আমেরিকানদের মধ্যে দৈত্যাকার লোক খুব কম নয়, কিন্তু বিন যে স্বয়ং দানব। খপ করে হাত বাড়িয়ে আদরে আমার হাত ধরল। মুখের হাসিটি অতি সরল। বলল, তোমার ছবি দেখে তোমাকে আরও মোটাসোটা ভেবেছিলাম। যাকগে, রোগা হও আর মোটাই হও, কথা নেই। আমি জীবনে এই প্রথম একজন লেখক দেখলাম! আমার জীবনে এটা দস্তুরমতো স্মরণীয় ঘটনা।

ক্যারল আমাকে পেছনে বসিয়ে নিজে স্বামীর পাশে বসে বলল, সেজন্য আমাকে ধন্যবাদ দাও, হনি!

বিন বলল, নিশ্চয়। অনেক ধন্যবাদ ডার্লিং। ওয়েল, মিঃ সার্জ!

ক্যারল দ্রুত বলল, সারা পথ তোমাকে ওর নামের উচ্চারণ শেখালাম। টাট্টু টাট্টু।

বিন হা হা করে হেসে জলদগম্ভীর স্বরে আমার নাম আওড়াবার চেষ্টা করল। গাড়ি অবশ্য চলছে তখন। দেখলাম, ওর কোলের ওপর অ্যারিজোনা ক্রনিকলের

সেই পাতাটা। ধূর্ত চোখে বিন সেটা দেখছে, আর চড়া গলায় আমার নাম আওড়াচ্ছে! কিছুতেই সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে আমার কাছে ফের জেনে নিচ্ছে। অগত্যা হঁ্যা দিয়ে ওকে শান্ত করলাম। কিন্তু পরক্ষণে ফের বলে উঠল, ওয়েল, মিঃ সাজ!

ক্যারল ঘুরে বলল, বিন ব্যবসা করে। আমি লিখি। কিন্তু আমি সফল লেখক হতে চাই। চলো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা হবে। তুমি একজন সফল লেখক। কীভাবে সফল লেখক হওয়া যায়, তোমার কাছে জেনে নেব।*

বিন বলল, ক্যারল একটা বড় উপন্যাস লিখেছে। দুশো টাইপকরা কপি। আমাকে পড়তে দিয়েছিল আমার তো সময় কম। তবু…

অমনি ক্যারল ফুঁসে উঠল, বিন! মিথ্যা কথা বলো না। মিথ্যা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

বিন কান না করে বলল, তুমি বরং সাজ'কে পড়তে দাও। ও যদি বলে উতরেছে, তা হলে আমি কী করব জানো? ক্যাকটাস পাবলিশার্সের এজেন্ট হা।মজাদা — কী যেন নাম, ওকে আমি দুরমুশ করব এক ঘণ্টা ধরে।

ক্যারল বলল, থামো! আমাকে আলোচনা করতে দাও। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

ওর বাপের বাড়ির দূরত্ব আন্দাজ করা কঠিন আমার পক্ষে। তবে বিন গাড়ি চালায় সর্বোচ্চ গতিতে এবং প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল। ফিনিক্সের একটা শহরতলি এটা। চারদিকে কুটিরাকৃতি ঘরবাড়ি। কত রকম রঙ।' ছবিতে আঁকা যেন। এখানে ওখানে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মরু এলাকার কাঁটাভরা পাম গাছ। কনে নানা গড়নের ক্যাকটাস। রাস্তার ধারে ইতর বৃক্ষসাধারণ এখন হলুদ ফল'-রোগে ভুগছে। অন্যান্য রাজ্যে 'ফল' বা পাতাঝরার দিন শুরু সেই সেপ্টেম্বরে। এখন শেষ নভেম্বর। কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে শীত দেরি করে আসে। লসএঞ্জেলসে তো রীতিমত উষ্ণ আবহাওয়া দেখে এসেছি। ফিনিক্সে এখনও পাতাঝরার দিন চলছে।

ক্যারলের বাবা আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক করে ঘরে ঢোকালেন। ওপাশের ঘর থেকে রঙীন মুর্গির মত এক প্রকাণ্ড প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন। তারপর বলা-কওয়া নেই আমার দুই গালে দুটি উম্ শব্দেভরা প্রচণ্ড চুম্বন এঁকে দিলেন তারপর এগোলেন বিনের দিকে। বিন পালাবার ভঙ্গিতে বোঁও করে ঘুরল। প্রৌঢ়া পেছন থেকে তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে ঝুমঝাম শব্দে কাতুকুতু দিতে থাকলেন। দানব বিন হ্যা হ্যা করতে করতে সোফায় বসে পড়ল। অমনি তার মুখ দু হাতে ধরে ভদ্রমহিলা উম্মুদমন্বিত বিকট চুম্বন উপহার দিলেন। সেই সময়

দেখি, ক্যারলের বাবা ক্লিক করে ওদের ছবি তুলে নিলেন। তারপর জামাইকে কেন কে জানে, প্রায় আধ হাত জিভ বের করে দেখালেন। বিনও জিভ দেখাল পাল্টা।

শান্ত ক্যারল বলল, বাবা। তুমি লুইজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

উডেন হাসতে হাসতে বললেন, লুইজি ফর্মালিটি মানে না। অতিথিমশাই, তোমার জ্ঞাতার্থে বলি, লুইজি আমার তৃতীয় স্ত্রী। ক্যারলের মা ছিল আমার দ্বিতীয়া। প্রথমার একটি ছেলে আছে। সে আছে নর্থ ক্যারোলিনায়।

লুইজি জামাইয়ের পাশে বসে বললেন, উডেন আমার চতুর্থ স্বামী। ওর মুখে তামাশার বাঁকা হাসি। তারপর জামাইবাবাজির পেটে খুঁচিয়ে বললেন, কত্তো চর্বি জমাচ্ছ। অন্তত জগিং করলেও পারো।

বিনও শাশুড়ির পেটে খোঁচা মেরে বলল, নিজেরটা দেখ। অ্যারিজোনার বৃহত্তম তরমুজ।

উডেন টেবিলে থরেবিথরে সাজানো দেশী-বিদেশী পানীয় ঢালতে ঢালতে মন্তব্য করলেন, এবং রসে রঙে টইটুম্বুর।

লুইজি কটাক্ষ হেনে বললেন, অ্যাণ্ড ফুল অব সেল। বিন হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

এদিকে ক্যারল আমার পাশ ঘেঁষে বসে কলকল করে কী বলে যাচ্ছে। আমি শুনব কী, শাশুড়ি-জামাইকে হাঁ করে দেখছি। উডেন হাতে-হাতে পানপাত্র ধরিয়ে দিলেন প্রত্যেকের। বিন গলা চড়িয়ে বলল, চিয়াস। লুইজির স্বাস্থ্য পান করা যাক।

ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ভারতীয় লেখকের স্বাস্থ্য পান করছি আমরা।

উডেন জলদগম্ভীর স্বরে কী আবৃত্তি করলেন, ক্যারল আমার কানে কানে বলল, ল্যাটিন স্তোত্র। বাবা ল্যাটিন জানেন। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন পড়াতেন। তখন আমি জন্মাইনি। হ্যাঁ, এবার তুমি বাবাকে আমার বয়স জিগ্যেস করো।

বললাম করবখন। ওহে বিন। পিয়ানো বাজাতে পারো?

বিন উঠে গিয়ে পিয়ানোর টুলে বসল। সঙ্গত-বাদ্যের চাবি টিপে দিল আগে। তারপর তালে তালে রিডে আঙুল চালাল। লুইজি মুখ টিপে হেসে পানপাত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বামীর কোমর আঁকড়ে নাচ জুড়ে দিলেন। উডেন বিব্রত মুখে বললেন, ওয়েট, ওয়েট হনি। সামনে লম্বা রাত পড়ে আছে। পুরো সাত বোতল মেক্সিক্যান 'বারকাণ্ডি' স্টকে মজুত। দু' বোতল ফরাসী মার্তিনিও আছে।

স্কচ আছে আড়াইখানা। একখানা ফিনৎ। আজ আমি রাজাধিরাজ।

ক্যারল চিঁচি করে বলল, আমার খিদে পেয়েছে। ওরও পেয়েছে— সারাদিন গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে টোটো করে ঘুরেছে যে।

উডেন স্ত্রীকে ঠেলে সরিয়ে ডাইনিং টেবিলে দৌড়ে গেলেন। বিশাল সুদৃশ্য ধাতব ঢাকনা তুলে বললেন, আমি রেঁধেছি। দেখতে পাচ্ছ কী অসম্ভব টার্কি রোস্ট? এস, আমরা থ্যাংকস-গিভিং ডে'র মূল ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলি।

লুইজি জামাইসহযোগে টেবিলে এলেন। ক্যারল আমার পাশে। উডেন ষষ্ঠ আসনে একটা প্রকাণ্ড রেড ইণ্ডিয়ান কাঠপুতুল বসিয়ে দিলেন গম্ভীর মুখে। তারপর হোস্টের আসনে গিয়ে ফের ল্যাটিন স্তোত্র আওড়ালেন। তারপর আস্ত টার্কির পাঁজরে ছুরি বসালেন খুব নিষ্ঠা এবং ভক্তিতে। বিনকে দেখলাম চোখ বুজে ধ্যানস্থ। লুইজি মস্ত হাঁ করে ওর কান কামড়ানোর ভান করছেন।

ম্যর্কিন মুর্গি আমার রসনায় বিস্বাদ। তাতে সন্ধ্যা ছটার মধ্যেই রাতের খাওয়া সেরে নেওয়াটা বড্ড বাজে ব্যাপার। অথচ দুটোই মার্কিনী জনপ্রিয় রীতি। লেটুস পাতা, গাজর, টমাটো আর দই জাতীয় বস্তুর স্যালাড, ভুট্টা সেদ্ধ বিন সেদ্ধ, প্রকাণ্ড আলু সেদ্ধ ও মাখন, আর ওই টার্কি রোস্ট। কয়েক রকম সস ও ভিনিগার মাখিয়ে হাপুসহুপুস থ্যাংকসগিভিং-ডের এই খাওয়া এদের ট্রাডিশনাল। চাষাড়ে ভোজন আর কী।

তার সঙ্গে মদ্য পান চলেছে তাল মিলিয়ে। আজ ওয়াইন নয়, কড়া মেক্সিক্যান মদ্য বলে শাশুড়ি-জামাই পরস্পরকে মুখ ভেংচাচ্ছে। গায়ে গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে এবং খাচ্ছে। আর গলায় ঝুলন্ত ক্যামেরা তুলে উডেন অনর্গল ক্লিক করছেন। শাশুড়ি-জামাই গালে গাল ঠেকিয়ে পোজ দিলে উডেন সানন্দে বললেন, অনবদ্য! খাসা! গ্র্যাণ্ড!

খেতে ঘন্টাখানেক লাগল সম্ভবত। তারপর উডেন দ্বিতীয় দফায় ফরাসী মদ্য পরিবেশন করলেন। একটু পরে লুইজি আমাকে নিয়ে পড়লেন। ওয়েল সাজ! (জামাইবাবাজির অনুকরণে) তোমাদের কাস্টসিস্টেম সম্পর্কে জানতে চাই।

ক্যারল দ্রুত বলল, ও তো মুসলমান। ওদের কাস্ট নেই।

অমনি লুইজি খোমেইনিকে নিয়ে পড়লেন এবং করুণ মুখে বললেন, কেন ওকে তোমরা এত পাত্তা দাও? লোকটা কে?

ক্যারল রাগ করে বলল, লুইজি! বোকামি করো না। ও ভারতীয়। বরং গ্যান্ডির ছেলের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা জিগ্যেস করতে পারো।

লুইজি বললেন, জানি। গ্যান্ডির ছেলেকে খুন করা হয়েছে।

বিন দাঁড়িয়ে দুলছিল। জড়ানো গলায় বলল, চলে এস লুইজি। আমার ভীষণ নাচ পেয়েছে। উডেন। লক্ষ্মী ছেলের মতো পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসো। শিগগির। দেরি করলে আমার মুড চলে যাবে।

উডেন জামাইয়ের কথা মেনে পিয়ানোতে বসলেন। বাজনা শুরু হল ফের। লুইজি বেড়ালের ডাক ডেকে জামাইয়ের পাশে গেলেন এবং তার কোমর ধরে নৃত্য শুরু করলেন। ক্যারল বলল, এস, আমরাও একটু নেচে নিই। তারপর কথা হবে।

ততদিনে এই নৃত্যকলায় আমি পারদর্শী হয়ে উঠেছি এবং সুযোগ পেলেই ছাড়ি না। নাচতে নাচতে ক্যারল চাপা স্বরে বলল, তোমাকে আমি একা পৌঁছে দিতে যাব। লেখার ব্যাপারটা নিয়ে নিরিবিলি তখন কথা হবে। লুইজি বড্ড ডিসটার্বিং, দেখছ তো? বিনও তাই। হেই। তুমি তো দারুণ নাচছ নাচের দলে ছিলে নাকি?

রহস্যময় হাসলাম। বলতে পারতাম, প্রথম যৌবনে ভারতের বাংলা মুল্লুক পাড়াগায়ে নেচেগেয়ে বেড়াতাম। তাতে খালি কথা বাড়ত।

লুইজি ও বিন নাচতে নাচতে পরস্পরকে ভেংচি কাটছিলেন। উডেন দু কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে গভীর আবেগে পিয়ানোর রিড টিপছিলেন। ক্যারল নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে সরে গিয়ে টেবিল থেকে পানীয় নিয়ে আসছিল। আমার জন্যও। কিন্তু এ রাতে আমি অতি মাত্রায় সতর্ক। মৃদু আপত্তি করাতে ক্যারল আমার গ্লাসের পানীয়টা নিজের গ্লাসে ঢেলে নিল। সময় উদ্দাম হয়ে উঠছিল ক্রমশ। কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি বেশি ঘনিষ্ঠতা, বিশেষ করে স্বামীর সামনে এবং যে কিনা মত্ত শ্বেতহস্তী—এখন নিরাপদ নয়। শাশুড়ি-জামাই তখন টলছেন। মাঝে মাঝে হুই হাই আওয়াজও দিচ্ছেন। এক সময় লক্ষ করলাম, ক্যারলের দশা বিগলিত। আমার ওপর টলে পড়ছে। এবং আমার কাঁধে মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেই আতঙ্কে বিনের দিকে তাকালাম। কিন্তু বিন আপন তালে মত্ত টলেটলে নাচছে। নাগাদের মতো হুই হুই করছে।

ক্যারলকে ঠেলে দিয়ে বললাম, ক্যারল! তুমি ড্রাংক হয়ে গেছ। বসে পড়ো। ক্যারল সোজা দাঁড়িয়ে বলল, কক্ষণো না। তুমি কি ক্লান্ত?

তা বলতে পারো।

ও! দ্যাট ব্লাডি গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন! বলে ক্যারল ব্যস্ত হয়ে উঠল। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিন ও লুইজির সামনে গিয়ে বললাম, আমি যাচ্ছি। বিন গ্রাহ্য করল না।

লুইজি নাচের মধ্যেই আমার গালে চটাস করে চুমু দিলেন। উডেন বাজাতে বাজাতে হাসি মুখে বললেন, শুভ রাত্রি। সুনিদ্রা হোক। ক্যারল বাপের গালে চুমু দিয়ে বাই বলে সোজা বেরুল।

বাইরে কুয়াশা এবং হিম। ভয়ে ভয়ে বললাম, ক্যারল। তুমি ঠিক আছ তো?

ক্যারল বলল, আই অ্যাম অলরাইট। ডোন্ট ওরি। অ্যাকসিডেন্ট করলে আমি বুঝি বেঁচে থাকব? আমি ভীষণভাবে বেঁচে থাকতে চাই—ভয়ঙ্করভাবে।

র‍্যামাডাইনেব দিকে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে সে হঠাৎ বলল, তোমার ঘরে ড্রিংক আছে তো?

না। আবার খাবে নাকি?

আমার গলা ভেজেনি।...বলে সে নড়ে উঠল।...ওদের বার এগারোটা অবধি খোলা থাকে। ভেবো না আই হ্যাভ সাম ম্যানি।

র‍্যামাডাইনের বার থেকে লাউঞ্জে এসে ক্যারল জড়ানো গলায় বলল, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তারপর আমার কাঁধে ঝুঁকে পড়ল। উচ্চতায় আমার সমান সে· আমাব মতোই রোগাটে। হালকা। কিন্তু কথা হচ্ছে, মাতাল পরস্ত্রীকে নিয়ে এই মধ্য রাতে বিদেশবিভুঁয়ে বড্ড বিপদে পড়া গেল দেখছি।

একতলা এই সরাইখানার কোণার দিকে আমার ঘর। ভাবলাম, বিনকে ফোন করব। বউকে নিয়ে যাবে। রিসেপশন থেকে সুন্দরী মেয়েটি একটু হেসে বলল, ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার? নিশ্চয় ভেবেছে, গার্ল ফ্রেণ্ড 'পিক আপ' করেছি কোত্থেকে।

ওকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্যারলকে নিয়ে এগোলাম। ঘরে ঢুকে সে ধপাস করে, বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই। ওদের ফোন নম্বর টোকা ছিল নোটবইতে। উডেনের নম্বরও। প্রথমে বিনের বাড়িতে ফোন করলাম। কোনো সাড়া এল না। তখন উডেনকে ফোন করলাম। উডেন সব শুনে শুধু বললেন ক্যারল কি ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ। ও ভীষণ ড্রাংক।

ওকে ঘুমোতে দাও। বলে ফোন ছেড়ে দিলেন উডেন।

এ কি অদ্ভুত লোক রে বাবা। কোণে চেয়ারে বসে সিগারেটের পর সিগারেট পোড়াচ্ছি আর ভাবছি। কতক্ষণ পরে দরজায় কেউ নক করল। তা হলে নিশ্চয় উডেন এসেছেন মেয়েকে নিতে। হাজার হলেও বাপের মন। নির্দ্বিধায় দরজা খুলতেই প্রকাণ্ড সোনালী হাতির মতো বিন ঢুকে বলল, ক্যারল কোথায়?

কাঁপা কাঁপা গলায় সভয়ে বললাম, ওই তো।

বিন লাল চোখ কটমটিয়ে বলল, হ্যাভ ইউ টাচ্‌ড হার?

রাগের চেষ্টা করে বললাম, কক্ষনো না। আমরা ভারতীয়রা পরনারীকে মাতৃ তুল্য জ্ঞান করি, জানো?

বিন ফিক করে হেসে ক্যারলের পাশে গড়িয়ে পড়ল। তারপর তারও সাড়াশব্দ নেই। একটু পরে তার নাক ডাকা শুরু হল। অসহায় দশায় বসে রইলাম। তারপর বুদ্ধি এল মাথায়। জর্জকে ফোন করলাম। জর্জ নিশ্চয় জেগেই ছিল। বলল, এনিথিং রং? তারপর ব্যাপারটা শুনে নিয়ে নিরাসক্তভাবে বলল, ঠিক আছে। তুমি মেঝের কার্পেটে শুয়ে পড়। র‍্যামাডাইনের কার্পেট খুব মে লায়েম। ওকে! গুড নাইট। হ্যাভ এ নাইস স্লিপ।

ঘুম ভেঙে দেখি, আমি কার্পেটে শুয়ে আছি। কিন্তু মাথায় বালিশ আর গায়ে এই বেডকভার এল কীভাবে? এবং ঘরে আর কেউ নেই। ঘড়িতে সময় সাড়ে নটা। বাথরুম সেরে কাফেতে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করে এলাম। তারপর ক্যারলের ফোন পেলাম।...রাতের ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু একটা সত্যি কথা জানতে চাই।

বলো।

আমার ধারণা, আমার পাশে তুমি শুয়েছিলে।...

মোটেও না। তোমার স্বামী ছিল তোমার পাশে।

কে? বিন? অসম্ভব।

জিগ্যেস করো বিনকে। রাত বারোটায় বিন এসে তোমার পাশে শুয়ে পড়ল।

শাট আপ! ঘুম ভেঙে বিনকে দেখিনি।

কিন্তু আমাকে কার্পেটে শুয়ে থাকতে দেখেছিলে। ঠিক কি না?

ওটা তোমার চালাকি।

ক্যারল, তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ?

সরি। কেন তা ভাবছ? বলে ক্যারল চুপ করে গেল।

ক্যারল! আর ইউ দেয়ার? হাই ক্যারল। শুনতে পাচ্ছ?

আমি খুব দুঃখিত।...ওর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল।

কী ভাবছ? এনিথিং ওয়াজ রং ইন দি লাস্ট নাইট?

নাঃ। আই ডোন্ট কেয়ার হোয়েদার রং অর রাইট। কিন্তু বিন এখন কোথায় থাকতে পারে বলো তো?

তোমার বাপের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খেতে গেছে দেখ গে!

ঠিক তাই-ই। লুইজি একটা ডাইনী। আচ্ছা, ছাড়ছি। বাই! ক্যারলের কণ্ঠস্বর করুণ শোনাচ্ছিল। ফোন ছেড়ে দেবার শব্দ হল। আমি গোছগাছ শুরু করলাম। বারোটায় ফ্লাইট। এবার যাব ডেনভার। বরফঢাকা কলরাডো রাজ্যের রকি মাউন্টেন এলাকায়। কিন্তু ক্যারলের জন্য মনের ভেতর এক দুঃখের কাঁটা বিঁধে রইল। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে কেনা রেড ইণ্ডিয়ান মালাটা ওর জন্যেই কিনেছিলাম। দেবার সুযোগ পেলাম না।

সন্নিক্ষণ

সুবোধ ভট্টাচার্য

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। ইভা দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে। সে যেন শুনতে পাচ্ছে অনেক দূরের ডাক। এ ডাকের অর্থ ইভা জানে। তার সারা শরীরে এক অদ্ভুত অবসাদ। বুকে তলপেটে যেন বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। তবু ইভা ঠায় বসে থাকে একভাবে। মেপে মেপে ছোট ছোট শ্বাস নেয় সে। জোরে শ্বাস নিতেও তার ভয় যদি শরীরের ভার বেড়ে যায়।

সন্দীপের সাথে ওর বিয়ের বয়স ছয় পেরিয়ে গেছে। বিয়ের আগে হৃদয় জাগানো দিনগুলোর কথা ধরলে মনে হয় প্রায় এক যুগ সন্দীপ ওকে কিম্বা ও সন্দীপকে ধরে রেখেছে। ওসব এখন ছাড় দেওয়া বাতিল ইতিহাস। সরে যাওয়া পুরোনো দিন পুরোনো ঘটনা। তবু মনের মধ্যে কোথাও হানা দিয়ে যায় মাঝে মাঝে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ডিঙুতেই লক্ষ্মীকান্তপুরের স্কুলের চাকরি। জীবনের প্রথম দরখাস্তে চাকরি পেয়ে ভেবেছিলো—কি ভাগ্য ওর। সন্দীপ বলেছিলো—এ যে ভাবাই যায় না। আসলে প্রেমের সাফল্যেই সুফল ঘটছে।

চাপা আনন্দে ইভার ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, নাকছাবির পাথরে বিন্দু বিন্দু আলোর কণা ঠিকরে ওঠে। প্রথম প্রেমের সেসব দৃশ্য যেন ওর চোখের পাতায় এখনো লেগে রয়েছে।

কিন্তু চাকরি, বিয়ে আর বাচ্চার তড়িঘড়ি আসা একসাথে ঘটায় ওর মন অস্থির হয়ে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছিল চাকরির পাট চোকানোর সময় এসে গেছে। একা ঘরে সবদিক সামলে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে চাকরি ও বাচ্চা দু'দিক রাখা সম্ভব হবে না। সন্দীপ ওর সিদ্ধান্ত জেনে হতভম্ব হয়ে গেল। এ বাজারে চাকরি অনায়াসে পাওয়া এবং ছাড়া কি করে সম্ভব হতে পারে ও ভেবে পায় না। সন্দীপ মাঝারি আয়ের সরকারী কর্মচারী। ওর পক্ষে একা সংসার চালানো সোজা ব্যাপার নয়। ইভার চাকরিটাই তো ওকে বিয়ে করে সংসার পাততে উৎসাহ জুগিয়েছিল। আর আজ ইভা দায়িত্ব থেকে চুপচাপ সরে দাঁড়াতে চাইছে দেখে সন্দীপের ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। কেমন অসহায় একা একা লাগে ওর এ সময়।

তবু একবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলে—বড্ড বেশি এ্যাডভান্স চিন্তাভাবনা করে ফেলেছো দেখছি। আরো কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে যাও না। একান্তই না পারলে ছুটিছাঁটা নিয়ে নিও।

ইভা গোপন চাউনিতে সন্দীপকে দেখে নিয়ে সুন্দরভাবে কাঁপানো চুলের গোছা বুকে ধরে খুব আস্তে বলে—ছাড়তে কষ্ট হবে। কিন্তু রাখতে আরো বেশি কষ্ট। সেসব কথা ভেবেই আমি ঠিক করেছি। বাচ্চা বড় না হওয়া অব্দি আমি আর চাকরি করবো না।

—চাকরি কি হাতের মোয়া, যে তোমার ইচ্ছে মতন পাওয়া যাবে।

—এ নিয়ে রাগ রাগির কোন মানে হয় না। চেষ্টা করবো, যদি না পাওয়া যায় তো কি আর করা যাবে। সব মেয়েরা কি আর রোজগার করে পেট চালায়?

কথাটার মধ্যে দুরকম অর্থ করার সুযোগ থেকে যায়। ইভা জেনেশুনেই সেটা করেছে। সন্দীপ বুঝেও খোঁচাটা হজম করে যায়। তবু মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমি বড় দুর্বল ইভা। ওভাবে বলো না। আমার সাধ্যের ভিত্ যে কাঁচা তা তুমিও জানো। নইলে কষ্ট করে তোমাকে চাকরি করার কথা বলতাম না। আসলে এখনকার মেয়েরা মা হতে বড্ড ভয় পায়। ইভাও তাই রামের আগে রামায়ণ শোনাচ্ছে। সন্দীপ বোঝে। কিন্তু শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই বলে চুপ করে যায়।

বাচ্চা যে মানুষের এত প্রিয় হতে পারে ইভা ছেলের জন্মের পর যেন প্রথম সে কথাটা বুঝতে পারল। টাকা-পয়সা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোনকিছুই যেন তাকে টানতে পারে না। ঘুম খাওয়া বিশ্রাম ভুলে সব সময় ছেলের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে—যেন কতদিন সে মানুষের মুখ দেখেনি।

দেখতে দেখতে বাপ্পা পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে পড়ল। ইভা ছেলের চার বছর বয়েস অব্দি সিনেমা-থিয়েটার আনন্দ-ফুর্তি সব বাদ দিয়ে চোখ-কান বুজে ছেলেতেই মশগুল হয়ে ছিল। এতে নিজের শরীর অনিয়ম-অনিদ্রার ঘুণপোকা কেটে ছারখার করে দিচ্ছে সেদিকে কোন হুঁশ নেই। সন্দীপ অনেক বলেছে। ইভা কানে তোলে না ওর কথা। সন্দীপ এখন বলা ছেড়ে দিয়েছে। ভাবে, ইভা যদি এভাবে নিজে সুখী হয় তবে ওর আপত্তি কিসের? কোন সময় সন্দীপ হাসতে হাসতে ব প্পার বয়েস জিজ্ঞেস করে পুরোনো প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়। ইভা মুখ তুলে সাথে সাথে জবাব দেয়—মানুষের মন কোন প্রতিশ্রুতির ধার ধারে না। তবে এখন বাপ্পা একটু বড় হয়েছে, নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে পারে, তাই এবার চাকরির চেষ্টা করা যেতে পারে। তারপরই ইভা হেসে বলে—

বেশী টাকা মানে তো ভেতরটা ফাঁকা করে দেওয়া। কি দরকার বেশী টাকার। ওতে কি সুখ কেনা যাবে?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় সন্দীপ। গম্ভীর মুখেই ও বলে—.তামার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। তুমি আর পাঁচটা মেয়ের মত শুধু সংসার করবে এটা ভাবতে আমার কষ্ট হয় ইভা। তোমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। তুমি চেষ্টা করলে একট চাকরি পেতে পারো, এটা আমার বিশ্বাস। আমার মত লোকের একার আয়ে এ বাজারে সংসার চালানো যায় না। নিজের হাতেই তো তুমি খরচ করো। আমি আর নতুন করে কি বলবো। কথাগুলো খুব নম্রভাবে বলল সন্দীপ, যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছে। আর যখন বলছে খুব ধীরে বুকের মধ্যে একটা কষ্টের বোধ জাগছিল তার। ওর মনে হয় পৃথিবীতে কোন কোন সত্য মুখ ফুটে বলতে বুক ভেঙ্গে যায়।

—বাপ্পার জন্যই তো চাকরি ছেড়েছিলাম। এখন ও যখন বড় হয়ে গেছে, আর আমার কিসের চিন্তা। এবার আমি চাকরির জন্য ঠিক উঠেপড়ে লাগবো।

ইভার কথায় সন্দীপের বুকটা হাল্কা হয়ে যায়। ইভা চাকরি ছেড়ে দেওয়া থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘদিন ওর বুকের মধ্যে জমানো পাথর যেন সরে যেতে থাকে। ইভার সাথে মনের যোগাযোগের সেতুগুলো বড় বেশী নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল এ ক'বছরে। মনেপ্রাণে সন্দীপ চেয়েছিল ইভা আর ও দুজনে চাকরি-বাকরি করে মোটা ভাত-কাপড়ের চিন্তাভাবনার বাইরে একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবে।

কিন্তু হৃদয় পরিবর্তন তো দূরের কথা চাকরি ছাড়ার প্রসঙ্গ তুললেই ইভা চোখে শাসন ফুটিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় ঝাঁঝিয়ে বলত— সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি শুধু টাকাতেই হয়? কীসে মানুষ সত্যিকারের সুখী হয় আমাকে বলো তো? কোন মানুষ কি ঠিকঠাক সুখী হয়েছে কোনদিন?

ইভার কথায় সন্দীপ ভেতরে ভেতরে বড় ক্রুদ্ধ অধৈর্য বোধ করে। কিছু একটা বলতে যায়। কিন্তু কিছুই বলা হয়ে ওঠে না। শুধু তার দু ঠোঁট বেঁকে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সন্দীপ। খুব মেঘ করেছে আকাশে। কালো হয়ে পড়েছে আকাশটা। এখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাড়ীর পর বাড়ী ঢেউ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দু'কামরার এই ফ্ল্যাটটা কিস্তিবন্দীতে কিনতে কম মেহনত আর হুজ্জুতি পোয়াতে হয়নি ওকে। এখনো মাস মাস একগাদা টাকা জমা দিয়ে আসতে হয় হাউসিং বোর্ডে। অথচ ইভা দুনিয়ায় ছেলে ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না। এসব কথা হয়তো ভাবেও না কখনো। বুক ঠেলে একটা ভারী নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সন্দীপের।

এ ক'বছরে অনেক কথা ইভার মনে পড়ে। সন্দীপের চোখে ও একটা নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছু না। সব বুঝতে পারে ও।

পাতলা অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে ইভা উঠে দাঁড়ায়। একটা হাই ওঠে ওর। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতে একটা চাপা নরম আলোয় ঘর ভরে যায়।

বাপ্পা এখনো ঘরে আসেনি। পাশের ফ্লাটে চিন্তাহরণবাবুর বাচ্চাদের সাথে সারাদিন দৌড়ঝাঁপ খেলাধূলো করে কাটায়। কিছুতেই ওদের ঘর থেকে টেনে আনা যায় না। খেয়েদেয়েই আবার দে ছুট। চিন্তাহরণবাবুর অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা। বোঝা যায় পুরো ভগবানের ওপর নির্ভরশীল মানুষ। ওদের সাথে মিলে-মিশে বাপ্পা ভালোই থাকে। কিন্তু ওদের বাড়ীতে বাপ্পা থাক ওদের সাথে মিশুক ইভা চায় না। তাই ঘরে যাতে থাকে তার জন্য ইভা সব রকমের খেলনা পুতুল ওকে কিনে দিয়েছে। তবু বাপ্পা ছুটে ছুটে ওদের ঘরেই যাবে। কিছুতে আটকানো যায় না। কোন সময় জোর করে ওর হাতে পুতুল গুঁজে দিয়ে ইভা ঘরে বসে খেলতে বসলে বাপ্পা ভয়ে ভয়ে বলে—ওরা তো কোন কথা বলতে পারে না মা। ওর ভীতু চোখ চিন্তাহরণবাবুদের দরজায়। কতক্ষণে সে ওদের বাড়ী যাবে। ইভা বাপ্পাকে আটকাতে চেয়েও পারে না। হাত সরিয়ে নেয়।

সন্দীপের উৎসাহে ইভা অনেকগুলো জায়গায় পর পর দরখাস্ত করে যায়। পরীক্ষাও দেয় বেশ কয়েকটা। কিন্তু এই পর্যন্তই। ইন্টারভ্যু পায়নি একটাও। সন্দীপ খানিকটা হতাশ হয়ে বলে—কমপিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন দরকার। সংসার করে পরীক্ষায় বসলে এ রকমই হবে।

অনেকদিন পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দেওয়ায় ইভাও পরীক্ষায় বসে অস্বস্তিতে ভুগেছে। তাই ঠিকই করে ফেললো এবার আর আনকোরার মতন পরীক্ষায় বসবে না। পরীক্ষা দিলে সিরিয়াসলিই দেবে।

হঠাৎ এ. জি বেঙ্গলের প্যানেলে ওর নাম উঠে যাওয়ায় মনে একটা তাজা জীবন্তভাব ফিরে পেয়ে ইভা ভীষণ খুশী হল। শাওয়ার খুলে দিয়ে অঝোরে স্নান করলো অনেকক্ষণ ধরে। যেন ভরা মেঘের বৃষ্টিতে ভিজছে।

সন্ধ্যায় সন্দীপ ফিরতে স্থির ছবির মত সেজেগুজে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকল ইভা। তারপর সন্দীপের কাছে সরে এসে ওর বুকে আঙুল গুঁজে গুঁজে জামার বোতাম খুলে দেবার ফাঁকে খবরটা জানালো।

শ্রীহীন মধ্যবিত্ত সংসারে সন্দীপ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। একঘেয়ে অস্বস্তিকর জীবনে ইভার চাকরির সম্ভাবনা ওর চোখেমুখে নতুন আয়ত্তের আনন্দ জাগিয়ে দিল।

—আমি খুব খুশী হয়েছি ইভা।

—আগে দেখ হয় কি না।

—প্যানেলে নাম যখন উঠেছে ঠিকই হবে।

—তবু সরকারী ব্যাপার, দেখ কতদিনে হয়।

দুপুরে বাপ্পাকে নিয়ে ভাত-ঘুমের সময় ইভা প্রায়ই বলে—বাপ্পা, আমিও তোমার বাবার মতন এবার থেকে সকালে চলে যাবো।

—কোথায় যাবে মা?

—তোমার বাবা সকালে কোথায় যায়?

—অফিসে।

—আমিও অফিসে যাবো।

—সত্যি যাবে মা?

—হ্যাঁ বাবা, তুমি কিন্তু লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। একদম দুষ্টুমি করবে না।

ইভার কথা শেষ হতে না হতে বাপ্পা লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়।

—আমি কার কাছে থাকবো মা তুমি চলে গেলে? তুমি যাবে না মা, তুমি যাবে না। বাপ্পার গলা চড়ে যেতে থাকে।

—তুই না একটা বোকা ছেলে, ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ইভা বলে—মা না থাকলে কত মজা বল তো। সারাদিন তুই জ্যেঠুর ঘরে দাদা-দিদিদের সাথে খেলতে পারবি। কেউ বকবে না, মারবে না। যত ইচ্ছে খেলতে পারবি।

—বাবা বকবে না তো? বাপ্পা দাঁতে কেটে কথা বলে।

—নারে, কেউ বকবে না। বাবাও বকবে না, আমিও বকবো না।

—তবে তুমি বাবার সাথে অফিসে যাও মা। কান্নাভেজা চোখে ইভার গলা জড়িয়ে বাপ্পা গলে যায়।

ইভার ভেতরেও এক ধরনের কষ্ট আর সুখ মিলেমিশে যায়। সে যেন বাপ্পাকে আর কিছু বলতে পারে না, এমনভাবে দু-এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ছেলের মাথাটা আলগোছে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

একটা স্বপ্নময় আবহাওয়ায় দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ শরীরের মধ্যে একটা পুরোনো যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙতে ভীষণ একা নিঃসঙ্গবোধ করতে থাকে ইভা। এ অনুভূতিটা ওর জানা। বাপ্পা ওকে জানিয়ে দিয়েছিল। এখন ওর সমস্ত সত্তায় সেই রহস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

প্রথম বিস্ময় কেটে যেতে সন্দীপকে বলার জন্য উসখুস করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজ না কাল করে ওকে আর বলা হয়ে ওঠে না। একটা চাপা অস্বস্তিতে কুঁকড়ে থাকে ইভা। সারাদিন কেমন নিঝুম চুপচাপ পড়ে থাকে সে। তার এই নিটোল নারীত্ব কোন এক গোপন বিষাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

নিস্তব্ধ দুপুরে বুকের পাশে ঘুমন্ত ছেলে নিয়ে শুয়ে চোখ বোজে ইভা। কিন্তু ঘুম আসে না। মনে নানা চিন্তাভাবনা ভিড় করে আসে। ওর বুকের মধ্যে ঠিক কি যে ঘটে যাচ্ছে তা সন্দীপ বুঝবে না। সন্দীপ তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের জন্য দিন গুনে যাচ্ছে। প্রায়ই এ নিয়ে ওর সঙ্গে কত প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। অথচ তার এই কষ্ট যেন একান্তই নিজের।

বাপ্পার চুলের মধ্যে বারবার হাত চালাতে থাকে ইভা। বাপ্পার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুমচোখে মাকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে।

—তুই এখন বড় হয়ে গেছিস বাবা, এভাবে সবসময় মাকে জড়িয়ে ধরিস কেন? ছেলের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে ইভা বলে।

—আমার খিদে পেয়েছে মা।

—এইতো খেয়ে শুলি, ঘুম হতে না হতে আবার খিদে পেয়ে গেল? তারপর গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলল—বাপ্পা, তুই তো একদম ঘরে থাকতে চাস না আমি যদি তোকে একটা ভাই দি' তা হলে ওর সাথে ঘরে খেলবি?

—ভাই দেবে? কবে দেবে মা? বল না, আমি আর ভাই খেলবো। কি মজা হবে। বলেই বাপ্পা আনন্দে আরো জোরে ইভাকে চেপে ধরে।

নিজের দুঃখটাকে গোপন করতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে ইভা। বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে আসে। একটা কান্না যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু একফোঁটা জল সে চোখ থেকে ফেলে না।

সন্দীপের চিন্তাটা মাথার মধ্যে অহর্নিশ হেঁটে-চলে বেড়ায়। সন্দীপ এবার কিছুতে ওর চাকরি নষ্ট করতে দেবে না। এর জন্য প্রয়োজন হলে বাপ্পার ভাইয়ের পথ আগলিয়ে দাঁড়াবে। ইভার এ চাকরির সব হুজ্জুতি সন্দীপ পুইয়েছে। এখন কোন কথা সে শুনতে চাইবে না। ইভা এটা ভালো করে জানে। তাই সন্দীপকে কথাটা বলতে ওর বুক কাঁপছে। দু-একবার চেষ্টা করে দেখেছে। কিন্তু বলার মুহূর্তে বুকের ঢিপঢিপ শব্দে বলতে গিয়ে থেমে গেছে। একটা চাপা দমবন্ধ অবস্থায় ও যেন শেষ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে দুর্গম সরু পাহাড়ী পথ ধরে ও হেঁটে যাচ্ছে অন্ধের মত, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে দু'পাশের হাঁকরা গভীর খাদে।

পলকের জন্য জানলায় মুখ ফেরায় ইভা। [illegible]

গাছপালা ঝলসে যাচ্ছে। বাস ট্রাম গাড়ীঘোড়ার শব্দ দুপুরের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিচ্ছে। কর্কশ শব্দের জটলা ছাপিয়ে বাপ্পার কথা ছাড়া অন্য কোন শব্দ তাকে ছুঁতে পারে না। একটা নিরাসক্ত নির্বিকার অবস্থা ইভার শরীরটাকে শিথিল করে দেয়। ওর মনে হয় ও পারবে না, কিছুতেই পারবে না বাপ্পার ভাইকে দূরে ঠেলে দিতে। বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে ইভার। সন্দীপকে বলবে ভাবতে গিয়ে আবার ভয় পায়। একটা হেস্তনেস্ত করার ইচ্ছা শানিয়ে উঠবার আগেই ইচ্ছাটাকে পাশ কাটিয়ে ইভা ভাবতে থাকে যেমন করে একদিন ওকে আবিষ্কার করেছিল সন্দীপ তেমনি করেই না হয় আর এবার ইভার মধ্যে নিজের সন্তানকে সে আবিষ্কার করুক। একটা দুরন্ত দামাল ছেলে অথবা রিনরিনে গলার মিষ্টি মেয়ে এসে ওকে অবাক করে দিক না! কথাটা মনে হতে ইভার মধ্যে এক ধরনের রোমাঞ্চকর অনুভূতি খেলে যায়।

বাইরের এসময় সন্ধ্যে নামছে। একটা মায়াময় পরিবেশের মধ্যে দৃষ্টি ফেলে রেখে ইভাও খানিকটা মায়াবী হয়ে বসে থাকে জানালায়। কারো অপেক্ষায়। সন্দীপ না তার সন্তান—নাকি দুজনেরই জন্য।

ইতিহাসের মানুষ

তপোবিজয় ঘোষ

এক

আমার বাবা মানুষ খুন করেছিল বলে আমাকে সবাই খুনীর ছেলে বলত। কখনো সামনে বলত, কখনো আড়ালে। ফলে চেষ্টা করেও বিষয়টা আমার কাছে গোপন রাখা যায় নি। একটু বড় হয়ে আমি সবই জেনেছিলাম।

খুনের দায়ে বেলতলি গাঁয়ের অনেকেই ধরা পড়েছিল। সদর থেকে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছিল গ্রাম। বাবা ছিল মূল আসামী। বাবার বারো বছর জেল হয়েছিল। আরো অনেকের দু'তিন বছর সাজা হয়েছিল।

আট বছর জেল খাটার পর বাবা জেলের হাসপাতালেই মারা গেল। আমার তখন তেরো বছর বয়স। বাবাকে দেখার জন্য কেউ আমাকে কলকাতা নিয়ে যায় নি। বড়মামা চুপি-চুপি আমাকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করিয়েছিল। বড়মামী চাপা-গলায় শাসানোর ভঙ্গীতে বলেছিল, 'কেন ন্যাড়া হলি কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি চুলের মানসিক ছিল। ঘটা করে বাপ-মরার কথা বলতে যাবি নে।'

মা ছিল খুনীর বউ। বাবা মরে গেছে শুনেও চিৎকার করে কাঁদতে পারে নি। পাথরের মত ঠাণ্ডা শক্ত মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি বড়মামাকে শুধু চোখের জল ফেলতে দেখেছিলাম। বড়মামী টের পেয়ে তাকে ধমকে বলেছিল, 'বুড়ো বয়সে ঢং। দোকানপাট ফেলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন!'

শুনে মামা কিছু না খেয়ে রাগ করে দোকানে চলে গিয়েছিল।

মানুষ খুন করেছিল বলে বাবাকে নিয়ে আমাদের সকলেরই খুব লজ্জা ছিল।

দুই

বাবা কেন মানুষ খুন করেছিল আমি জানতাম না। কেউ আমাকে বলেনি। বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ক'দিন পরেই বড়মামা গাঁ থেকে আমাদের তুলে নিয়ে এসেছিল। মা ছিল মামাদের ছোট বোন। আর কোনো বোন ছিল না বলে খুব আদরের ছিল। বড়মামাই খরচপাতি করে মা'র বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের সাত বছর পরে বাবা মল্লিকবাড়ির মথুর মল্লিককে খুন করেছিল। মল্লিকেরা গাঁয়ের জমিদার ছিল। মথুর মল্লিক ছিল বড়তরফের বড়ছেলে।

বাবা কেন মথুরকে খুন করেছিল আমি মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। মা কেমন গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'এসব কথা তোকে কে বলেছে?'

আমি ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'কেন, বড়মামী যে ঝগড়া করতে করতে সেদিন তোকে বলল খুনীর বউ—'

মা তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'চুপ কর খোকা। মামী শুনতে পেলে রাগ করবে।'

তারপর একটু থেমে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল,* 'ওসব কথা এখন কাউকে কিছু শুধুসনে। বড় হলে আপনি জানতে পারবি।'

তবু আমি জিদ করে বলেছিলাম, 'না, এখুনি শুনব।'

মা রাগ করে আমাকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, 'তবে তোর বড়মামাকে শুধো গে, আমি কিছু জানি না।'

বড়মামাকে আমি খুব ভয় করতাম। বয়সে সে বাবার চেয়ে অনেক বড় ছিল। মাকে তার মেয়ে মনে হত। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হত না।

তিন

আমার বড়মামী খুব কুঁচুটে ছিল।

মা অবশ্য চুপিচুপি বলত, 'ছিটেল, মাথায় ছিট ধরেছে। ছেলেপুলে হয়ে বাঁচে নি তো, তাই। মামীর মুখে মুখে একদম কথা বলবি নে খোকা, কেটে ফেলবে!'

বড়মামীর কালো মোটা শরীর। গোল গোল চোখ। মিশি-ঘষা কালো কালো দাঁত। হাতে গলায় কোমরে তাবিজ মাদুলি, ফুটো করে বাঁধা তামার পয়সা, রুদ্রাক্ষের মালা। কার কাছে কি যেন মন্ত্র নিয়েছিল, দিনে রাতে কতবার যে পুকুরে ডুব দিতে যেত আর ফিরে এসে ভিজে গামছা জড়িয়ে উঠোনে তুলসী-তলায় জোড়হাতে চোখ বুজে মুখ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত – তার হিসেব ছিল না।

আসলে ছুঁচিবাই রোগে ধরেছিল তাকে। দিনরাত ঝাঁটা-হাতে ঘর-উঠোন ধোয়া, গোবর লেপা, কাঁথা-কাপড় কাচাকুচি—এসব নিয়েই তার দিন কাটত। ঘর-সংসারের সব কাজ করতে হত মাকে। রান্নাবান্না, চাল চিঁড়ে মুড়ি ভাজা, গরু হাঁসের যত্ন নেওয়া, খড়ীবিচালি কাটা—কত রকম কাজ যে ছিল মা'র। একেকদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম মা'র তখনও খাওয়াই হয় নি।

রোগা পাতলা শরীর মা'র। ফর্সা মুখ, একপিঠ রুক্ষু উড়ু উড়ু চুল। গরমের সময় মৌমাছির চাকের মত ঘাড়ে গলায় ঘামাচির চাক বেঁধে উঠত। বর্ষার সময় হাতে-পায়ে হাজা-ঘা সাদা দগদগে দেখাত। শীতকালে খড়ি উঠত গা দিয়ে আর

ঠোঁটের দু'পাশ কেটে রক্ত গড়াত। মাকে দেখলে সবসময় আমার বুকের মধ্যে কি রকম একটা কষ্ট ঠেলে উঠত। মনে হত বাবার সঙ্গে সঙ্গে মা-ও কয়েদী হয়ে জেলের মধ্যে পাথর ভাঙছে, ঘানি টানছে। আর বড়মামীটা যেন লালচোখো সিপাই, পেছনে রুল হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

একেকদিন স্কুল থেকে ফিরে রাগ করে বলতাম, 'তুই এখনো চান করিস নি কেন মা? ভাত খাস নি কেন?'

মা বলত, 'গুড় জ্বাল বসিয়েছি যে! ছেড়ে যাই কি করে। পাক নষ্ট হবে।'

আমি বলতাম, 'অবেলায় অত গুড় নিয়ে বসলি কেন?'

মা বলত, 'বারে, পরশু যে চড়কের মেলা! কত মাল লাগবে দোকানে। তুই চিঁড়েভাজা খাবি খোকা? ওই দেখ, ভেজে রেখেছি—'

মস্ত বড বেতের ধামায় ভাজা চিঁড়ে ডাঁই করা। চড়কের মোয়া তৈরী হবে। গঞ্জের হাটতলায় বড়মামার মোয়া-বাতাসা-কদমার দোকান। তেল-মশলাও বিক্রি হয়। দোকানের অনেক জিনিস ঘরে তৈরী করতে হয় মাকে। মেলাপার্বণে বাঁধা বরাদ্দের উপর আরো বেশি মাল তৈরী হয়। তখন মার নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না।

বড়মামী পুকুরে ডুব দিতে গেলে কিংবা হাটতলার কাছে শিবমন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে গেলে মা আমাকে টিন থেকে লাল-হলুদ রঙের চিনির মঠ কিংবা গুড়বাদামের তক্তি দিয়ে বলত, 'ওই আমতলায় দাঁড়িয়ে খেয়ে নে গে খোকা। মুখ ধুয়ে ঘরে আসবি।'

আসলে বড়মামীকে মা খুব ভয় করত। মাকে সে দেখতে পারত না মোটেই। সবসময় মা'র দোষ ধরার জন্য সজাগ থাকত। পান থেকে চুণ খসলেই ঝগড়া বাধিয়ে বসত। ঝগড়ার সময় কত কি বলে যে মুখ করত। ঘরজ্বালানী মরণদশী, লক্ষ্মীছাড়ী—এসব তো বলতই, সেই সঙ্গে মা'র কপালদোষেই বাবা যে খুনী হয়ে জেল খাটছে, মা যে ভাতারখাগী, ঘরবাড়ি স্বামী খেয়ে এখন বড়মামার সংসার লুটেপুটে শ্মশান বানাতে এসেছে—এসব কথাও বলত। মা কিছু উত্তর দিত না, শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে রাখত।

দোকানের জন্য তৈরী কোনো জিনিস আমাকে দেওয়া বারণ ছিল। মা তবু দিত। টের পেলে মামী গালমন্দ করত। আগেভাগে আমি কিছু খেলে সব নাকি এঁটো হয়ে যেত। এঁটো মাল দোকানে নিলে দোকানে নাকি শনির দৃষ্টি পড়ার ভয় জন্মাত। লক্ষ্মী পালিয়ে যাওয়ার যোগাড় হত।

বড়মামা শুনতে পেলে মামীর উপর রাগ করে বলত, 'আহা, বাইরের কেউ তো

খায় নি। ঘরের ছেলেই তো—'

মামী গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে বলত, 'ঘরের ছেলে না, বনের সাপ। যেদিন ফণা তুলবে সেদিন বুঝবে।'

বড়মামা বলত, 'আ, থাম দেখি তুমি—'

মামী আরো জোরে চেঁচিয়ে বলত, 'থামব কেন? কার ভয়ে থামব? ওই একরত্তি ছোঁড়া, নাক টিপলে দুধ গড়ায়, বলে কিনা আমার মা কষ্ট করে বানিয়েছে, আমি খেয়েছি—বেশ করেছি। শুনলে কথা? মা-ছেলেতে মিলে ষড় করেছে গো—'

বড়মামা কটমট করে আমার দিকে তাকাতেই মা তাড়াতাড়ি বলত, 'না দাদা ওরকম করে বলে নি।'

বড়মামী ভেংচি কেটে বলত, 'তবে কিরকম করে বলেছে লা? মধু ঢেলে, না চিনি মাখিয়ে? যেমন ছা তেমন মা। সব শেয়ালের এক রা—'

তারপর একটু থেমে হঠাৎ বলে বসত, 'আমার হাড় জ্বালাতে খুনীর বংশ ঢুকেছে ঘরে। বুঝবে। পরে বুঝবে।

বড়মামা চেঁচিয়ে ধমকে উঠত, 'তুমি চুপ করবে কি না?'

আমি দেখতাম, মা'র সমস্ত মুখ কেমন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যেত। রোগা শরীর কাঁপত থরথর করে। চোখ বুজে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে কেমন অজ্ঞানের মত হয়ে থাকত। আর আমার মনের মধ্যে রাগ গর্‌গর্‌ করত। যেন কালোবঙের একটা সাপ সত্যি সত্যি ফণা তুলে দুলতে থাকত বুকের মধ্যে—আর কোথাও ছোবল বসানোর জন্য ছটফট করত। আমি যেন সত্যি বনের সাপ হয়ে যেতাম।

চার

স্কুলের ছেলেরা সবাই না জানলেও অনেকেই জানত আমি খুনীর ছেলে, আমার বাবা মানুষ খুন করেছিল। যারা জানত তারা আমার দিকে চোখ বড় করে কেমন অদ্ভুত ভয়-ভয় দৃষ্টি মেলে তাকাত। আঙুল উঁচিয়ে কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি যেন বলত। আমি সব বুঝতে পারতাম। লজ্জায় অপমানে আমার শরীর কুঁকড়ে যেত। মাথাটা নুয়ে পড়ত। চোখ ফেটে জল আসতে চাইত। কিন্তু মনের মধ্যে চাপা রাগটা হিস্‌হিস্‌ করত।

একদিন একক্লাস-উঁচুতে-পড়া ঢ্যাঙামত একটা ছেলে আমার জামা টেনে ধরে বলেছিল, 'এই, তোর বাবার নাম কি রে?'

আমি কেঁপে উঠে মুখ কালো করে বলেছিলাম, 'আমার বাবা নেই। বড়মামার কাছে থাকি। আমার মামা—'

ছেলেটা বলেছিল, 'বেলতলি গাঁয়ে তোদের বাড়ি ছিল না?'

'ছিল।'

'আর যাস না?'

'না।'

'কেন যাস না?'

'জানি না।'

ঢ্যাঙামতো ছেলেটা দাঁত বের করে হাসির মতো ভঙ্গি করে বলেছিল, 'জানিস না? ভারি সেয়ানা তো! আমি জানি, তোর বাবা মানুষ খুন করেছিল।'

তার কথা শুনে আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল খুব। ঘাড় মাথা উঁচিয়ে বলে উঠেছিলাম, 'করেছিল বেশ করেছিল। তোর বাবার কি।'

বাপ্ তোলায় সে ভীষণ রেগে গিয়ে ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলেছিল, 'বেলতলির মল্লিকবাড়ীতে আমার মেজদির বিয়ে হয়েছে। আমি সব শুনে এসেছি। শালা খুনীর বাচ্চা কোথাকার—'

চড় খেয়ে আমি রাগে ফুলছিলাম। তারপর ওই কথাটা শোনামাত্র আমার কি যেন হয়েছিল। হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম ওর উপর। বোবার মত গোঁ গোঁ শব্দ তুলে জামাটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম, হাতের ডানায় কামড় বসিয়ে মাংস তুলে নিতে চেয়েছিলাম ··

গোলমাল শুনে ছাত্ররা জড়ো হয়েছিল। টিচার্সরুম থেকে মাস্টারেরা ছুটে এসেছিল। মল্লিকবাড়ির ছোটতরফের ইতিহাসের মাস্টার ঝাঁপিয়ে এসে শক্ত করে আমার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল বড়মাস্টারের ঘরে। তার মুখে সব কথা শুনে বড়মাস্টার বেত দিয়ে সপাং-সপাং মারতে শুরু করেছিল। সরু লিকলিকে বেত লোহার মত শক্ত। আমার বুকে পিঠে দাগ বসে গিয়েছিল। হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করায় আঙুল কেটে রক্ত চুঁইয়ে নামছিল।

কিন্তু আমি একটুও কাঁদি নি। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে-থাকা মা'র মুখটা আমার মনে পড়ছিল। মার মত আমিও শরীরটাকে শক্ত করে তুলেছিলাম।

শুধু দুঃখেঅপমানে লজ্জায় আমার চোখদুটো ফেটে যেতে চাইছিল। কচি বুকের হাড়পাঁজর কামারশালার হাপরের মত উঠানামা করছিল। আর বুকের মধ্যে একটা সাপ সরু চেরা জিব বের করে ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছিল।

হেডমাস্টার বেত থামিয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কি সাংঘাতিক ছেলে। বড় হয়ে দেখছি তুইও মানুষ খুন করবি!'

পাঁচ

পরের দিন হেড্‌মাস্টার স্কুলের দারোয়ান দিয়ে বড়মামাকে ডেকে পাঠাল। বড়মামা হাটতলার দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে ছুটে এসে সব শুনে একরকম পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তাড়িয়ে দেবেন না মাষ্টারবাবু। এবারটি মাপ করুন। আমি ওকে ঠাণ্ডা করছি।'

এর আগে বড়মামা আমাকে আর কখনো মারে নি। সেদিন রাত্রে এসে খুব মারল। বড়মামী চিৎকার করতে লাগল, 'বলিনি তোমাকে? এ ছেলে যেমন তেমন নয়! খুনী বাপের রক্ত আছে শরীরে। আজ দাঁত বসাচ্ছে, কাল ছুরি বসাবে! পাপ বিদেয় কর।'

মা কিছু বলল না। মরা মাছের চোখ নিয়ে দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটুপরে রান্নার চালাঘর থেকে কিসের একটা পোড়া গন্ধ উঠে ঘরদরজা ভরে যেতে সেদিকে ছুটে যাওয়ার সময় মা হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল।

আমি গা-হাত-পায়ের কষ্ট ভুলে গিয়ে বড়মামীকে এক-রকম ঠেলে সরিয়ে মা'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরে চাপা ব্যাকুল গলায় ডাকলাম, 'মা, এই মাআআ—'

বড়মামা তাড়াতাড়ি কুয়োতলা থেকে জল এনে মা'র মুখে-চোখে-মাথায়-কপালে ঝাপটা দিতে লাগল। শাড়ির আঁচলটা মা'র গলায় ফাঁসের মত জড়িয়ে গিয়েছিল, আমি টেনে সরিয়ে দিলাম।

বড়মামা বলল, 'তাড়াতাড়ি একটা লঙ্কা পুড়িয়ে আন, নাকের কাছে ধরতে হবে।'

'ঢং! আমি এখন হেঁসেলে ঢুকে রাতদুপুরে নাইতে যাই!' বলে বড়মামী মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে কুপীর আগুনে লঙ্কা পুড়িয়ে আনলাম।

জ্ঞান হতেই মা আমাকে মুখের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'সরে যা তুই। সরে যা। আমায় ছুঁস নে!'

...অনেক রাতে মা'র চোখের জল টপটপ করে আমার বুকের উপর পড়তে

ব্যাপার। আমি ঘুমোই নি, চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। মাকে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে আমি অন্ধকারেই ছটফট করে উঠে বসলাম। তারপর মা'র রোগা হাতদুটো তুলে মুখে ঘষতে ঘষতে আমিও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এর আগে বড়মামার মার খেয়েও আমি কাঁদি নি

ছয়

স্কুলে সেই ঘটনার পর থেকে ছাত্রমাষ্টার সকলেই জেনে গিয়েছিল, আমার বাবা মল্লিকবাড়ির মথুর মল্লিককে খুন করেছিল। সেই ঢ্যাঙা ছেলেটা, যার হাত কামড়ে দিয়েছিলাম, অনেক বাড়িয়ে-রাঙিয়ে সে এসব কথা প্রচার করেছিল। আমার বাবা নাকি মাথায় লাঠি বসিয়ে মাটিতে ফেলে কাস্তে দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল মথুর মল্লিককে। তারপর মদে চুরচুর হয়ে কাটাহাত শূন্যে তুলে মল্লিকদের বাঁধানো পুকুরঘাটে নাচানাচি করেছিল। পুলিশ এসে যখন ধরে নিয়ে গেল তখনও নাকি বাবার হাতে-পায়ে মথুর মল্লিকের লালরক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে ছিল। সেই রক্তের ডাক্তারী পরীক্ষাতেই নাকি আদালতে প্রমাণ হয়ে যায়—বাবাই খুনী!

স্কুলের ছেলেরা আমাকে দেখলেই কেমন চমকে উঠত। আমার পাশে কেউ বসতে চাইত না। দূর থেকে আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাত। ভয় ভাবনা করুণা আতঙ্কে মেশানো অবজ্ঞার দৃষ্টি। সাপুড়ের ঝাঁপির দিকে মানুষ যেমন তাকায় তেমনি। যেন খুনী-বাপের ছেলে হয়ে আমি আমার বুকের খাঁচায় একটা বিষাক্ত সাপ বয়ে বেড়াচ্ছি। কেউ একটু উত্যক্ত করলেই ঝাঁপির মুখটা খুলে দেব।

পড়াশুনায় আমি ভাল ছিলাম। বিশেষ করে অঙ্কে আমার মাথা ছিল খুব। নয়ের কোঠায় নম্বর পেতাম। অঙ্কের মাষ্টার ভালবাসত। যত্ন করে খাতা দেখে অঙ্ক বুঝিয়ে দিত। কিন্তু সেই ঘটনার পর কেমন বিগড়ে গেল। একদিন একটা অঙ্ক ভুল হওয়ায় বুঝিয়ে দিল না। খাতাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর আর কিছু হবে না। তোর সব কিছু জট পাকিয়ে গেছে।'

আমি অস্পষ্টভাবে বুঝতাম, খাতায় নয়, জীবনের সব অঙ্কই আমার জট পাকিয়ে যেতে বসেছে। শুধরানোর পথ নেই। না-হলে মানুষ হয়ে আমি কুকুরের মত মানুষের মাংসে কামড় বসাব কেন।

মল্লিকবাড়ির ছোটতরফের ইতিহাসের মাষ্টার আমাকে আর সামনের বেঞ্চিতে বসতে দিত না। ক্লাসে ঢুকেই বলত, 'ওই ওদিকটায় যা। একটু দূরে-দূরে থাক। তোকে দেখলেই আমার বুক ঢিব ঢিব করে। সাল তারিখ ভুলে যাই।'

আমি জলজলে চোখে তার দিকে তাকালে ভেংচি কাটার মত বলত, '...কামড়ে দিবি নাকি? দেখিস বাবা—'

স্কুলে আমার সঙ্গে আর কেউ খেলত না। কেউ আমার বন্ধু ছিল না। শুধু তিন ক্রোশ দূরের বেলতালির লাগোয়া-গাঁ কাবিলপুরের মুসলমানদের ছেলে সাজ্জাদ নিজে এসে কথা বলত। খেলতে চাইত। কিন্তু মুসলমান বলেই আমি তাকে এড়িয়ে চলতাম। হিন্দু ছেলের কি মুসলমান বন্ধু হয়। আমার বড়মামা একবার মুসলমান ঘরামি এনে ঘর ছাইয়েছিল বলে বড়মামী চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছিল। তারপর কার বাড়ী থেকে যেন একশিশি গঙ্গাজল চেয়ে এনে এক বালতি কুয়োর জলে মিশিয়ে বাটি ভরে খড়ের চালায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে শুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু আমি না চাইলেও সাজ্জাদ আমার সঙ্গে মেশার খুব চেষ্টা করত।

একদিন বাড়ি ফেরার পথে সে আমার হাত ধরে চুপি চুপি বলেছিল, 'মোহনভাই, মনে কষ্ট রেখো না। তোমার বাবা খারাপ আদমি ছিল না। আমাদের বাড়ির সবাই চিনত তাকে।'

সাজ্জাদের হাতধরা আমি পছন্দ করিনি। হাত ছাড়িয়ে একটু তফাতে সরে গিয়ে বলেছিলাম, 'কী করে চিনত?'

সাজ্জাদ বলেছিল, 'আমি সব জানি না, বাবা জানে।' তারপর পথের মধ্যেই থেমে পড়ে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কালো মুখ কঠিন করে তীব্র চাপাগলায় বলে উঠেছিল, 'মল্লিকবাড়ির মথুরশালা একনম্বর হারামি ছিল। ও-বাড়ির সবশালাই হারামি! মথুরশালা আমার চাচাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চোরা-কুঠুরীতে খুন করেছিল!'

শোনামাত্র আমি প্রবলভাবে চমকে উঠেছিলাম। আমার দম বন্ধ হয়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম, আমার অজান্তেই, আমার রক্তের মধ্যে ভাঁটির টানে উজানের স্রোত বইতে শুরু করেছিল। আমি অস্থির ভঙ্গিতে সাজ্জাদের খড়ি-পরা কালো হাত চেপে ধরে বলেছিলাম, 'তোমার চাচাকে কেন খুন করেছিল, আমাকে বল।'

সাজ্জাদ বলেছিল, 'আমি সব জানি না। বাবা জানে।'

আমি বলেছিলাম, 'তোমার বাবার কাছে আমি একদিন যাব সাজ্জাদভাই।'

তারপর পাশাপাশি হাত ধরে আমরা পথ হেঁটেছিলাম।

সাত

কিন্তু ততদিনে ঘরে-বাইরে 'খুনীর ছেলে' শুনতে শুনতে আমার রক্তের মধ্যে বিষের

ক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। বুকের খাঁচায় বাসা-বাঁধা সাপটা একটু একটু করে বড় হয়ে ভেতরে-বাইরে বিষের ছোবল বসাতে শুরু করেছে। আমি ক্রমশ বদলে যাচ্ছিলাম।

কেননা আমার মুখটা বাবার মত। নাক-চোখ-কপাল বাবার মত। এমনকি বাবার ঘাড়ের কাছে যে জড়ুল চিহ্নটা ছিল—সেটাও নাকি অবিকল উঠে এসেছে আমার শরীরে। আমি তো বাবার রক্তে গড়া, বাবারই অংশ। বাবা যদি খুনী হয়ে থাকে তাহলে তার শরীর থেকে খুনের নেশা আমার রক্তেও আসবে না কি। মা'র সঙ্গে ঝগড়া হলে বড়মামী তো সেকথাই বলে। সেদিন বড়মাস্টার আমাকে যখন বেত মেরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, মল্লিকবাড়ির ছোটতরফের ইতিহাসের মাস্টারও বলেছিল, 'ও কটা বেত খেয়ে কাঁদার ছেলে ও না মাস্টারমশাই। চোখ-মুখ দেখছেন না, কি ভয়ানক। খুনী বাপের রক্ত আছে শরীরে। বড় হয়ে কী কাণ্ড করে দেখুন।' বড়মাস্টারও তার কথায় সায় দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলেছিল, 'ফাঁসি যাবে! নির্ঘাৎ ফাঁসি যাবে!'

বড় হয়ে আমি কি করব, আমার জেল হবে, না ফাঁসি হবে—এসব তখন জানা ছিল না। কেননা তখন তো আমি বড় হইনি। কিন্তু ওই বয়সে সত্যি সত্যি আমার মধ্যে খুনের নেশা জেগে উঠেছিল। শীতকালে এক একটা গাছ যেমন ফুলপাতা সব ঝরিয়ে শুকনো হাড়ের কঙ্কাল নিয়ে শূন্যমাঠে রাগীভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে—আমার মনটাও তেমনি মায়া-মমতাশূন্য হয়ে চারদিকে নিষ্ঠুর থাবা বিস্তার করেছিল।

তখন বাবার মতো মানুষ খুন করার বয়স হয়নি বলে আমি পাখি মারতাম, টিকটিকি কাঠবিড়ালী মারতাম, পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়ে হাঁসের মাথা থেঁতলে দিতাম। একদিন একটা ছাগলছানা বাড়ির কাছাকাছি চলে আসায় কাঁঠালপাতা ছিঁড়ে এনে লোভ দেখিয়ে গলার দড়িটা পাকে পাকে জড়িয়ে এমন ফাঁস দিয়েছিলাম যে বাচ্চাটার জিব্ ঝুলে পড়েছিল, চোখ উল্টে সাদা অংশ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, পেটটা ফুলে ফুলে উঠছিল, শ্বাসবদ্ধ যন্ত্রণায় পা খিঁচানো ছাড়া তার গলা দিয়ে একটুও স্বর বেরুচ্ছিল না। সেই অবস্থায় পা ঝুলিয়ে কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। রাতের বেলা শেয়ালেরা মজা করে মাংস খেয়েছিল। সকালে এখানে-ওখানে রক্তমাখা মাংসের টুকরো আর হাড় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

পেয়ারা গাছের ডাল কেটে আমি শক্ত একটা গুলতি বানিয়েছিলাম। ক্রমে হাতের টিপ্ অব্যর্থ হয়েছিল। বাড়িতে লুকিয়ে রাখতাম কিন্তু স্কুল যাওয়ার পথে

তা দিয়ে কাক-শালিক-পায়রা কি কাঠবিড়ালী মারতাম। রবারের ফিতে দুটো প্রাণপণ শক্তিতে টেনে আবার ছেড়ে দিতেই একটা পাথরের গুলি তীরের মত বাতাস কেটে ছুটে যেত। কর্কশ চিৎকার তুলে শূন্যে ক'টা পাক খেয়ে আছড়ে পড়ত পাখিটা। তারপর ডানা ঝটপট করতে করতে একসময় স্থির নিঃস্পন্দ হত। চারপাশের মাটিতে রক্তের দাগ ফুটে উঠত। খুশির ভঙ্গীতে অল্পকাল দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে আমি স্কুলে চলে যেতাম। এইসময় আমার চোখ জ্বলজ্বল করত, উত্তেজনায় বুকের হাড়পাঁজর দ্রুত ওঠানামা করত, হাত-পা-চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে যেত। কিন্তু অস্পষ্টভাবে এটাও বুঝতাম, আমার শক্ত কঠিন মনের পাথরের তলায় কান্নার একটা আবেগ সরুরেখায় তিরতির করে কাঁপছে।

একদিন একটা কাঠবিড়ালী ধরে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে জ্যান্ত চাপা দিয়েছিলাম। অন্যদিন সাদায়-কালোয় মেশানো একটা গরুর কপাল লক্ষ্য করে গুলতি ছুঁড়েছিলাম। পাথরের গুলিটা সরাসরি চোখে লেগেছিল। চোখ ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। যন্ত্রণায় গাঁক গাঁক শব্দ তুলে দড়ি ছিঁড়ে লেজ তুলে চক্কর খেয়ে গরুটা পাগলের মত মাঠঘাট ভেঙ্গে ছুটতে শুরু করেছিল। দেখে আমি শব্দ করে হেসে উঠেছিলাম!

আর একদিন একটা কুকুরের মুখ থেঁৎলে দিয়েছিলাম বলে সাজ্জাদ আমার উপর খুব রাগ করেছিল। মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টার সেদিন পড়াধরার অজুহাতে আমাকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমার মনটা তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছিল। রক্তের মধ্যে খুনের নেশা জেগেছিল। মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টারের মুখটা থেঁৎলে দেওয়ার সাহস ছিল না বলে আমি নিজের ঠোঁটেই কামড় বসাচ্ছিলাম। আর সেদিনই কুকুরটাকেও মেরেছিলাম। কুকুরটা স্কুলের সামনে বটতলায় মুড়ি-তেলেভাজার দোকানের আশেপাশে ঘুর ঘুর করত। আমাদের দেখতে পেলে অনেকখানি পথ হেঁটে আসত সঙ্গে সঙ্গে। আসলে সাজ্জাদই মুখে শব্দ তুলে ওকে ডাকত। একদিন দেখেছিলাম মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টার দোকানে চা খেতে খেতে বিস্কুট ভেঙ্গে ছুঁড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে খেলা করছে। কুকুরটা আহ্লাদে ভঙ্গিতে পা তুলে লাফিয়ে শূন্য থেকে বিস্কুটের টুকরো মুখে পোরার কসরৎ দেখাচ্ছে।

দিব্যি গোলগাল পাঁশুটে রঙের দিশী কুকুর। একটা সাঁকো পর্যন্ত আসত আমাদের সঙ্গে। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে আকাশে মুখ তুলে বার কয়েক ঘেঁউ ঘেঁউ করত আর মাটি আঁচড়াত। সাজ্জাদ ডাকাডাকি করলেও কিছুতেই সাঁকো পার হত না। মাইলের হিসেব লেখা পাথরটার গায়ে পা তুলে পেচ্ছাপ করে

আবার বটতলায় ফিরে যেত।

সদিনও সাঁকোর এ-পারে থমকে-দাঁড়িয়ে-পড়া কুকুরটাকে ডাকাডাকি করছিল সাজ্জাদ। আমার হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। 'শালা বিস্কুট না দিলে আসবে না' বলে মনে মনে ফুঁসে উঠে আধলা ইঁট কুড়িয়ে সবেগে ছুঁড়ে মারলাম। কুকুরটার নাক মুখ কেটে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে সে দৌড়ে গেল বটতলার দিকে।

সাজ্জাদ খুব রেগে বলল, 'মারলে কেন ওকে?'

আমি অস্থির উত্তেজনায় বললাম, 'বেশ করেছি! শালা কথা শোনে না।'

তীব্র ঝাঁজের সঙ্গে সাজ্জাদ বলে উঠল, 'ছিঃ, মোহনভাই ছিঃ, ছিঃ।'

তার ছি-ছি-কারটা আমার বুকের ভেতরে ধারালো পাথরের টুকরোর মত ছুটে এসে আঘাত করল। আমার মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। বলার মত কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে আমি সহসা তীব্র তিক্ত ছটফটে গলায় বলে উঠলাম, 'সাজ্জাদভাই, তুমি জান আমার বাবা কেন মথুর মল্লিককে খুন করেছিল?'

আচমকা এই প্রশ্ন শুনে সাজ্জাদও কেমন চমকে উঠল। তার মুখের রং পাল্টে গিয়ে অন্যরকম হ'ল। আমার চোখে চোখ রেখে নরম কিন্তু গভীর গলায় সে বলল, 'না মোহনভাই, আমি সব জানি না। বাবা জানে।'

আট

সাজ্জাদের বাবার কাছে যাওয়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই গঞ্জের হাটতলার শৈলডাক্তারের মুখে আমার কিছু শোনা হয়ে গেল। শৈলডাক্তার হোমিওপ্যাথি করে। বয়স বড়মামার মতই। রোদেজলে ভিজে-পুড়ে শরীর তামাটে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, হাঁটুর উপর আধময়লা ধুতি, পাঞ্জাবির কাঁধের কাছটা ছেঁড়াফাটা, একটা হাতা গোটানো, আর একটা ঝুলে পড়েছে। কথা বলার সময় ঘাড়-মাথা এমন ঝাঁকায় যেন মশা মাছি তাড়িয়ে চলে।

সারাদিন উনুনের কাছে থেকে চিনির রস জ্বাল দিতে দিতে মা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যার মুখ তখন। বড়মামা দোকানে ছিল। 'নিত্যিদিন এ আবার কি ভড়ং শুরু করলে গো' বলতে বলতে বড়মামীই মাকে তুলে এনে ঘরে শুইয়ে বুকে হাত ঘষতে ঘষতে বলেছিল, 'হাঁ করে দেখছিস কি মুখপোড়া! ছুটে দোকানে গিয়ে মানুষটাকে খপর দে!'

বড়মামা শৈলডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। হাত ধরে নাড়ী দেখে, নল দিয়ে বুকের ধুকপুকানি পরীক্ষা করে চোখের পাতা টেনে শৈলডাক্তার বলে

উঠেছিল, 'ইস্, একেবারে রক্ত নাই যে ! বোনটাকে খেতে দাও না নাকি ভরত ?'

মামা লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'আজ্ঞে তা না। তবে খাটাখাটুনি খুব। ঘর-সংসার সবই যে ওর হাতে—'

হঠাৎ শৈল ডাক্তার আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল, 'ছেলেটি কে ? চোখে মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ।'

মামা বলেছিল, 'আমার ভাগ্নে।'

ভাগ্নে ? কাদের বাড়ির ছেলে ? বাপের নাম কি ? কোন্ গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছিলে বোনের ?'

মামা একটু ইতঃস্তত করে বেলতলি গাঁ আর বাবার নাম বলতেই শৈলডাক্তার সোজা হয়ে বসেছিল। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু যেন মনে করার চেষ্টা করেছিল। তারপর ঘাড়মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'তাই বল ! তোমার এ বোন হ'ল সুদর্শন দাসের বউ। আর এ হ'ল গে তার ছেলে। ওই একটাই তো ছেলে ছিল সুদর্শনের ?

মামা বলল হ্যাঁ। আমার বোনও ওই একটাই—'

শৈলডাক্তার মুখচোখ উজ্জ্বল করে বলেছিল, হ্যাঁ, সব মনে পড়েছে। এক যুগ আগের কথা। সেবার কি কাণ্ড ! একটা মানুষ ছিল বটে সুদর্শন দাস। মানুষের মত মানুষ !'

আমি চোখের দৃষ্টি ধারালো করে শৈলডাক্তারের মুখ দেখছিলাম। কী বলতে চাইছে সে ? খুনী ? আমার বাবা খুনী ছিল ? কিন্তু সে-কথা বলতে গিয়ে চোখমুখ এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কেন ? তাকানোর ভঙ্গিটাও তো মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টারের মত মনে হচ্ছে না। কেমন স্নিগ্ধ নরম, মমতা মাখানো ! শৈলডাক্তার হাত তুলে সামান্য ইসারা করতেই পোষা বেড়ালের মত আমি তার কাছে সরে গেলাম। আর কিছু না বলে কাপড়ের থলে থেকে ছোট কাঠের বাক্স বের করল সে। ডালা খুলে একটা শিশি টেনে নিয়ে আলোতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, 'মা র ঠোঁটদুটো টেনে ধরতে পারবি বাবা ? ওষুধটুকু ঢেলে দিই। একটুপরেই ভাল হয়ে যাবে।'

মাকে ওষুধ খাইয়ে, সকালে খবর দিয়ে আবার ওষুধ আনার কথা বলে, শৈল ডাক্তার চলে গেল। যাবার সময় ডানহাতের থসথসে থাবা দিয়ে আমার মাথা ধরে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। তার কি অর্থ পরিষ্কার না বুঝলেও বেলতলি গাঁয়ের সুদর্শন দাসের জন্য এই প্রথম আমার বুকের মধ্যে অন্যরকমের একটা আবেগ দোলা দিল। সেটা রাগ নয়, ভয় নয়, ঘৃণা নয়, আবার ভালবাসা কিনা

মমতাও নয়—সব মিলেমিশে জট-পাকানো অনুভূতি। অনেকদিন পরে আমি বাবার মুখটা আবার মনে করার চেষ্টা করলাম। নিতান্ত শিশুকালে দেখা সেই মুখ আমার মনের আয়নায় ছায়া ফেলল না। বাবার মুখ দেখতে গিয়ে আমি আমার মুখটাই দেখলাম।

নয়

গঞ্জের হাটতলায় মাটির দেয়ালের উপর খড়ের চালা। তার তলায় একখানা বড় ঘর জুড়ে শৈলডাক্তারের ডিসপেন্সারি। পুরণো টেবিল, ভাঙ্গা বেঞ্চি। ওষুধের আলমারিটাই যা একটু নতুন। তাতে থাকবন্দী শিশি সাজানো, আর মোটা বাঁধানো কয়েকটা বই। ঘরের একপাশে আলুর বস্তা, মস্ত বড় তিনটে লাউ, কয়েকটা কুমড়ো। হাটবারের জন্য তুলে রাখা হাটুরেদের মাল।

সেদিন হাটবার না হলেও বেশ কিছু লোক বসেছিল ডাক্তারখানায়। কালো রুক্ষ শরীরের মানুষ। ধুলোভর্তি পা, শিরাওঠা মুখ, শক্ত কড়া-পড়া হাতের থাবা। ডাক্তারবাবু একজনের কান টেনে টর্চের আলো ফেলে কি যেন দেখছিল। ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে সে আঁ-আঁ করছিল। খুব সম্ভব তার কান পেকে পুঁজ জমেছিল। একটুপরে টর্চ নামিয়ে রেখে শৈল ডাক্তার বলল, 'অত আঁ আঁ করার কিছু হয় নি। শুকিয়ে আসছে তো।......বল্, কালকের মিটিঙের খবর বল্?'

লোকটা তখনও ব্যথায় বেসামাল। ডানহাতে কান চেপে আছে। সে কথা বলতে পারল না। আঙুল তুলে আরেকজনকে দেখাল। তার মাথায় চুল নেই কিন্তু মুখের লম্বা কাঁচাপাকা দাড়িতে বুক পর্যন্ত ঢাকা। তেলতেলে কপালের তলায় বড় বড় চোখ। পাতলা গড়নের পাকানো শরীর। নীল লুঙির উপর ঝুলখাটো খয়েরি কামিজ গায়ে। শিরদাঁড়া সোজা করে সে বেঞ্চিতে বসেছিল। তার কোলের কাছে দুই হাঁটুর মাঝখানে বছর পাঁচেকের একটা মেয়ে। মেয়েটার দু'চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠে ঘন পিঁচুটিতে ঢাকা পড়েছে। শৈলডাক্তার ঘুরে তাকাতে দাড়িওলা মানুষটা বলল, 'ইবার ফসল বেবাক চাষীদের ঘরে উঠবে।'

শৈলডাক্তার বলল, 'যদি মল্লিকেরা দাঙ্গা বাঁধায়?'

দাড়িওলা মানুষটা বলল, 'আমরাও তৈরী।'

কানের ব্যথা নিয়ে সেই লোকটাও বলে উঠল, 'গাঁয়ে আর সেদিন নাই গো—'

আমি পায়ে পায়ে আরএকটু কাছে যেতেই শৈলডাক্তার খুশির গলায় বলল, 'মা কেমন আছে রে? আয়, কাছে আয়।' তারপর ঘরের লোকজনের দিকে

তাকিয়ে বলল, 'একে চেন তোমরা ? চেন না তো [illegible]লডাক্তার সুদর্শন দাসের ছেলে। সেই যে সেই সুদর্শন—'

বাবার নামঠিকানা এমন উঁচুগলায় বলতে শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। মুখ শুকিয়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মুখের ভাব খুঁটিয়ে দেখতে চাইলাম। কিন্তু না, তারা তেমন করে চমকে উঠে ঠাণ্ডা বিস্বাদভঙ্গিতে তাকাল না তো। বরং সবাই মিলে একসঙ্গে খুশির আবেগে কেমন কলকলিয়ে উঠল। আমি সকলের মুখেচোখেই পাকাধানের রং ঝিকমিক করতে দেখলাম। কানের ব্যথা ভুলে সেই লোকটা বলে উঠল, 'আই বাপ্ ! সুদশুনের বেটা।' দাড়িওলা মানুষটা সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আই আল্লা। কত ডাগর হয়ে গেছিস বাপ্ তুই। এই এতটুকুন ছিলিস্, মোচায় পারা চিমসে ধরা।' বলতে বলতে ক'পা এগিয়ে এসে খপ্ করে আমার হাত ধরে ঠোঁটের কাছে তুলে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি সাজ্জাদের বাপ হই রে বেটা—'

সাজ্জাদের বাপ ! তাকেই তো আমি খুঁজছিলাম মনে মনে। আমার বুকের মধ্যে গুড়্ গুড়্ করে মেঘ ডাকতে লাগল। আমি ঘাড়মাথা উঁচু করে মানুষটার মুখ দেখলাম। তার ভাসা ভাসা চোখ থেকে জ্যোছ্‌নার মত মমতা ঝরে পড়ছিল। সেদিকে তাকিয়ে অসম্ভব সাহস পেলাম। আমার বাবার কথা এই মানুষটা সব জানে। সাজ্জাদভাই কতবার বলেছে। আমি ভাবতে ভাবতে কাঁপতে কাঁপতে একঘর লোকের মধ্যেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার বাবাকে তুমি চিনতে, বল বাবা কেন মানুষ খুন করেছিল ?'

আমার উত্তেজনা দেখে মানুষটা অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের জ্যোছ্‌না নিভে গিয়ে বারুদের মত চোখ জ্বলে উঠল দপ্ করে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'মানুষ কোথা ? তোর বাপ একটা জানোয়ার খতম করেছিল—'

শৈলডাক্তার ঘাড়মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল শব্দ করে। আমার কাঁধের কাছটা খামচে ধরে বলল, 'ছেলের তেজ দেখেছ হালিম মিঞা ? দেখেছ, চোখ কেমন জ্বলছে !'

সাজ্জাদের বাবাও ঘাড় নাড়ল, 'না হবে কেন। বাপের খুন্ আছে না শরীরে !'

শৈলডাক্তার আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'হালিমমিঞা ঠিক কথাই বলেছে রে। সুদর্শন দাস মানুষ মারে নি, জানোয়ার মেরেছিল। না মারলে সে অনেক মানুষ মারত। বনের বাঘের সঙ্গে কি গাঁয়ের মানুষের বসতি চলে বাবা ?' বলতে বলতে একটু থামল শৈলডাক্তার। ঘর ভর্তি মানুষগুলোর দিকে ঘুরে ফিরে তাকাল। তারপর সাজ্জাদের বাবার দিকে লক্ষ্য রেখে বলল,

'এই সমাজের এই নিয়ম [illegible]সিমমিঞা ? হয় মারো, না হয় মরো। মারামারি, কাটাকাটি করেই এগিয়ে[illegible]ছে সব। যাতে হাত দাও, তাতেই রক্তের দাগ। ওই যে ধানমাঠে পাকাধানের শিস্ দেখছ—প্রতি শিসে মানুষের রক্ত। ঠিক কিনা হালিমমিঞা ?'

হালিম মিঞা সব বুঝেছে এমনভাবে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'হ্'ক কথা।'

আমি ভাল করে কারো কথাই বুঝলাম না। তবু ডাক্তারখানা থেকে ফেরার পথে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা ঝড় উঠল। উজানের জল ঢুকতে লাগল কলকল করে। আমার বাবা মানুষ মারে নি, জানোয়ার মেরেছিল—এই কথাটা আমি যতবার ভাবতে চাইলাম ততবারই স্পষ্ট করে বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না বলে আমার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। এই প্রথম বাবার জন্য আমার নাড়ীতে কষ্টের টান পড়ল।

দশ

তার দু'দিন পরেই আমি সাজ্জাদদের বাড়ি গেলাম।
বেলতলি আর করিমপুরের মধ্যে ছোট কাঁদর। বর্ষাকালে মানুষডোবা জল হয়। তখন এখানে-ওখানে তালগাছের কাণ্ড ফেলে পারাপারের পথ হয়। শীতে-গরমে হাঁটুজল থাকে। মাড়ের কাঁকরমাটির লাল ঘোলা জল।

যাওয়ার সময় সাজ্জাদ বলেছিল, 'হেঁটে পার হতে পারবে তো মোহনভাই ?'

আমাকে গাঁয়ে আনতে পেরে তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে-ই আঙুল উঁচিয়ে মল্লিকদের দোতলা পাকাবাড়ির চিলেকোঠার ছাদ দেখিয়ে বলেছিল 'ওই দেখ হারামিদের বাড়ি। মস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ওর মাটির তলায় মানুষ খুনের চোরাকুঠুরী আছে। আমার চাচাকে ওইখানে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল।'

যাওয়ার পথে আমরা দু'জনে ছিলাম।

ফেরার পথে অনেক লোক। সাজ্জাদের বাবা হালিমচাচা, তার আত্মীয়-জনেরা, করিমপুরের উদোম-গা চাষীর দল, বেলতলির মানুষেরা। কি করে যেন তারাও খবর পেয়ে হালিমচাচার ঘরে এসে ভিড় জমিয়েছিল। তারা সকলেই আমার বাবা সুদর্শন দাসকে চিনত। তাদের মধ্যে তিন-চারজন সাজাও পেয়েছিল।

সাজ্জাদের বাড়িতে যেন উৎসবের ঢাক বেজে উঠেছিল। যেন হারিয়ে-যাওয়া ছেলে বিদেশবিভুঁই ঘুরে ফিরে এসেছে গাঁয়ে। সকলের মুখেই টুকরো টুকরো

কথা, রাগের কথা, দুঃখের কথা, জ্বালার কথা। আর সব কথার সঙ্গে, সব কথার শেষে ঘুরে ফিরে আমার বাবার কথা। পুরনো দিনের পুরনো কথা।

সাজ্জাদের মা ঝকঝকে মাজা কাঁসার বাটিতে গরম দুধ এনে দিল। আমি দেখলাম, তার মুখটা আমার মায়ের মত।

ফেরার পথে জল ভেঙে কাঁদর পার হতে দিল না আমাকে। বাবার সঙ্গে দাঙ্গা পাওয়া কালো শক্ত চেহারার একটা মানুষ জোর করে কোলে তুলে নিল। বলল, 'জলের তলার পাথর আছে। সাঁজবেলায় নজর পড়বে না। পায়ে চোট লাগবে।'

কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নি। আকাশে আলো ছিল। এই বয়সে কোলে চাপতে লজ্জা করছিল। সাজ্জাদ আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিল। তবু আমি বাধা দিই নি। ফেরার পথে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনে এত সুখ এত আদর আমাকে কেউ দেয় নি। আমার সারা বুক গর্বে আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছিল। রক্তের মধ্যে সাঁওতালপাড়ার মাদল বাজছিল। আমি যেন এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে চলে আসছিলাম। এতদিন পরে আমি যেন বাবার মুখটা স্পষ্ট করে মনে করতে পারছিলাম। সে মুখটা আমারই মত— শুধু আকারে বড়। আসলে আমার মুখটাই আমি শক্তসমর্থ একটা মানুষের ঘাড়ে বসিয়ে বাবা বানিয়ে নিয়েছিলাম।......কালো পাথুরে চেহারার একটা মানুষ। ঝাঁকড়া চুল। ধারালো চোখ। কাঁধের কাছে মস্ত বড় জড়ুল চিহ্ন। তার চারপাশে বুকেপিঠে থোকায় থোকায় চুল গজিয়েছে। লাঙলের ফলা একহাত মাটিতে গেঁথে জোয়ান দুটো বলদ তাকিয়ে কাদাজলে জমি চষতে নেমেছে দক্ষিণের মাঠে,—তার গলার শব্দে মাঠ গম গম করছে......

তারপর কি যে হল। খরায় পুড়ে গেল আকাশমাটি। কোপাই নদীর বুক খাঁ খাঁ করে উঠল। মাটিতে বড় বড় ফাটল। গাছের ফুলফল পাতাবীজ আগুনে পুড়ে ঝলসে গেল। ফসলের জন্য হাহাকার, জলের জন্য হাহাকার।

মল্লিকবাড়ির পুকুর গভীর করে কাটা। সামান্য জলের সঞ্চয় ছিল তাতে। একটা ইঁদারাও ছিল। গাঁয়ের মানুষ জল চেয়ে না পেয়ে জল লুট করতে গেল।— বনডাঙির মানুষেরা গেল, করিমপুরের মানুষেরাও গেল। মল্লিকেরা জল দিল না। পুকুরপাড়ে কড়া পাহারা বসিয়ে দিল। তৃষ্ণার জল নিয়েই শুরু হল ঠেলাঠেলি। তারপর জলের সঙ্গে মল্লিকবাড়ির গোলায় ফসল নিয়েও দেখা দিল দাঙ্গা। এ পক্ষে হাজার মানুষের সর্দার সাজ্জাদের চাচা আর সুদর্শন দাস, ও-পক্ষে মল্লিকবাড়ির জোয়ানজন আর বন্দুক হাতে মধুর মল্লিক।

সাজ্জাদের চাচার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে কাঁদরের ধার থেকে তাকে ধরে নিয়ে গেল মথুর মল্লিক। আর খোঁজ পাওয়া গেল না। তারপর একদিন রাত্রে কাঁদরের এপারে-ওপারে খড়ের চালায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। কোথাও একফোঁটা জল নেই। বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে আর শুকনো কাঁকরমাটি ছুঁড়ে আগুন নেভানো গেল না। চৈত্রের আকাশে ঝাঁক বেঁধে আগুনের ফুলকি উড়তে লাগল। মেয়েবউরা কাঁদতে লাগল, বাচ্চারা কাঁদতে লাগল। পুরুষেরা ছুটে গেল কাস্তে হাতে, লাঠি হাতে, লাঙলের ফলা হাতে। দূরের সাঁওতাল-গাঁ থেকে মাঝিরা ছুটে এল বাঁশের কাঁড় আ'র বিষ মাখানো তীর নিয়ে। তারপর হাজার মানুষ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে নামল মল্লিকদের পুকুরে। ঘিরে ফেলল ওদের বাড়িঘর। যেন রীতিমত একটা লড়াই শুরু হয়ে গেল ··

সে লড়াইয়ের সেনাপতি সুদর্শন দাস। আমার বাবা, আমারই বাবা······

বাবার ঝাঁকড়া চুল আগুনে ঝলসে গেছে। ঘামেভেজা শরীরে ছাইমাটিকাদার কালো কালো ছোপ্। হাতে ধারালো লাঙলের ফলা আগুনে চকচক করছে। তার চেয়েও বেশী জ্বলছে তার চোখ—

বন্দুকে গুলি ভরে মথুর মল্লিকেরা পুকুরঘাটে ছুটে এসেছিল। সে বন্দুক বার দুই গর্জে উঠতেই লাঠি পড়ল মাথায়, লাঙলের ফলা সটান বিঁধে গেল পিঠে, কাস্তের কোপ পড়ল ঘাড়ে। ওদিকে পুকুরের ঘোলাজল লাল হয়ে উঠেছিল মানুষের রক্তে। মথুর মল্লিকের বন্দুকের গুলি লেগেছিল দু'জনের শরীরে। পুকুরে ঘোলাজলে উলটে-পড়া তাদের দেহ তখনও মরণ-যন্ত্রণায় ছটফট করছিল।

পিঠে লাঙলের ফলা গেঁথে সুদর্শন দাস চিৎকার করে উঠেছিল, 'অনেক মানুষ মেরেছিস শালা। বদলা নিলাম। জল না দিলে, ধান না দিলে মল্লিক বাড়ির স· ক'টাকে শেষ করব।'

ততক্ষণে খড়ের ঘরে আগুনের শিখা লকলক করে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছপালার মাথা লাল হয়ে উঠেছে। পাখিরা ডানা ঝাপটে চিৎকার করে আকাশে ওড়াওড়ি করছে। শেয়ালেরা প্রাণভয়ে ছুটছে। কালো উদোম শরীর হাজার মানুষ আগুনের ফুলকি গায়ে মেখে মল্লিকবাড়ির পুকুরের জল কাদা ঘাঁটিয়ে যেন গাজনের নাচ নাচছে······

অন্যদিকে আমাদের ঘরটাও জ্বলছে দাউ দাউ করে।

আর আমার বাবা মথুর মল্লিকের লাশটা পায়ের তলায় ফেলে ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়িয়ে হাতেপায়েমুখে ধুলোমাটিকাদারক্ত মেখে টানটান দাঁড়িয়ে আছে সিংহের মত। যেন মানুষ না, ইতিহাসের পাতার বীরের ছবি—

এগারো

পরেরদিন মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টার আবার আমাকে সামনের বেঞ্চিতে ঘাড়মাথা উঁচু করে বসতে দেখে অভ্যাসমতো খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'পেছনে যা! পেছনে যা! তোর মুখ দেখলে সব গোলমাল হয়ে যায়। সাল তারিখ মনে পড়ে না!'

কিন্তু অন্যদিনের মত মাথা নীচু করে আমি পেছনে গেলাম না। বুক চিতিয়ে সটান দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি আগে এসেছি। পেছনে যাব কেন?'

আমার উদ্ধত জবাবে মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টার থমকে গেল। তার কপাল কুঁচকে গেল, চোখ কটমটিয়ে উঠল, 'আগে এসেছিস! কত আগে?'

'অনেক আগে।'

'এসে বুঝি ঘরবারান্দা ঝাঁট দিয়েছিস, ধূপধুনো জ্বেলেছিস? হারামজাদা! পড়া করে এসেছিস?'

'করেছি।'

'বল্, দারাকে কে খুন করেছিল?'

'ঔরঙ্গজেব।'

'সিরাজদ্দৌলাকে কে খুন করেছিল?'

'মহম্মদী বেগ।'

'আর তোর বাবা কাকে খুন করেছিল?'

'একটা জানোয়ারকে।'

উত্তর শুনে মল্লিকবাড়ির ইতিহাসের মাস্টার চেয়ার ছেড়ে সোজা খাড়া হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথা সরল না তার। রাগে কাঁপতে লাগল শরীর। আমি তার চোখেই আজ একজোড়া কালকেউটে ফণা তুলিয়ে নাচতে দেখলাম। তারপরই 'কি বললি শুয়োরের বাচ্চা' বলে ডাস্টারটা ছুঁড়ে মারল। আমি মাথা বাঁচাতে অল্প সরে গেলাম। ডাস্টারটা সাজ্জাদের গা ঘেঁষে দেয়ালে লাগল। তারপর শব্দ করে মেঝের পড়ে গেল।

এইসময় সাজ্জাদকে চাপাগলায় হেসে উঠতে শুনলাম।

মল্লিকবাড়ির ইতিহাস হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'আমার দেবতুল্য দাদাকে জানোয়ার বলিস! শালা খুনীর বাচ্চা, জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেলব তোর—'

বারো

রাতের বেলা মা'র কাছে শুয়ে দু'হাতে দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'তুই লুকিয়ে এত কাঁদিস কেন মা? আমি খুনীর ছেলে নই,

বীরের ছেলে। আমার বাবা বীর ছিল—'

মা কি বোঝে কে জানে, সহসা পাশ ফিরে অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'কে বলেছে খোকা? কে বলেছে?'

আমি বলি, 'মল্লিকবাড়ির লোক ছাড়া সবাই বলেছে মা। হাটের মানুষ, গাঁয়ের মানুষ, হালিমচাচা, পীতাম্বরমিস্ত্রি, সাঁওতালপাড়ার গণেশ মাঝি—'

'বলেছে? ওরা বলেছে? কোথায় বলেছে খোকা? কখন বলেছে?'

'আমি যে গাঁয়ে যাই মা। বেলডাঙি যাই, করিমপুর যাই—'

'গাঁয়ের সবাই বলেছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'কী বলেছে খোকা, আবার বল্—'

'আমার বাবা সুদর্শন দাস মানুষ মারে নি, জানোয়ার মেরেছিল। না মারলে সে অনেক মানুষ মারত।'

...শুনতে শুনতে আমার মা হু হু করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু এ কান্নার সুর অন্যরকম। পাগলের মত আমার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে, আমার গালেকপালে চুমু খেতে খেতে অস্থির আবেগে বলতে থাকে, 'হ্যাঁ মানুষটা এইরকমই ছিল। ঠিক এইরব এইরকম।'

তারপর সহসা কান্না থামিয়ে স্থির শান্ত গলায় বলে, 'চল্ খোকা, আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই।'

আমিও বলি, 'হ্যাঁ মা, হালিমচাচারাও সে কথা বলছিল।'

তারপর আমরা আর কেউ কথা বলি না। অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে রেখে মা কী যেন ভাবতে থাকে। অন্ধকারে মায়ের বুকের উত্তাপে শুয়ে থেকে আমিও ভাবতে থাকি......

ভাবতে থাকি, আমি আর পাখি মারব না। কাঠবিড়ালীর নরম শরীর মাটিতে পুঁতব না। পাইবাছুরের মায়াভরা কালো চোখে পাথরের গুলি ছুঁড়ব না। আমার বুকের ভেতরের সেই সাপটা মরে ফুল হয়ে গেছে। মস্তবড় রক্তপদ্মফুল এখন তার পাশে কেশর ফুলিয়ে বসে আছে একটা সিংহ। কেননা আমি যে বীরের ছেলে। আমার মুখটা বাবার মত। আমার নাক চোখ কপাল বাবার মত। এমন কি আমার কাঁধের জড়ুল চিহ্নটাও অবিকল বাবার মত। বাবার অংশে বাবার আমার শরীর। বাবার মত কাঁকড়াচুলের কেশর ফুলিয়ে হাজার মানুষ [illegible] হুঙ্কার তুলতে তুলতে আর আগুনে [illegible] বীরের মত আমি মানুষ [illegible] ইতিহাসে যাব—